"আবার সে এসেছে ফিরিয়া"

নারায়ণ সান্যাল

কুন্ডু ব্যক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অপটিমাস প্রাইম ও পি. ব্যাডস কে - যারা আমাকে এডিট করা ভালো ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhola.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন -

subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

SUBHAJIT KUNDU

"আবার সে এসেছে ফিরিয়া"

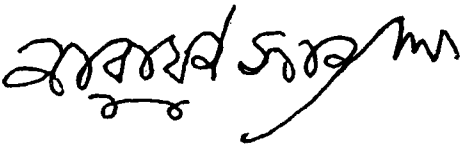

দে'জ পাবলিশিং ।। কলিকাতা ৭০০০৭৩

ABAR SE ESECHE FIRIA Rs 30/-
NARAYAN SANYAL
Dey's Publishing
13, Bankim Chatterjee Street
Calcutta : 700 073

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা, মাঘ, ১৩৯৬
জানুয়ারী, ১৯৯০

প্রকাশক :
সুধাংশু শেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

© **সবিতা সান্যাল**

প্রচ্ছদ : গৌতম দাশগুপ্ত
অলঙ্করণ : গৌতম দাশগুপ্ত ও লেখক

ফটো কম্পোজিং : গ্রাফিটেক ইণ্ডিয়া লিঃ
২১৬/৩এ আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস রোড
কলিকাতা ৭০০ ০১৭

মুদ্রক :
শ্রী স্বপন কুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

দাম ৩০ টাকা

॥ উৎসর্গ ॥

ডাঃ সত্যানন্দ প্রামাণিক এম·বি·বি·এস, ডি·এ (লণ্ডন),
এফ·এফ·এ·আর·সি·এস· (ফ্রান্স),
ডাঃ সুহৃদ কুমার বসু এম·বি·বি·এস·, এম·আর·সি·পি· (লণ্ডন),
ডিপ্লোমা ইন কার্ডিওলজি (ভিয়েনা),
বেগবাগান নার্সিংহোমের সহৃদয় ভিষক ও সেবিকাবৃন্দ,
আজকাল-পত্রিকার সেই অজ্ঞাত সাংবাদিক,
এবং যারা আমার রোগমুক্তি-কামনায় চিঠি লিখেছ,

আর, ও হ্যাঁ—
সেই আন্‌জান সর্দারজী, যে ইনসানের 'করম' আর
ইনসানিয়াতের 'ধরম'-এর ফারাকটা আমাকে সম্‌ঝিয়ে দিয়েছিল!

নারায়ণ সান্যাল
2.10.89

॥ কৈফিয়ৎ ॥

বরাবর আমিই তো দিয়ে আসছি। এবার না হয়, আপনারাই আমাকে দিন না? কৈফিয়ৎ না হলেও একটা ব্যাখ্যা? কোন্ দুর্জ্ঞেয় হেতুতে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের উপযুক্ত রচনা আজও লিখতে পারছি না। একাধিক সম্পাদক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পরে সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন অগ্রজ সাহিত্যিককে পাণ্ডুলিপিখানি পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলাম আপত্তিকর অথবা ভ্রমাত্মক অংশগুলি মার্জিনে দাগিয়ে দিতে। বেদাগ পাণ্ডুলিপি ফেরত এল; সঙ্গে স্বীকৃতি, "শতকরা শতভাগ একমত। তবে আমি কোন পত্রিকার সম্পাদক হলে তোমার এ লেখা ফেরত পাঠাতুম।"

কী বলছেন? 'কৈফিয়ৎ'টা আমাকেই শেষ করতে হবে? বেশ, তাই সই:

দ্বিতীয় রচনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল *প্রমা*-পত্রিকার রজতজয়ন্তী সংখ্যায়। অহন্যহনি শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা যে-হারে দেবতাবিশেষের মন্দির-দর্শনে যাচ্ছেন তাতে 'প্রয়াত' ও 'বর্তমান' বিশেষণ দুটির প্রয়োগে কালানৌচিত্য-দোষ ঘটে থাকবে। সে-দোষ একা আমার নয়।

ডঃ পরেশচন্দ্র দাস লিখিত *"বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ"* গ্রন্থটি অত্যন্ত বিলম্বে হস্তগত হয়েছিল। ততদিনে ফটো-কম্পোজ প্রায় শেষ। তাই ঐ গবেষণা-গ্রন্থের পুরো ফায়দা ওঠাতে পারিনি। না হলে আমার প্রবন্ধের শেষ দিকে যে মন্তব্য করেছি তাতে নিশ্চয় উল্লেখ করতাম —'ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক': ডঃ পরেশচন্দ্র দাস এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরামর্শ দিয়ে, তথ্য যুগিয়ে, ইলাস্ট্রেশন বা কার্টুন সংযোজন করে যাঁরা কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে প্রকাশক ও প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য যাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ, তাঁদের নামোল্লেখ না করলেও অবশ্য কেউ কেউ চিহ্নিত হয়ে পড়েবেনই।

দেবরাজের নিক্ষিপ্ত বজ্রের আঘাত বুক পেতে সহ্য করেছিলেন মহাগরুড়। কিন্তু সবাই তো আর জর্জদার মতো সঙ্গীতশিল্পী, আশুদার মতো কথাশিল্পী বা উৎপলের মতো মঞ্চশিল্পী নয়!

আমি যাঁদের বাধ্য হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারছি না নারায়ণ তাঁদের রক্ষা করুন উদ্যতবজ্র দেবরাজের ক্রোধানল থেকে।

মহালয়া, 1989

"আবার সে এসেছে ফিরিয়া...."

[17.2.89]

রম্যরচনা শুরু করার আগে শিরোনামা লেখার একটা প্রথা আছে। প্রথমে ভেবেছিলুম, নাম দেব: 'কলমটা ফেরত পেয়ে!' তারপর মনে হল, তার চেয়েও ভাল হবে দেবদূত-অভিনেতা পাগলা দাশুর ঐ অনবদ্য উক্তিটা। নাট্যকার শেষ-প্রস্থানের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, তা অগ্রাহ্য করে পাগলা দাশু ফিরে এসেছিল রঙ্গমঞ্চে, লম্বা একটা 'মনলোগ' ঝেড়েছিল।

৭ ফেব্রুয়ারি '৮৯ '*আজকাল*'-এর পাঁচ নম্বর পাতায় ছাপা একটি আট-লাইনের খবর এই রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। সেটা যদি ঘটনাচক্রে আপনার নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকে তবে এ রচনার ধরতাইটা আদৌ ধরতে পারবেন না। তাই মূল ধুয়োটা প্রথমেই শুনিয়ে দিই—

> **আজকালের প্রতিবেদন: গত বৃহস্পতিবার বইমেলায় একটি অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফেরার পথে প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল হৃদরোগে আক্রান্ত হন। ওই রাতেই তাঁকে বেগবাগান নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে তাঁকে রাখা হয়েছে। সোমবার নারায়ণবাবুর অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে।**

তথ্যের মূল বক্তব্যটায় ভুল হয়নি; কিন্তু আইনের ভাষায় যাকে বলে 'হোল ট্রুথ' বা 'নাথিং বাট্ দ্য ট্রুথ', এ তা নয়। আমি এতদিন প্রতিবাদ করতে পারিনি, কারণ মানিব্যাগ-ঘড়ি সমেত আমার কলমটাও বেমক্কা ছিন্তাই হয়ে গেছিল! আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে ছিন্তাইকারিণীকে আমি নির্ঘাৎ সনাক্ত করতে পারব, নামটাও মনে আছে: জবা। তাঁকে পাকড়াও করা যাবে বেগবাগান নার্সিংহোমের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। তবে আমি কোনও এফ· আই· আর· দাখিল করিনি। কারণ ছিন্তাই-করাবামাল তিনি হস্তান্তরিত করেছিলেন পরের গাড়িতে আমার গিন্নি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতেই। ঘড়িটি ফেরত পেয়েছি, মানিব্যাগ ফেরত পাওয়া-না-পাওয়া বর্তমান শারীরিক অবস্থায় নিরর্থক। কলমটা ফেরত পেয়েছি দিন পনের পরে। তাও কার্ডিওলজিস্ট-মহোদয় নিদান হেঁকে গেছেন—আমাব দক্ষিণহস্তের সঙ্গে লেখনীর সহাবস্থান দৈনিক আধঘণ্টার। অনেক কাকুতি-মিনতি করেছি, বুঝিয়ে বলেছি, আর্ভিন ওয়ালেস্ তাঁর বইয়ের নাম রেখেছেন বটে 'সেভেন মিনিটস্' কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন, সেটা লিখতে তাঁর সময় লেগেছে 'সেভেন মান্থস্'! কে কার কথা শোনে! ডক্টর বোস আয়াতুল্লার মতো নিষ্ঠুর! হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না।

আর সে হুকুম তামিল করার জন্য এ বাড়িতে হামে-হাল হাজির আছেন এক ভদ্রমহিলা। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। আমি যে তাঁকে থোড়াই কেয়ার করি সে-কথা আপনারা জানেন

না—জানতেন 'মার্জারনিধন কাব্য'-লেখক অগ্রজপ্রতিম সৈয়দ মুজতবা আলী। দেড়-দুশো বছর আগে স্মার্ত-পণ্ডিত যেমন পঞ্জিকা দেখে গৃহিণীকে বলতেন, 'চাহিলে আজ রাত্রে বড়খোকা বধূমাতার কক্ষে শয়ন করিতে যাইতে পারে, অপিচ রাত্রি নয় ঘটিকা বত্রিশ মিনিট গতে'—তেমনি তিনি সকালবেলা রক্তচাপযন্ত্রে পারদের নাচানাচি নজর করে ছোটকন্যা মৌকে বলেন, 'চাইলে তোমার বাবাকে আজ কাগজ-কলম দিয়ে আসতে পার।'

আর পরীক্ষার হলে যদিও তিনি জীবনে কোনও দিন গার্ড দেননি, তবু ঠিক সেই কায়দায় পঁচিশ মিনিট পরে হাঁকাড় পাড়েন: 'ফাইভ মিনিটস্ মোর!'

বলুন? এভাবে রম্যরচনা লেখা সম্ভব?

[18.2.89]

'হোল-ট্রুথ' পরিবেশন করুক না করুক '*আজকাল*' পত্রিকাকে ধন্যবাদ। সংবাদপত্রে আঠারো পয়েন্ট টাইপে নিজের নাম 'ছাপিত' হতে যে ইতিপূর্বে দেখিনি তা নয়। দে'জ পাবলিশিং-এর অর্থানুকূল্যে, সুধাংশু দে-র ব্যবস্থাপনায় তা প্রায়ই দেখতে পাই—কিন্তু বিজ্ঞাপন-হিসাবে। 'নিউজ আইটেম' হিসাবে নয়। সংবাদ-হিসাবে ওর চেয়েও বড় হরফে সংবাদপত্রের প্রথমপৃষ্ঠায় প্রথম ও শেষবার দেখেছি বিশ বছর আগে, যেদিন লীলাদির '*আর কোনখানে*' আর গোপালবাবুর '*লৌকিক দেবতা*' বই দুটি রবীন্দ্র পুরস্কার পায়। ধন্যবাদ সে জন্য নয়; ধন্যবাদ এজন্য যে, '*আজকাল*' ঐ খবরটা ছাপায় অনেক অখ্যাত সাহিত্যসেবী প্রতিষ্ঠান উপকৃত হল। শীত ও বসন্তকাল হচ্ছে সেই সব প্রতিষ্ঠানের—লাইব্রেরী, ক্লাব, যুবসঙ্ঘ, বিদ্যালয়ের পুরস্কার-বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হবার মরশুম। খানদানিতম প্রতিষ্ঠানের জন্য আছেন মন্ত্রিমহোদয়েরা, খানদানিতরদের জন্য বিধায়ক ও সাংসদেরা। মোটামুটি খানদানি ক্লাবগুলি আশীর্বাদ পায় সেইসব সুপরিবিজ্ঞাপিত কথাসাহিত্যিকদের, যাঁরা বিভিন্ন পত্রিকাগোষ্ঠীতে কর্মরত, যাঁদের রচনা ক্রমাগত ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় এবং 'বেস্ট-সেলার লিস্ট'-এ হপ্তায়-হপ্তায় যাঁদের নাম মুদ্রিত হতে দেখা যায়। কিন্তু তাছাড়াও এই অতিভঙ্গ বঙ্গদেশে তো আছে অগুনতি ছোট ছোট সাহিত্যপ্রেমিক ক্লাব। যারা হাতে-লেখা পত্রিকার কৈশোর পার হয়ে সদ্য উপনীত হয়েছে লিট্‌ল-ম্যাগাজিন প্রকাশের তারুণ্যে, যারা মাসান্তে একবার জমায়েত হয় পরস্পরের লেখা কবিতা শুনে তারিফ করতে, যাদের গ্রন্থাগারের মাথায় টালির ছাদ, গায়ে পিঠামুলি-বাঁশের ঠাশবুনানি আলোয়ান, যারা সরকারী সাহায্যলাভের জন্য কোনও সরল দেবতার বরাভয় আজও লাভ করেনি! তারা কী করবে? তারা এই ফাংশন-মরশুমে খুঁজতে বের হয় আর এক জাতের কথাসাহিত্যিক—বাজারদরহীন, একান্তচারী, গোষ্ঠীনিরপেক্ষ কোনও অন্তেবাসী একলব্য। যাঁর নাম কস্মিনকালেও 'বেস্ট-সেলার লিস্টে' ছাপা হয় না, অথচ পাঠাগারের সভ্যসভ্যা মোটামুটি তাঁর নাম জানে। চাহিদা থাক-না-থাক। সেই রকম অনেক-অনেকগুলি খুদে-পাঠাগার '*আজকাল*' পত্রিকাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে ঐ সাত তারিখের খবরটুকুর জন্য। পুরুলিয়া থেকে জঙ্গীপুর-তক। তাদের হল—ঐ যাকে বলে: 'হরিষে-বিষাদ'। বিষাদ এজন্য যে, যে বৃদ্ধ মৎসটি টোপ গিলেছিল তার গলায় বর্শিটা গাঁথেনি। পিছলে পালিয়ে গেছে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। আর 'হরিষ' এ-জন্য যে ওদের ফাংশানে বক্তিমে দিতে আসুক-না-আসুক: বুড়োটা প্রাণে বেঁচে তো গেছে! হোক-না বাজারদরহীন!

'*আজকালে*' পরিবেশিত তথ্যটা কেন নয় 'হোল ট্রুথ'? বলি শুনুন: প্রথম কথা বৃহস্পতিবার

(অর্থাৎ 2.2.89) আমি আদৌ নার্সিংহোমে ভর্তি হইনি। 'ঐ রাতে' ছিলাম নিজের ডেরায়। তবে—আজ্ঞে হ্যাঁ ধর্মাবতার, কবুল খাচ্ছি: ঐ বেস্পতিবারের বারবেলায় বইমেলার মুক্তমঞ্চে একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলুম! আমি যে সভা থেকে সোজা হাড়িকাঠের দিকে পাড়ি জমাব এটা সভার উদ্যোক্তারা কী করে জানল জানি না, কিন্তু আমার গলায় একটা মালা পরিয়ে দিয়েছিল, ঠিক যেমন পরানো হয় নবমীর বলির 'ইয়ে'র গলায়! এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই, পরদিন *যুগান্তর* পত্রিকায় সে ছবি ছাপা হয়েছে, তার এভিডেন্স রয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন আমার হৃদরোগের আক্রমণ হয়েছিল একথা আমি হলফ নিয়ে কেমন করে কবুল খাই? কার্ডিওলজি-পারঙ্গম ডক্টর সুহৃদ বসুও তা আমাকে নিশ্চিত করে জানাতে পারেননি, তা আমি কেমন করে বলব বলুন, জাস্টিস পাঠক?

বেস্পতিবারের বারবেলার সেই দুর্ঘটনার একটা সবিস্তার বর্ণনা আমাকে দাখিল করতে দিন হুজুর। শুনুন:

—স্টপ রাইটিং! টাইম ইজ আপ! আধঘণ্টা হয়ে গেছে!

[19.2.89]

হ্যাঁ, কী যেন বলছিলুম কাল এনকোয়ারি-কোর্ট অ্যাডজর্ন্ড হবার আগে? সেই দোশরা ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার কিস্‌সা। বইমেলার মুক্তমঞ্চে পিছন দিকের একখানা চেয়ার দখল করে শুনছি আধুনিক কবিকুলের স্বরচিত কবিতা পাঠ। ব্রজ মণ্ডলের স্মরণসভা। স্বীকার্য, আধুনিক কবিতা প্রায়ই বুঝতে পারি না। স্বাভাবিক। বাঙলা-সাহিত্যের কোনও অধ্যাপকের কাছে ক্লাস করার সৌভাগ্যলাভ ঘটেনি। আমার ধারণা, কবিকণ্ঠে আবৃত্তি শুনলে অর্থটা পরিষ্কার হয়। তাই প্রায় প্রতি বছরই বইমেলার ঐ আসরে গুটিগুটি গিয়ে বসি। সেদিনও তাই বসে আছি; হঠাৎ নীরদ আমাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। বললে, নিতান্ত ঘটনাচক্রে আপনাকে পেয়ে গেছি! দাদা, আমাকে উদ্ধার করবেন?

নীরদ আমার দেশতুতো ছোটভাই। তাই নাম ধরে বলছি। আসলে সে ডাকসাইটে লোক, বাঙলায় ডক্টরেট করেছে: ডঃ নীরদবরণ হাজরা। আমার অনুজপ্রতিম। গোপালভাঁড়ের উপর একখানি বই লিখে সে আমাকে উৎসর্গ করেছিল এই ভাষায়:

> সাহিত্যব্রতী শ্রীনারায়ণ সান্যালকে—এক কৃষ্ণনাগরিক এক কৃষ্ণনাগরিককে তুলে দিলেন আর এক কৃষ্ণনাগরিকের হাতে।

কৃষ্ণনাগরিককে কৃষ্ণনাগরিক না দেখিলে কে দেখিবে?

বলি: কীভাবে তোমাকে উদ্ধার করতে হবে বল, আমি জান-কবুল!

নীরদ ফিস্-ফিস্ করে যে-কথা বললে তার সারার্থটা এইরকম:

গান্ধীহত্যা-মামলার মূল আসামী ছিলেন চার জন—বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকার, যিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। নাথুরাম গডসে, যিনি স্বহস্তে গান্ধীজীকে গুলি করেছিলেন এবং গান্ধীহত্যা ষড়যন্ত্রের অপরাধে নাথুরামের অনুজ গোপাল গডসে আর নারায়ণ আপ্তে। সে দিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে। যদিও তা আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। নাথুরাম ও নারায়ণের ফাঁসি হয় আর গোপাল গডসের হয় যাবজ্জীবন। সেই প্রসঙ্গে তিন-তিনটি তথ্য চল্লিশ বছর আগে বুকে গাঁথা হয়ে গেছিল। এক: মহাত্মাজীকে গুলি করার

পূর্বমুহূর্তে নাথুরাম গডসে নত হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করেছিল। দুই : নাথুরামের পিস্তলে ছিল ছয়টি বুলেট; তার ভিতর তিনটি সে ফায়ার করে গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে—বাকি তিনটি অব্যবহৃত অবস্থায় সে ধরা দেয়। কাছে-পিঠে কোন পুলিস বা দেহরক্ষী ছিল না। দেহরক্ষী রাখার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গান্ধীজী সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থাতেই প্রার্থনা-সভাতে যোগদান করতে আসতেন। অর্থাৎ তিন-তিনটি তাজা-বুলেট সহ নাথুরাম নিরস্ত্র জনতার কাছে আত্মসমর্পণ করে। স্বতই মনে প্রশ্ন জেগেছিল : কেন? কেন? কেন? একটাই সম্ভাব্য উত্তর! হত্যাকারী আত্মহত্যা করতে রাজী হয়নি। কারণ সে ভারতবর্ষকে জানাতে চেয়েছিল, কেন সে এই জঘন্য কাজটা করল? মহাত্মাজীর প্রার্থনা সভায় আমি একাধিকবার যোগ দিয়েছি। তিনি প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবৎগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনেকগুলি শ্লোক সুর দিয়ে আবৃত্তি করতেন, "স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" থেকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ। অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত নিষ্কাম কর্মের নির্যাস! নাথুরাম যে জঘন্য অপরাধটা করেছিল, যার জন্য তার মৃত্যুদণ্ড ছিল অবধারিত, তার জন্য ওর যদি কোনও ফলাকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে, তবে তা হচ্ছে বন্ধুবর গৌরকিশোর ঘোষের ভাষায়: 'আমাকে বলতে দাও!'

হত্যাকারী সে বটেই কিন্তু তার নিজস্ব ধারণায় সে শহীদ, আপনি-আমি মানি-না-মানি।

তিন নম্বর বিস্ময় সেটাই। নাথুরাম গডসে স্বয়ং একটি দীর্ঘ জবানবন্দি দিয়েছিলেন তাঁর মামলা চলা কালে। সদ্যস্বাধীন ভারতের শাসকবৃন্দ সেটা প্রকাশ হতে দিলেন না। এ নিয়ে এককালে দুরন্ত কৌতূহল ছিল আমাদের—পক্ককেশ যে-কোন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, মৌলানা আজাদের অপ্রকাশিত অধ্যায়ের চেয়ে সে-আমলে ঐ কৌতূহল ছিল অনেক-অনেক বেশি। হেতুটা সহজবোধ্য—মৌলানা আজাদ স্বয়ং তথ্যটা দীর্ঘদিন গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, আর নাথুরাম তিন-তিনটি তাজা বুলেট সমেত একটি পিস্তল ভারত সরকারকে উপহার দিয়ে সে অধিকার কিনতে চেয়েছিল! পায়নি।

এখন জানা গেল, দীর্ঘদিনের মেয়াদ-অন্তে নাথুরামের অনুজ গোপাল গড়সে বার হয়ে এসেছেন কারাপ্রাচীরের বাহিরে। আদালতের অনুমতি নিয়ে দাদার জবানবন্দিটি প্রকাশ করেছেন, "May It Please Your Honour"! দিল্লীতে তার হিন্দি অনুবাদও বার হয়েছে।

কী অপরিসীম ক্ষমতা মহাকালের! সেই দুরন্ত কৌতূহলটা একেবারে ভোঁতা হয়ে গেছে! আমি এ সংবাদটা আদৌ জানতাম না। নীরদ হাজরা নাকি ঐ ইংরেজি বইয়ের একটি কপি ঘটনাচক্রে দেখতে পায়। গোপাল গডসের অনুমতি নিয়ে বইটি বাঙলায় অনুবাদ করে।

সালাম মহাকাল, সালাম! চল্লিশটা বছরে কীভাবে জীর্ণ করে ফেলেছ আমাদের!

আজ নাকি সেই বাঙলা বইটির ('শুনুন ধর্মাবতার') আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে।

নীরদ আমাকে অনুরোধ করল এ সভায় সভাপতিত্ব করতে।

বললুম, এ রকম একটা জবরদস্ত বইয়ের ক্ষেত্রে আমার মতো অন্তেবাসী অখ্যাত জন কেন?

নীরদ বলে, সাত-আটজনকে অনুরোধ করেছি; কিন্তু নাথুরাম গডসের জবানবন্দি···

স্তম্ভিত হতে হল। চাপেকার ব্রাদার্স থেকে উধম সিং এমন কোন রাষ্ট্রদ্রোহীর কথা মনে পড়ল না যেখানে বিদেশী ইংরাজ-সরকার 'ডিফেন্স কাউন্সেল'-এর ভাষণ চল্লিশ বছর ধরে ফ্রীজ

করে রেখেছিল! আর সেই বই প্রকাশকালে আজ···

বলি, নীরদ, বাঙালী কোনও সাহিত্যিক রাজী না হলে তুমি স্বয়ং গোপাল গড়্‌সেকে নিমন্ত্রণ করলে না কেন?

—করেছি, দাদা! তিনি পুণা থেকে এসেছেন। এখনি বই-মেলায় এসে পড়বেন। কিন্তু তিনি তো প্রধান অতিথি। সভাপতি পাই কোথায়?

বুঝতে পারি ওর অবস্থা। দৈনিক পত্রিকায় কর্মরত সুপরিবিজ্ঞাপিত 'বেস্ট-সেলার' সাহিত্যিকদের পাকড়াও করতে না পেরে নিতান্ত নিরুপায় হয়েই এসেছে আমার কাছে।

সাধুভাষায় যাকে বলে: 'ভস্ম নিক্ষেপণ-মানসে ভগ্নসূর্প সন্ধান।'

রাজী হয়ে যেতে হল।

[20.2.89]

পারীতে যে বছর ভলতেয়ার জন্মগ্রহণ করেন সেই বছরই ত্রিবেণীর এক আঁতুড়ঘরে আবির্ভূত হয়েছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন—1694 সালে। দুজনেই ক্ষণজন্মা। কিন্তু অষ্টাদশ-শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতিতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের যতখানি প্রভাব, একই শতাব্দীর য়ুরোপীয় সংস্কৃতিতে ভলতেয়ারের প্রভাব তার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ ভলতেয়ার শুধু পণ্ডিত ছিলেন না জগন্নাথের মতো, তিনি ছিলেন কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক এবং আন্তর-বিপ্লবী। তাঁর কলম সমকালীন স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর মত ক্ষুরধার, কখনো রামমোহনের মতো বিপ্লবাত্মক, কখনো প্রমথ চৌধুরীর মতো তীক্ষ্ণশ্লেষী অম্লমধুর। কোন্‌টা উইট্ কোন্‌টা হিউমার আর কোন্‌টা স্যাটায়ার ঠাওর হত না। ভলতেয়ারের প্রতিভা বিশ্বসভ্যতায় অদ্বিতীয়।

ফরাসী-বিপ্লবের আদিগুরু প্রকৃতিপ্রেমিক জাঁ জাক রুসো ছিলেন ভলতেয়ারের চেয়ে বয়সে আঠারো বছরের ছোট। দুজনের দার্শনিক মতবাদে আসমান-জমিন ফারাক। যুবা বয়সেই জনৈক অভিজাত স্বেচ্ছাচারীর ব্যভিচার নিয়ে বাঁকা প্রবন্ধ লেখার অপরাধে ভলতেয়ার বাস্তিলে কারারুদ্ধ হন। কিছুদিন জেল খেটে বেরিয়ে এসেই লিখলেন আবার একটি প্রবন্ধ—একদল স্বেচ্ছাচারী অভিজাত পুরুষকে লক্ষ্য করে। দ্বিতীয়বার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মুক্তিলাভ করে চলে যান ইংলন্ডে। সেখানে নিউটনের বিজ্ঞান, লক-এর দর্শন, শেক্সপীয়রের সাহিত্য তাঁকে অভিভূত করে। পারীতে ফিরে এসে যোগ দেন দিদেরোর গোষ্ঠীতে—'এনসাইক্লোপিডিয়া' লেখার কাজে। মতভেদ হওয়ায় সিদ্ধান্ত নেন, একাই একটা এনসাইক্লোপিডিয়া লিখবেন! ঐ সময়েই ইংরেজদের মুক্তচিন্তার প্রশংসা করে লেখেন একটি প্রবন্ধ *Letters philosophiques sur les Anglais*। স্বাভাবিকভাবে ফরাসী কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে লেখককে সোচ্চার হতে হল। ফলে নির্বাসিত হলেন ফ্রান্স থেকে। ঘাঁটি গাড়েন সুইৎজারল্যান্ডে। পণ্ডিত এবং দার্শনিক হলেও ব্যবসায়ে তিনি সফল। এদিক থেকে আবার জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করতে ইচ্ছে করছে। ভলতেয়ার তাঁর নির্বাসিত জীবনে বিচিত্রধর্মী যেসব রচনা লিখেছেন তা সত্তরটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, সাতের পিঠে শূন্যর কথাই বলছি।

অপরপক্ষে প্রায় সমকালীন জাঁ জাক রুসোকে ভলতেয়ার কোনদিন বরদাস্ত করতে পারেননি। রুসোর 'সাধারণ সার্বভৌম মতবাদ' ভলতেয়ারের মতে রাবিশ্! কান্ট, গোয়েটে, রোবস্‌পীয়ের এমনকি তলস্তয় পর্যন্ত রুসোর কোন কোন মতকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু

ভলতেয়ার আজীবন ছিলেন রুসোর বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। রুসো বলতেন, মানুষকে প্রকৃতির বুকে ফিরে যেতে হবে—'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর'! কাব্য করে নয়, দার্শনিক মতবাদ হিসাবে। '*ডিসকোর্স অন আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সেস্*' গ্রন্থে রুসো বলেছেন, কলা ও বিজ্ঞানের উন্নতি মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটিয়েছে। লিসবনের মারাত্মক ভূমিকম্পে যখন প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষ হতাহত হল, তখন রুসো বললেন, এই ঈশ্বরপ্রদত্ত অভিশাপ তো প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বাড়াবাড়ির জন্যই। মানুষ কেন গাঁয়ে না থেকে শহরে গুঁতোগুঁতি করে?

রুসোর এই দার্শনিক মন্তব্যের উপর কিছু বলতে অনুরুদ্ধ হয়ে ভলতেয়ার বলেছিলেন, "রুসোর সঙ্গে একজন সাঁচ্চা দার্শনিকের প্রভেদ সামান্যই; 'নর-'এর সামনের দিকে প্রশংসাসূচক একটি 'বা' এবং পশ্চাদ্দেশে একটি লাঙ্গুল যোগ করলে যেটুকু পার্থক্য হয়!"

এ হেন রুসোর লেখা *দ্য সোসাল কনট্রাক্ট* গ্রন্থটি হঠাৎ ফরাসী সরকার বাজেয়াপ্ত করে বসলেন। এমনকি রুসো বেমক্কা চিহ্নিত হয়ে গেলেন ফ্রান্সের অবাঞ্ছিত নাগরিকরূপে। ভলতেয়ার স্বয়ং তখন নির্বাসনে। সেখান থেকে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ফরাসী সরকারকে আক্রমণ করতে থাকেন রুসোর বইটি বাজেয়াপ্ত করার অপরাধে। রুসো বিস্মিত হয়ে গেলেন! দীর্ঘদিনের বৈরীতার কথা বিস্মৃত হয়ে রুসো একটি পত্র লিখে কৃতজ্ঞতা জানালেন ভলতেয়ারকে। ভলতেয়ার সুইৎজারল্যাণ্ড থেকে জবাবে ফরাসী ভাষায় যা লিখেছিলেন তার আক্ষরিক ইংরাজি অনুবাদ "I disagree with every word you say but will fight to the death your right to say it." [তোমার প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে আমার মতের অমিল। কিন্তু সে কথা বলতে তোমাকে যদি কেউ বাধা দেয় তাহলে তোমার কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে আমি আমৃত্যু সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত]।

পত্রের শেষে পুনশ্চ দিয়ে লেখা ছিল, 'ফ্রান্সে বাস করা যদি অসহ্য মনে কর তাহলে, মনে রেখ, আমার গৃহদ্বার তোমার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত। দুজনে তর্ক করতে করতেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।'

বুলেটের বদলে নাথুরাম যদি গান্ধীজীর দিকে একখানা বই ছুঁড়ে মারত—হোক তার নাম "My Own Experience with Truth" অথবা "May it Please Your Honour", তাহলে কী হত? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহাত্মাজী ঠিক ঐ কথাই বলতেন। বইটি সর্দার প্যাটেল নির্ঘাৎ বাজেয়াপ্ত করতেন; আর গান্ধীজী তাঁর চিরাচরিত পন্থায় বাজেয়াপ্তর বিরুদ্ধে অনশন শুরু করে দিতেন। লেখক নাথুরাম গডসে আত্মগোপন করতে চাইলে হয়তো দেখত শবরমতী আশ্রমটাই দুনিয়ায় তার একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল!

[21.2.89]

আলাপ হল গোপাল গডসের সঙ্গে। আমারই বয়সী, হয়তো কিছু বড়। পুনা থেকে কলকাতায় এসেছেন এই গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ সভার প্রধান অতিথিরূপে। কারাগারের দীর্ঘ অত্যাচার তাঁর দেহমনকে খুব কিছু প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। বর্তমানে তিনি নিখিলভারত হিন্দু মহাসভার প্রধান সচিব। কী-ভাবে আদালত থেকে অনুমতি আদায় করেছেন তা জনান্তিকে আমাকে জানালেন। উপসংহারে বললেন, ক্যা অ্যাপসোস্ কি বাৎ, চালিশ বরিষ বীত গ্যয়ে···

আমি বললুম, 'চল্লিশ' এমন কি বেশী? তিলক মহারাজের ক্ষেত্রে লেগেছিল 'পঞ্চান্ন'!

ভলতেয়ারের কথা ভাবতে ভাবতে আমি ভলতেয়ারি প্যাঁচে কথা বলছি। উনি অবাক হয়ে বললেন, আমার কথার ধরতাইটা উনি ধরতে পারেননি। অগত্যা বুঝিয়ে বললাম, বোম্বাই হাইকোর্টে বালগঙ্গাধর তিলক-এর বিচারে দুজন ভারতীয় জুরী তাঁকে নির্দোষ বলেন। আর পাঁচজন ইউরোপীয় জুরী তাঁকে দোষীরূপে চিহ্নিত করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুসারে বিচারক লোকমান্য তিলককে রাজদ্রোহের অপরাধে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডের আদেশ দেন—বস্তুত দ্বীপান্তরের! আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিলক ইংরাজ শাসকদের যে জ্বালাময়ী ভাষায় আক্রমণ করেন তা ভারতীয় প্রেসে মুদ্রিত হয়। *'Trial of Tilak'* নামক গ্রন্থে তিলক মহারাজের 'আনসেন্‌সর্ড' ভাষণ প্রকাশিত হয়েছিল পনেরই সেপ্টেম্বর 1908-এ। বিচারক রায় দেন বাইশে জুলাই, 1908—পঞ্চান্ন দিনের ফারাক হল না?

ডঃ নীরদ হাজরা বক্তৃতা দিলেন বাঙলায়। লেখক গোপাল গডসের পরিচয় দিলেন। গোপাল গডসে তাঁর বক্তব্য রাখলেন হিন্দুস্থানীতে।

আমি প্রথা লঙ্ঘন করলুম। একটি বাঙলা বইয়ের উদ্বোধনী উৎসবে বক্তৃতা দিলুম ইংরাজিতে, যাতে লেখক বুঝতে পারেন। গোপাল বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন 'অখণ্ড' ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম শহীদদ্বয় বাঙালী—প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরাম। আমি বক্তৃতায় তার প্রতিবাদ করে বললাম, না, প্রথম শহীদত্রয় মহারাষ্ট্রীয়—গোপাল গডসের দেশের লোক; চাপেকার ব্রাদার্স—বালকৃষ্ণ, দামোদর আর বাসুদেব!

মিনিট-কুড়ি আমি অ-মাইক ছিলাম না। বক্তৃতা দিতে দিতেই কেমন যেন একটা উত্তেজনা আসে। আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল, চোখ দুটো জ্বালা করছিল। পুনা শহরের বাসিন্দা গোপাল গডসে যখন মহারাষ্ট্র ও অভঙ্গবঙ্গের মিলনসূত্রের কথা বলছিলেন তখন থেকেই আমি উত্তেজিত হচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল রাসবিহারীর দক্ষিণহস্ত বিষ্ণু গণেশ পিংলের কথা। আর ঐ বস্ত্রহারী তিন মধুসূদনের কথা: বালকৃষ্ণ, দামোদর আর বাসুদেব! ওঁরা তিনজন শহীদ হয়েছিলেন র‍্যান্ডসাহেবের পৈশাচিক পরিকল্পনার প্রতিবাদে—মহারাষ্ট্রীয় মহিলাদের বস্ত্রহরণের দুঃশাসনী অপচেষ্টায় ক্ষিপ্ত হয়ে! সেসব কথা আমি অন্যত্র বলেছি।

উদ্বোধন-অনুষ্ঠান শেষ হবার মুখোমুখি গোপাল গডসে তাঁর স্বাক্ষরিত এক কপি বই আমাকে উপহার দিলেন। পকেট থেকে তাঁর নোট-বই বার করে আমাকে ঠিকানাসহ অটোগ্রাফ দিতে বললেন। বাঙলা সাহিত্যের বিষয়ে তিনি ততখানিই পণ্ডিত যতখানি আমি মহারাষ্ট্রের সাহিত্য-বিষয়ে। উনি স্বভাবতই ধরে নিয়েছেন—আমি একজন বঙ্গসাহিত্যের জনপ্রিয় মহা-তালেবর কলাকার! ওঁর ভ্রান্তবিশ্বাস: সর্বজনশ্রদ্ধেয় অশোকুমার সরকার যেমন বই-মেলায় একটি গ্রন্থ উদ্বোধন করতে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন, গোপাল গডসের এই বইয়ের উদ্বোধনী-সভার সভাপতি যদি তেমনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পটলোত্তলনে প্রয়াসী হন তাহলে আগামীকাল সেই খবরটা এই অতিভঙ্গ বঙ্গদেশের যাবতীয় দৈনিকপত্রে ডব্‌ল্‌-কলম নিউজরূপে মুদ্রিত হবে। উনি তো জানেন না, এক মহারাষ্ট্রীয় অতিথিকে ধোঁকা দিতে আমরা গোপালভাঁড়ের দুই দেশওয়ালা-ভাই কী প্যাঁচ কষেছি! ওঁর পকেট-ডায়েরিতে অটোগ্রাফ দিতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল; কিন্তু এমন গম্ভীরমুখে সে কাজটা সারলুম যাতে ওঁর মনে হয়—হর-হপ্তা রবিবাসরীয় 'দৈনিক বাজার পত্রিকার' বেস্ট-সেলার লিস্টে আমার নামটা গ·সা·গুর কমন ফ্যাকটার, দুধাপ উপরে-নিচে নামা-ওঠা করে, এই যা! কী করব? তখনো যে যবনিকাপাত ঘটেনি; আমি মঞ্চের উপর দেশতুতো ভাইয়ের মুশ্‌কিল-আসানরূপে ভগ্নসূর্পের অভিনেতা!

সভা সমাপনান্তে উদ্যোক্তার দল আমাদের গিল্‌ড্‌ অফিসের দ্বিতলে নিয়ে গেল। বক্তৃতা দেবার সময় যে বুকচাপা কষ্টটা হচ্ছিল সিঁড়ি ভেঙে দ্বিতলে ওঠার সময় সেটা ছিল না এটা পরিষ্কার মনে আছে। সচরাচর যেমন হয়— একদল ক্যামেরা-কাঁধে আমাদের দুজনকে ছেঁকাবান করে ধরল। প্রেস-প্রতিনিধিদের মূল লক্ষ্য প্রধান অতিথি, তাই আমি একটু দূরে সরে গিয়ে বসি। একজন ক্যামেরাধারী—বোধকরি তাঁর ঘরওয়ালী আগেই ফতোয়া জারী করে রেখেছেন, "বইমেলায় যাচ্ছ যাও, নাথুরাম গডসের লেখা বই—গণ্ডগোল হতে পারে··· যেদিকে ভিড় দেখবে সেদিকে যেও না"—আমার দিকে এগিয়ে এলেন। বইটার বিষয়ে কী একটা প্রশ্ন করার উপক্রম করতেই বাধা দিয়ে বলি, "সরি, বইটা আমি পড়িনি। তা নিয়ে কোন আলোচনা করতে পারব না।"

ছেলেটি বিস্মিত হল। অথবা বিস্ময়ের অভিব্যক্তির একটা নিখুঁত অভিনয় করল। বলল, কিছুই না জেনে সভাপতিত্ব করতে রাজী হয়ে গেলেন? বাঙলা বইটা না পড়ুন নাথুরামের অরিজিনালখানা ইংরাজিতে পড়ছেন নিশ্চয়?

জুলপির কাছে সাদা চকখড়ির দাগ সত্ত্বেও মনে হল ওর জন্ম হয়েছে গান্ধীহত্যার পরে; অন্তত তখনো ডায়াপার পার হয়ে হাফপ্যান্ট ধরেনি। এসব ক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতা: 'অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স!' তাই প্রতিপ্রশ্ন করি, 'আপনি কোন কাগজের? নাথুরামের জবানবন্দি যে চল্লিশ বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে এ খবর আপনাদের কাগজ কবে প্রথম ছাপে?'

ছেলেটি বললে, থ্যাঙ্কস্!

আমাকে নয়। ব্যবস্থাপকদের তরফে যিনি স্ন্যাক্‌স্ প্যাকেটটা ঐ সাংবাদিকের দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন, তাঁকে।

প্রশ্নকারী অতঃপর অন্যদিকে সরে গেলেন। আমি কফির পেপার-কাপে মন দিলাম।

মুকুল গুহ আমাকে দেখতে পেয়ে পাশে এসে বসল। এককালে সে *আজকাল*-এ সাংবাদিকতা করত। বর্তমানে '*কলকাতা*'পত্রিকার রবিবারের পাতাখানার দায়িত্বে আছে। তার রবিবাসরীয় পাতায় সাতাশে নভেম্বর আমার একটি লেখা ছাপা হয়েছে, ঐ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন বিষয়ে। সে সম্বন্ধেই কিছু কথাবার্তা হল। কফির কাপে চুমুক দিয়ে মুকুল পকেট থেকে বার করল সিগ্রেটের প্যাকেট। আগুনরঙা ডব্‌ল্-প্যাক ক্লাসিক্। যে ব্র্যান্ড আমি খাই। মানে খেতাম। গত বছর। দৈনিক এক প্যাকেট; এক কুড়ি। পয়লা জানুয়ারির পর আর খাচ্ছি না। আজ্ঞে না, ধর্মাবতার—এটাও ঠিক 'হোল ট্রুথ' হল না। বলা উচিত, 'কিনে খাচ্ছি না' বা 'কিনছি না'।

য়োর অনার! আপনি আইনজ্ঞ। সহজেই বুঝলেন—এ একটা সূক্ষ্ম আইনের ফাঁকি। 'পাউন্ড অফ ফ্লেশ'-এর সঙ্গে রক্তপাতের সম্পর্কটা। তাহলে মূল কাহিনীটা আপাতত মুলতুবি রেখে কিছু পূর্বকথনের অবতারণা করতে হয়:

বড়-কন্যা বুলবুল আমার দুই নাতনিকে নিয়ে মার্কিন মুলুক থেকে এসেছিল নভেম্বরে। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ওরা তিনজনে আমেরিকায় ফিরে যায়। অন্তরা, মানে রিন্টি, আমার বড় নাতনি, ভারী বুদ্ধিমতী। ফিরে যাবার আগের দিন সন্ধ্যায়, যখন আমার মনটার হিউমিডিটি ম্যাক্সিমাম, তখন ঘনিয়ে এসে বসল আড্ডা দিতে। হঠাৎ কথাপ্রসঙ্গে বলে বসল, গ্র্যান্ড-পা, তোমার কাছে একটা জিনিস চাইব, দেবে?

চাইবার কায়দা থেকেই আশঙ্কা করি, এর মধ্যে একটা রহস্য আছে। যে জিনিসটার উপর

ওর লোভ হয়েছে তা মোক্ষম কোন কিছু। না হলে আজ এই কয় সপ্তাহের মধ্যে সেটা প্রার্থনা না করে এই আসন্ন বিদায়-কালে এমন শেষ-সন্ধ্যায় চাইছে কেন? তবে মুখ ফুটে যাচ্ঞা যখন করে বসেছে তখন প্রমাণ দিতে হবে ওর দাদু 'অধিগুণ'। কিন্তু কী হতে পারে?

রিন্টি বইয়ের পোকা। গ্র্যান্ড-পার লেখা কোন বইয়ের কপি নয়। কারণ সেটা হলে সে অনায়াসে বইয়ের আলমারি থেকে উঠিয়ে নিত। আমাকে না জানিয়েই। কারণ সে জানে, তার দাদু জনপ্রিয় লেখক না হলেও একটা দুর্লভ রেকর্ডের অধিকারী। তার লেখা সব বই বাজারে পাওয়া যায়। তার গ্র্যান্ড-পার ছিয়াত্তরখানা বইয়ের ভিতর একখানাও আউট অব প্রিন্ট নয়। কোনটাই দুষ্প্রাপ্য নয়। সুতরাং আমার লেখা কোন বই চাইতে সে আসেনি।

তবে কি আমার আঁকা কোন ছবি? যা এ বাড়ির কোন দেয়ালে দেখেছে?

বললুম, নেহাৎ অদেয় না হলে তুই যা চাইবি দেব, চেয়ে দ্যাখ!

—হোয়াট্‌স্ দ্য মীনিং অব 'অদেয়'?

—আরে বাপু আমার ক্ষমতার মধ্যে হওয়া চাই তো।

—আই সী। নো, ইটস্ নট য়োর 'অদেয়'। ইচ্ছে করলেই তুমি তা দিতে পার। অফ কোর্স তোমার খুব কষ্ট হবে দিতে!

এবার আমার মনে হল, ওর মন কেড়েছে বাইরের ঘরের একখানা প্রকাণ্ড ওয়াটার-কালার। 'ওয়াশ'-এ আঁকা। আঁকতে আমার কয়েক-মাস সময় লেগেছে। দৈর্ঘ্যে দেড়-মিটার প্রায়। দ্বিতীয় পুলকেশী চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন ৎসাঙকে অজন্তা দেখাতে নিয়ে আসছেন শোভাযাত্রা করে। কিন্তু অতবড় ফ্রেমে বাঁধানো ছবি তো প্লেনে নেওয়া খুব মুশ্‌কিল। ছবিটা রিন্টিকে দিতে আমার যদিও একটুও কষ্ট হবে না। এবার তাই একটা শর্ত আরোপ করি: যদি না তোমার মায়ের আপত্তি থাকে···

—মম্ আপত্তি করবে না। আই নো!

'আপন পৌরুষ' আর 'ধর্ম' দুই রক্ষা করা গেছে। এবার দাতাকর্ণের মতো দরাজ গলায় বলি, অল রাইট! কী চাস্ বল, আমি দেব।

—ইউ শ্যাল গিভ আপ্ স্মোকিং ফ্রম দ্য নেক্সট্ নিউ ইয়ার্স ডে! প্রমিস্!

ওর গ্র্যান্ড-পা শ্রেফ শির-পা! ক্লীন নক-আউট!

মার্কিন মুলুকে টি-ভিতে ধূমপানের বিরুদ্ধে ধুন্ধুমার প্রচার। রিন্টির তাই ধারণা—সিগ্রেট ছেড়ে দিতে পারলে ওর গ্র্যান্ড-পা আরও অনেক—অনেক দিন বাঁচবে। তাই বিদায়কালীন সন্ধ্যায়, হিউমিডিটি যখন ম্যাক্সিমাম, তখন আমার পাঁজরায় ঐ পাঞ্চটা বেমক্কা ঝেড়েছে।

দাদু-ভার্সেস নাতনি। দাদু ভূতলশায়ী। কানের কাছে কে যেন কাউন্ট করে চলেছে —সিক্স···সেভেন···এইট···নাইন···

মরিয়া হয়ে উঠে বসি, আই প্রমিস! নিউ ইয়ার্স ডে-র পর আর সিগ্রেট কিনব না!

ও দাদুকে 'হাগ' করল। বেচারি রিন্টি। আইনের ফাঁকটুকু ও নজর করেনি।

অষ্টআশি সাল বিগত হবার পর তাই আমি কোনও সিগ্রেট কিনিনি। সামান্য যে কয়টির মুখচুম্বন করেছি তা সিগ্রেট জগতের বেস্ট ব্র্যান্ড: আ সিগ্রেট অফার্ড।

ফ্লাশব্যাকের এখানেই ইতি।

—ফাইভ মিনিটস্ মোর!

—নো ম্যা'ম! হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস্ মোর

অ্যান্টিপোড গ্রান্ড-পা
অ্যাক্কেবারে শির-পা

ফ্যাক্ট। ইতিমধ্যে ডক্টর বোস এসে আবার আমার ই·সি·জি করেছেন। বলেছেন, দৈনিক আড়াই ঘণ্টা লিখতে পারি।

যাক সে কথা। কী যেন বলছিলুম? হ্যাঁ, সেই বইমেলায় সিগ্রেট ধরিয়ে আমি আর মুকুল ততক্ষণে জমিয়ে বসেছি। মুকুল জাতে সাংবাদিক তো—ছিনে-জোঁকের মতো। যে প্রশ্নটা ইতিপূর্বে অনেক কায়দা করে এড়িয়ে গেছি সেটাই পেশ করে বসল আবার, সত্যি বলুন তো দাদা, এমন একটা সভায় সভাপতিত্ব করতে কেন রাজী হয়ে গেলেন?

আমি আমার কলাকৌশল বদলাইনি: প্রতিআক্রমণই হচ্ছে আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা।

বলি, তুমি ঈশান ঘোষের *জাতকার্থনামায়* মহাজনক-জাতক কাহিনীটা পড়েছ?

—না। তা হঠাৎ সে-কথা কেন?

—সেই গল্পের নায়ক কপর্দকহীন অবস্থায় শুয়ে পড়েছিল মিথিলানগরীর পথপ্রান্তে। হঠাৎ বিগত মিথিলাধিপতির রাজহস্তী তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে তুলে নিল, বসিয়ে দিল মিথিলার শূন্য রাজ সিংহাসনে। আমারও সেই হাল! তরুণ কবিদের কবিতাপাঠের আসরে দেখি পিছন দিকের একটি চেয়ার খালি। অথচ অনেকে দাঁড়িয়ে। একটু তদন্ত করতেই মালুম হল চেয়ারটি প্রতিবন্ধী, তার চতুর্থ ঠ্যাঙখানি নড়বড়ে। বহু কায়দায় দেহের কেন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে সজাগ থেকে সেটাতেই বসে শুনছিলুম কবিতা-পাঠ। মাৎ-মাৎ করতে করতে নীরদ হাজরা নামক রাজহস্তী তেড়ে এল আমার দিকে। 'হঁ হাঁ তুম কর কি কর কি' বলতে বলতেই শুঁড়ে জড়িয়ে আমাকে বসিয়ে দিলে সভাপতির গদী-আঁটা চেয়ারখানায়!

আরও মিনিট-পাঁচেক খোশ গল্প করার পর মুকুলকে কে যেন ডাকল। ও উঠে গেল। আমি অতি তৃপ্তির সঙ্গে সেই 'ক্লাসিক' সিগ্রেটটির স্বাদ আস্বাদন করতে থাকি। সে যে কী আরাম, য়োর অনার, কী বলব!

সরি! আমি এতক্ষণ ক্রমাগত একটা বৈয়াকরণ অশুদ্ধ প্রয়োগ করে চলেছি। য়োর অনার নয়। য়োর অনার্স! আমি এতক্ষণ খেয়াল করে দেখিনি হুজুর যে, এনকোয়্যারি কমিশন হচ্ছে ডিভিশন-বেঞ্চে। জাস্টিস্ পাঠিকা মালক্ষ্মী ব্যাপারটা আদৌ বুঝবেন না। জাস্টিস্ পাঠক বুঝবেন যদি ধূমপায়ী হন! তাও একথা খেয়াল রাখবেন হুজুর, গতমাসে আমি দৈনিক এককুড়ি সিগ্রেট খেয়েছি। আর এখন মাধুকরী বৃত্তিতে তিন-দিনে তার দেখা পাই-কি-না-পাই!

প্রতিটি 'পাফ্' গিলছিলাম! দুই লাঙ-এ চক্কর মেরে নাক দিয়ে গল্‌গল্ করে ধোঁয়া বার হচ্ছিল। চুম্বনে-চুম্বনে যখন তাকে দগ্ধ করে চলেছি তখনো আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, সেই কলেজ জীবনের কাল থেকে দীর্ঘ জীবন-সঙ্গিনীর সঙ্গে এই আমার শেষ মিলন, শেষ মুখ-চুম্বন! ও আমার চল্লিশ-বছরের স্মোকার্স-লাইফের শেষ সঙ্গিনী। যাকে বলে, দ্য লাস্ট রাইড টোগেদার! দগ্ধপ্রায় স্টাম্পটা ফেলে দিলাম শূন্য কফির পেপার কাপে। নিবল না। শ্বেতাঙ্গিনী সেই শেষ আনন্দদায়িনীকে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিলাম। তার দাহন জ্বালার অবসান হল। থেঁৎলে গেল সে। আমি আর ফিরে তাকাইনি। তখন তো জানি না···

এবার নেমে এলাম গিল্ড অফিস থেকে মেলাপ্রাঙ্গণে। দু-পা চলতে গিয়েই মনে হল বইমেলায় অসহ্য ধুলো। শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। আঃ! কী করে এরা। জল ছিটায় না কেন? কিন্তু এ কী? প্রতিপদক্ষেপেই তো দেখছি জমি ভিজে ভিজে। চোখ তুলে দেখি একটি লোকও আমার মতো নাকে রুমাল ধরেনি, অথবা কোনও মহিলা শাড়ির প্রান্ত। তাহলে এ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কেন? ধুলো তো নয়।

নিতান্ত কৈশোরকালে আমার 'অ্যাজমা' ছিল, 'হাঁপানি' রোগ আর কি। বিগত অর্ধ শতাব্দীতেও সে কষ্টটা ভুলিনি। কিন্তু আমার হত 'পিরিয়ডিক অ্যাজমা', অর্থাৎ প্রতি বছর শীতে। প্রথমে কাঁচা সর্দি', তারপর চাপা কাশি, তারপর সাঁই-সাঁই। এমন দ্যাখ-না-দ্যাখ কালবৈশাখী ঝড়ের মতো তো সে তেড়ে আসত না। নাঃ! এ ধুলোর জন্যেই হচ্ছে।

এইখানে আমি এক নম্বর ভুলটা বেমক্কা করে বসলাম, হুজুর! আমি সিদ্ধান্তে এলাম—যত শীঘ্র সম্ভব মেলাপ্রাঙ্গণের বাইরে চলে যেতে হবে—যেখানে ধুলো নেই। আমি বুঝতে পারছি যে, ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছি। কিন্তু বুকে ব্যথা-ট্যাথা কিশ্‌সু নেই। হার্ট অ্যাটাক-ম্যাটাক নয়, অন্য কোনও কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এই পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে আমার রক্তচাপ পরীক্ষা করে কোনও নাকউঁচু ডাক্তার কখনও নাসিকাকুঞ্চনের সুযোগ পায়নি।

আমি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে দে'জ, মিত্র-ঘোষ, নাথ ব্রাদার্স ইত্যাদি বহু দূরে। গিল্ড-অফিস হাতের কাছে, কিন্তু সামনে চাপ ভিড়। *আজকাল*-এর স্টলটাও কাছে, কিন্তু সামনে 'কিউ-সরীসৃপ'। অন্যান্য স্টলে আমাকে কেউ চিনবে না। আমি খ্যাতনামা কেউ নই। কিন্তু লেখক বা সাহিত্যিক এ পরিচয়ে তো নয়, আমি অনায়াসে যে কোন স্টলে আর্তরোগীর পরিচয়ে প্রবেশ করতে পারতাম। আমার বাঁ হাতে তখনো গোলাপের মালাটা জড়ানো। লেখক হিসাবে না চিনলেও মিটিং থেকে বেরিয়ে আসা সাধারণ দর্শক আমাকে সদ্যসমাপ্ত সভার সভাপতিরূপে চিনতে পারত।

কিন্তু ভুল ভুলই। আমি আইফেল-টাওয়ার গেটের দিকে পা বাড়ালাম।

ধীর পদে নয়, দ্রুতগতিতে—ধুলোর হাত থেকে রেহাই পেতে।

[22.2.89]

গেটের বাইরে এসে দেখি সামনের রাস্তায় একখানা গাড়ি নেই। বিল্‌কুল ফাঁকা রাস্তা। যাঁরা গ্রহ-নক্ষত্র মানেন তাঁরা বুঝবেন, শনিঠাকুরের এ এক প্যাঁচ। অদৃশ্য শনিঠাকুর রাস্তার ওপারের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছেন, আয়, আয়, এক ছুটে ইদিকে পালিয়ে আয়। একদম দাঁড়াবি না। টানা দৌড়াবি।

আমি ফাঁদে পা দিলুম। এক ছুটে ওপারে চলে যাব বলে নেমে পড়লুম রাস্তায়। আমার বাঁ-দিকে তারামণ্ডল-তক একখানাও গাড়ি নেই, ডান দিকে রবীন্দ্রসদনের মোড়ে লালবাতির সঙ্কেতে গর্জাচ্ছে এক ঝাঁক দৈত্যযান।

গ্রে-হাউন্ড রেস দেখেছেন কখনও? আমি যখন মাঝ-সড়কে তখন সেই খেলটা শুরু হল। লালবাতি হল সবুজ, অর্থাৎ আমার হৃদপিণ্ডে সবুজ বাতি হল লাল। রবীন্দ্রসদনের দিক থেকে এক ঝাঁক গ্রে-হাউন্ড কাকে-খাই কাকে-খাই করতে করতে ছুটে আসছে। আর আমি সেই যান্ত্রিক খরগোশের মতো পড়ি-তো-মরি ছুটে প্রায় আছাড় খেয়ে পড়লুম ও প্রান্তের রবীন্দ্রসদন গেট-এ।

প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। হাঁপাচ্ছি। নিদারুণ হাঁপাচ্ছি। একবার চোখ তুলে দেখলুম।

গেটের ও-প্রান্তে কালো আলখাল্লা পরা এক অতি দীর্ঘকায় পুরুষ পিছনে হাত রেখে কী যেন ভাবছেন। চিনতে অসুবিধা হল না, এমনকি মনে পড়ল, এর রূপকার আর এক কৃষ্ণনাগরিক: কার্তিক পাল।

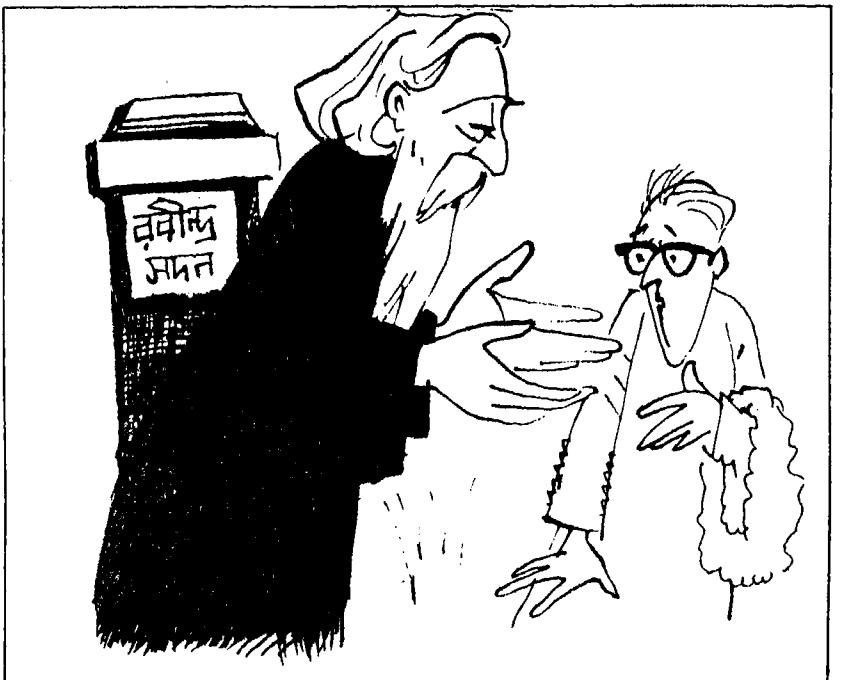

অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না

অনেকক্ষণ নিশ্বাস নিয়ে আবার খাড়া হয়ে দাঁড়ানো গেল। মনে পড়ল, নিজের গাড়ি নিয়ে আসিনি। এসেছি ট্যাক্সিতে। ফিরব কী করে? ট্যাক্সি পাই কোথায়? শৈশবের সেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা ছন্দে আমি এগিয়ে চলেছি দক্ষিণ দিকে—রবীন্দ্রসদনের ও-প্রান্তে সার্কুলার রোডের দিকে। ততক্ষণে ট্রাফিক সিগনালে আবার এক ঝাঁক বাস মোড়ে আটকা পড়েছে। তার অনেকগুলিই যাবে ল্যান্সডাউন বা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড দিয়ে। ঐ দুই সমান্তরাল সড়কের মাঝামাঝি আমার বাড়ি। কিন্তু প্রতিটি বাসের পাদানি যাত্রীভারে 'উপচীয়মান'। বইমেলার ধুলোর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে (বাস্তবে মোটেই তা নয়, আমিই ঐ কথা ভাবছি; পরে ডাক্তার প্রামাণিক বুঝিয়ে দিয়েছিলেন 'বাস' ধরার জন্য মিনিক-দশেক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আমার হৃদপিণ্ড একটু স্বস্তি পাওয়ায়) আমি একটু সুস্থ বোধ করছি। সেন্স অব হিউমারটা ফিরে আসছে। একটা তুলনার কথা মনে হল। আমি যেন মফঃস্বলের এক লিট্‌ল ম্যাগাজিনের অখ্যাত কবি, আর ঐ বাসগুলো সব কলকাতার খানদানি পূজাসংখ্যা। *নবকল্লোল, দেশ, আজকাল, যুগান্তর, আনন্দবাজার*। আমার জান-কবুল কবিতা ওখানে ঠাঁই পাবে না। দু-একটা খালি ট্যাক্সি এল। ভর্তি হয়ে চলেও গেল। নওজোয়ানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সাহস হল না। সাহস হলেও ক্ষমতায় কুলাতো না।

প্রায় মিনিট-কুড়ি অপেক্ষা করে গুটি গুটি সার্কুলার রোড ধরে পুবমুখো চলতে থাকি। রবীন্দ্রসদনের সোনালীরঙের পাইলন-জোড়ার দিকে চোখ তুলে দেখলুম। কেন ও দুটো গড়েছিলুম যেন আমরা? ব্যান্ডো-সাহেব, গোস্বামী-সাহেব, সুজিত আর আমি একসময় এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছিলুম। কিছু মনে পড়ছে না। কীসের প্রতীক ও দুটো? প্রদীপ শিখা? না যুক্তকর? কত ডায়ামেটারের টেন্‌সাইল-ছড় কী-স্পেসিঙে বসানো হয়েছিল যেন?

রবীন্দ্রসদনের এক্সিট গেট থেকে নন্দন এর গেট-এ পৌঁছাতে আমার সময় লাগল পনের মিনিট।

সেই সময় একটি যুবক, গালে চাপ-দাড়ি, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ—নির্ঘাৎ বই-পোকা, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি তখন রবীন্দ্রসদনের আট মিলিমিটার ধুলোর আস্তরণে-মোড়া পাঁচিলে কনুয়ের ভার রেখে হাঁপাচ্ছি। ছেলেটি প্রশ্ন করে, আপনি নারায়ণ সান্যাল নয়? কী হয়েছে আপনার?

বলি, কী জানি, কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছি। একটা ট্যাক্সি ধরে দেবে ভাই?

হঠাৎ কেমন যেন অসহায় বোধ করল। বললে, এখানে তো পাবেন না। ঐ চৌরঙ্গীর একসাইড-মোড় পর্যন্ত আপনাকে হেঁটে যেতে হবে। পারবেন?

পারতেই হবে। ওর কাঁধে দেহভার রক্ষা করে দু-পা চলেই ফের থেমে পড়ি।

—কী হল?

—অত জোরে তো পারব না হাঁটতে।

বেচারি কী বলবে যেন ভেবে পেল না। শেষে হাতঘড়িটা দেখে বললে, আমাকে আবার শেয়ালদায় গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে কি না।

বুঝি ওর অসহায় অবস্থা। হয়তো বাড়িতে মা অসুস্থ, কিংবা স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। তাকে আশ্বাস দিয়ে এসেছে, আরে বাপু সন্ধ্যে রাতেই তো ফিরে আসব। ঘাবড়াচ্ছ কেন?

আমি হাসবার চেষ্টা করে বলি, না, না, ঘাবড়াবার কিছু নেই। তেমন কিছু নয়।

ছেলেটিকে চিনি না। হয়তো সে আমাকে বইমেলায় সভাপতিত্ব করতে দেখেছে। আমার

বাঁ-হাতে গোলাপ-মালার সনাক্তিকরণ চিহ্নটা তখনো লট্‌পট করছে। ও জানতে চায়, কী রকম অস্বস্তি হচ্ছে বলুন তো? বুকে কোন ব্যথা····

—আরে না, না, সেসব কিছু নয়। হার্ট ঠিক আছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। বইমেলার ধুলোয়।

কথাটা ঠিক ওকে বলিনি। নিজের মনকেই তখনো প্রবোধ দিয়ে চলেছি।

ছেলেটি আশ্বস্ত হল: যাক বাঁচালেন। 'না-মানুষী বিশ্বকোষের' সেকেন্ড ভলুম কবে বেরুচ্ছে?

পদচারণ বন্ধ হওয়ায় আমার হৃদপিণ্ডটা একটু নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। আমার বুকের খাঁচায় আবদ্ধ পঁয়ষট্টি বছরের সেই অকৃত্রিম বন্ধুটি কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। এতক্ষণে আমার মস্তিষ্কে কিছু রক্তও পাঠিয়েছে। যন্ত্রণার অনুভূতিটাকে ছাপিয়ে রসিকতা-বোধটা ফিরে এসেছে। হেসে হেসেই তাই বলি, কিছু দেরী হবে। শেয়ালদা থেকে তোমার ট্রেনটা ছাড়ার আগে নয়।

ও হাসিমুখেই দ্রুতপদে বিদায় নিল।

'*আজকাল*' পত্রিকার সেই অজ্ঞাতনামা সাংবাদিকটিকে পুনরায় ধন্যবাদ—তাঁর ঐ শেষ পংক্তিটার জন্য: **"সোমবার নারায়ণবাবুর অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়েছে।"**

ঘটনাচক্রে সেই মফঃস্বলী গ্রন্থপ্রেমিকটি যদি সাত তারিখের '*আজকাল*' দেখে থাকে, তাহলে ঐ শেষ পংক্তিটায় সে কিছুটা সান্ত্বনা খুঁজে পাবে। '*আজকাল*' ছাড়া আর যে কোন খানদানী বাজারে পত্রিকার পাঠক যদি সে হয়, তাহলে অবশ্য আশঙ্কার কিছু নেই। খবরটা আর কোথাও ছাপা হয়নি। কিন্তু '*আজকাল*'-এ খবরটা পড়ে বেচারি সারাজীবন হয়তো একটা অনুশোচনায় ভুগত। আর একটু সময় নিয়ে একটা ট্যাক্‌সি ধরে দিলে বুড়োটা হয়তো বেঁচে যেত। ঐ শেষ পংক্তিটায় তেমনি একটা ইঙ্গিত আছে। প্রথম শ্রেণীর জনপ্রিয়তা লাভ করতে না পারা কোনও অপরাধ নয়! কত কত সাহিত্য যশপিপাসু তো নিত্য মরণাপন্ন অসুস্থতার খপ্পরে পড়ছে। মারাও যাচ্ছে। সে জন্য তো খবরের কাগজের স্পেস্ নষ্ট করা চলে না। সবই মানছি, তবু লোকটার বাঁচবার অধিকার তো স্বীকৃত। —ও হয়তো এসব কথা ভাবত।

পায়ে-পায়ে নন্দন গেট থেকে চলেছি শিশির মঞ্চের প্রবেশদ্বারের দিকে। যেন রামওয়াড়া চটি থেকে কেদারনাথের শেষ চড়াই। হাঁটি-হাঁটি পা-পা। অস্টিচ্যুড-এর বৃদ্ধির জন্যই এই অক্সিজেনের অভাব। আমার আগে আগে যাচ্ছে রানা—আমার আট বছরের পুত্র। খুদে তেনজিং। গায়ে লাল সোয়েটার। মাথায় লাল টুপি। দূরে পাহাড়ের এক বাঁকে হাত তুলে কী যেন বলছে। আমার যাত্রাসঙ্গিনী সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, ঐ দেখ, রানাকে দেখা যাচ্ছে।

রানা হাত তুলে বললে, জয় কেদারনাথজী কি।

না না। এসব কী উল্টোপাল্টা চিন্তা! রানা তো এখন বোম্বাইয়ে।

সে কি আর '*পথের মহাপ্রস্থান*' যুগের সেই আট বছরের খুদে তেনজিং? এখন সে ও·এন·জি·সি·র অফিসার। হয়তো অফিস থেকে এখন বাড়ি ফিরছে। কিন্তু ওর ঐ ডাকটা সার্থক। মনে বল ফিরিয়ে আনার ঐ মন্ত্রটা—জয় কেদারনাথজী কি।

ভয় কি? তীর্থপ্রান্তে পৌঁছাবই।

নন্দন-গেট 'চটি' থেকে শিশিরমঞ্চের 'গেট-চটি' একবেলার পথ নয়—দশ মিনিটের। দশ মিটারেরও। হাঁটি-হাঁটি পা-পা ছন্দে পৌঁছে গেছি শিশিরমঞ্চ-গেট এর চটিতে। ঠিক তখনই

একটা প্রাইভেট গাড়ি—ঠিক মনে নেই, বোধহয় অ্যাম্বাসাডার,রাস্তার কার্ব ঘেঁষে ঘ্যাঁচ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়িতে শুধুমাত্র চালক। স্যুটেড বুটেড। রাইটহ্যান্ড-ড্রাইভ গাড়ি। চালকের মুখটা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ঠোঁটে জ্বলছে সিগ্রেট। আমি ওকে চিনতে পারছি না। কিন্তু মনে হল সে আমাকেই লক্ষ্য করছে। হয়তো আমাকে চেনে। আমি বাঁ-হাতখানা তুলে নাড়লাম। এমন কায়দায় যেন ও আমার কত চেনা—হা-ঈ।

ভবি ভুলল না। ডান-হাত বাড়িয়ে সিগন্যাল দিল। স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ঢুকে গেল ক্যালকাটা ক্লাবের ভিতর।

ওকে দোষ দিতে পারি না। হয়তো প্রথমে ভেবেছিল পরিচিত কেউ। আমার বাঁ হাত তুলে ঐ ছলনা করাটা ভুল হয়েছে। ও ভুল বুঝেছে। ঘটনাটা ক্যালকাটা ক্লাবের বিপরীতে। বৃদ্ধের কব্জিতে নওজওয়ানের অনুকরণে গোলাপের মালা, তার দুটি পাই টলছে। ও সিদ্ধান্তে এল: আমার পাকস্থলীতে পাঁচ-সাত পেগ। এখনি ওর সীটটা নোংরা করে ফেলব।

তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না, অচেনা বন্ধু। এমন ভুল তোমার হতেই পারে। আমার এ জবানবন্দি যদি আদৌ মুদ্রিত হয়, আর ঘটনাচক্রে তোমার নজরে পড়ে, তবে বিশ্বাস কর ভাই—তোমাকে আমি মনে মনে গাল দিইনি। হঠাৎ 'জয় কেদারনাথজী' বলার ঠিক পরেই তুমি গাড়িটা পার্ক করেছিলে তো? তাই মনের ভুলে ধারণা হয়েছিল তোমার সোনার তরীতে আমার একটু ঠাঁই হবে—পি·জি·র এমার্জেন্সি-ওয়ার্ড গেট-তক্।

কী আশ্চর্য! ওকে ক্ষমা করার সঙ্গে সঙ্গে একটা খালি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল ঠিক একই জায়গায়। উপরে লাইট জ্বলছে, মিটার ওঠানো। আমি আর্তনাদ করে উঠি:

—ট্যা—ক্সি।

সতীশ ব্যানার্জি-স্যার আমাদের ইংরেজী ব্যাকরণ পড়াতেন। সেই আসানসোল ই·আই·আর স্কুলে। চল্লিশের দশকে। তখনি তিনি শিখিয়ে ছিলেন 'ক্যাচ' আর 'ক্যাচ-অ্যাট'-এর পার্থক্য কী—We catch a taxi, but a drowning man catches at a straw.

সতীশরঞ্জন-স্যার আজও বহাল তবিয়ৎ। আমার 'লাডলি-বেগম' বইটি তাঁকে সম্প্রতি উৎসর্গ করেছি। এই রচনা যদি তাঁর নজরে পড়ে সেই আশায় ক্ষমা চেয়ে নিই: স্যার, আপনার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আমি গ্রামাটিকাল ভুল করে ট্যাক্সিটাকে 'ক্যাচ-অ্যাট' করতে ছুটে গেলুম।

হ্যাঁ দৌড়েই। ভুল ইংরাজির জন্যই হক অথবা দৌড়ানোর জন্যই হক, এবার বুকে একটা ব্যথা বোধ করলুম। বোধকরি গুরুবাক্য অমান্য করায়।

কিন্তু আমার চেয়েও দ্রুতগতিতে এক দম্পতি ট্যাক্সিটার নাগাল পেল তার আগে। ছেলেটির সাফারি সুট, মেয়েটির চুড়িদার। অবাঙালী। আমি যতক্ষণে ট্যাক্সির হ্যান্ডেলটা 'ক্যাচ-অ্যাট' করেছি তার পূর্বেই মেয়েটি উঠে গেছে পিছনের সীটে; ত্রিশঙ্কু-সাফারি-সুটের একপা গাড়িতে এক পা রাস্তায়। আমি ট্যাক্সির হ্যান্ডেলটা ছেড়ে দিয়ে ছেলেটির মণিবন্ধ 'ক্যাচ-অ্যাট' করলুম। ক্রুদ্ধ যুবকের মুখ থেকে কোনও ভর্ৎসনাবাক্য নির্গত হবার আগেই এক নিশ্বাসে বলে বসি, 'টেক মি টু দ্য এমার্জেন্সি ওয়ার্ড অব্ পি·জি·, প্লীজ।'

ছেলেটি থমকে গেল। ওর হাত চেপে ধরায় গালমন্দ করল না। আপাদমস্তক আমাকে দেখে নিল একবার। আমি কোনক্রমে বললুম, নট ড্রাংক, জাস্ট ড্রাউনিং···

সর্দারজী আংরেজি জানে-কি-জানে-না, জানেন গুরু গোবিন্দজী। কিন্তু সে রামপ্রসাদের দেশে রুজি-রোজগার করে। মদ-মাতাল, মন-মাতাল আর মৃত্যু-মাতালের চরণ-চঞ্চলতার

দিল্‌-তড়প্‌না? য়ো রাত-অন্ধি?

ফারাকটা সমঝাতে পারে। বিশালদেহী সর্দারজী বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে আমাকে সাবড়ে ধরল। অমোঘ আকর্ষণে উঠে এলাম সামনের সীটে, ড্রাইভারের পাশে। বসিয়ে নয়, ও প্রায় শুইয়েই দিল আমাকে।

সাফারি-সুট পিছন থেকে হিন্দিতে নির্দেশ দিলেন ট্যাক্সি ঘোরাতে। যেতে হবে পি·জি তে।

সর্দারজী গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বুঝিয়ে দিল, এখানে ইউ-টার্ন না-মঞ্জুর। তবে চৌরঙ্গীতে পৌঁছে ও ডাইনে মোড় নেবে। এলগিনে ফিন ডাহিনে। পি·জি·র এমার্জেন্সি-ওয়ার্ড তিন-মিনিটকা-ওয়াস্তা।

হিসাবটা মিলল না। কলকাতার সেই চিরাচরিত: মানছি না, মানব না।

মিছিল চলেছে। খোদায় মালুম, কিসের প্রতিবাদ। কার যেন কালো হাত ভেঙে দিতে বলছে, গুঁড়িয়ে দিতে বলছে। আমার নয় নিশ্চয়। যথারীতি যানজট। যতক্ষণ ওদের ঐ 'চলছে-চলবে' চলবে, ততক্ষণ আর পাঁচজনের 'পথের দাবী' ওরা 'মানছি না—মানব না'।

সর্দারজী একটা পাঞ্জাবী খিস্তি ঝাড়ল আপন মনেই।

'সালে তেরি…' টুকুই বুঝলুম। বাকিটা নয়।

বিশ্বাস করুন: সব কালোর মধ্যেই একটা আলোর পরশ আছে। কোন কিছুই সর্বাত্মক মন্দময় নয়। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দো কেনে?' ঈশ্বরকে যদি মানেন, তবে

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তিনি শেক্সপীয়রের চেয়ে বড় জাতের নাট্যকার। লেডি ম্যাকবেথকেই কি নিছক চাইনীজ ইংকে আঁকা গেছিল? 'যানজট' জিনিসটার উপকারিতা আপনারা জানেন না বলেই মনে করেন, সেটা শতকরা শতভাগ আপদ। তাহলে মঙ্গলময় তেমন একটা আপদ পয়দা করবেন কেন? বলুন?

ডক্টর সত্যানন্দ প্রামাণিক আমাকে পরে বুঝিয়ে বলেছিল, 'হয়তো ঐ যানজটের কল্যাণেই পাগলা দাশুর মতো ফিরে এসেছিস্ স্টেজে। তুই অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছিলি তো…'।

আমার অজান্তে ঘণ্টাখানেক ধরে একটা বক্সিং যুদ্ধ হচ্ছে। আমার পাঁজরে-ঘেরা এরিনায়। আমার সওয়া-তিনকুড়ি বছরের অকৃত্রিম বন্ধু হৃদপিণ্ডের সঙ্গে একটা কালো মুখোশধারীর। সওয়া-তিনকুড়ি বছরে তাকে বারে বারে দেখেছি। তবে দূর থেকে। মুখোশটা সে কিছুতেই খোলে না। না ভুল বললাম, একবারই তা খোলে। প্রত্যেকের কাছেই। কিন্তু তার সেই মুখোশ-খোলা মুখের আদল কোন সাহিত্যিক-কবিই বর্ণনা করবার সুযোগ পান না। কারণ তখন আর তাঁর বলার ক্ষমতা থাকে না, 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া'।

দ্বৈরথ সমরে কখনো হৃদপিণ্ড জিতছে কখনও বা মুখোশধারী। প্রথমজনের আত্মরক্ষামূলক লড়াই, দ্বিতীয়ের আক্রমণাত্মক। ট্যাক্সিটাকে দেখতে পেয়ে যেই 'ক্যাচ-অ্যাট' করতে ছুটেছি অমনি কালো মুখোশধারী আমার হৃদপিণ্ডের চোয়ালে ঝেড়েছে একটা মোক্ষম আন্ডারকাট। বেচারি উল্টে পড়েছে। চেতনাহীন। পাঁজরার রিং-এর বাইরে দর্শকদলের প্রথম সারিতেই বসে আছেন বাঞ্ছারামের বাগানলোভী বাবুটির বাবা! সঙ্গী খুঁজছেন তিনি। উল্লাসে চিৎকার করে ওঠেন, সাঁবাস! বেঁস্পতিবারের বাঁরবেলায় ব্যাটা ঘর ছেড়ে বেঁরিয়েছে। দেঁ বেটাকে শেষ করে। নাকটা থেঁৎলে দেঁ।

সর্দারজী আমাকে বুকে টেনে দেবার পর, তার সীটে শুইয়ে দেবার পর, হৃদপিণ্ড জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। 'কাউন্টিং'টা শুনতে পাচ্ছে। যানজটে যখন ট্যাক্সিটা নিথর হয়ে গেল, আমি স্থির হয়ে পড়ে রইলাম, তখন হৃদপিণ্ডটা আবার উঠে দাঁড়াল। না, হার সে মানেনি, নক আউট হয়নি। সে লড়বে!

নেক্সট রাউন্ডে কী হয় দেখা যাক।

যানজট একটু হালকা হয়েছে। বাঁ দিকের লাইনটা সাফ্।

সর্দারজীকে বলি, সিধা নিকাল চলিয়ে, সার্কুলার রোডসে—

ও বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাতেই বলি, হাসপাতাল নহি, ঘর লৌটুঙ্গা। নজদিগই হ্যায়। এ·এ·ই·আই।

পিছন থেকে সফরী-সুট জানতে চান সেটা কোথায়, ঐ A.A.E.I.?

সর্দারজী আমার হয়ে জবাব দিল, মুঝে মালুম।

কলকাতার ট্যাক্সি-ড্রাইভার। এশিয়াটিক স্যোসাইটি, ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি না চিনতে পারে কিন্তু নিশ্চিতভাবে চেনে—লালবাজার, মোটর ভেহিক্‌ল্‌স্ আর A.A.E.I. শেষোক্তটি ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনের মস্তিষ্ক ·কল্যাণ ভদ্রের ঘাঁটি।

মিন্টো পার্ক—বালিগঞ্জ সার্কুলার, টিভলি কোর্ট—শেষ-মেষ এ·এ·ই·আই। দোরগোড়ায় ট্যাক্সিটা যখন থামল তখন আমি এক্কেবারে তরতাজা—ভোরবেলাকার ডুঁইচাঁপাটির মতো। খুব জোরে জোরে বার দুই শ্বাস টানলাম—কোথায় কী, ব্যথা-ট্যাথা কিশ্‌সু নেই।

সাফারি সুট জানতে চাইলেন, আপনাকে কি ধরে ধরে···

—ফিড্‌ল্‌ডী! আই টোল্ড য়ু, আয়াম নট ড্রাংক।

—নেভারদ্যলেস্, ইউ ওয়্যার ড্রাউনিং।

—সেটা অতীত কাল। বর্তমানে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। অসংখ্য ধন্যবাদ।

সর্দারজীর দিকে একখানা বিশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে বলি :তোড়ানি আপ্ রাখ দিজিয়ে।

গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলের আড়ালে লোকটা হাসল কিনা ঠাওর হল না।কিন্তু পাকা ভ্রূর নিচে তার সেই অদ্ভুত দৃষ্টিটা অনেকদিন ভুলতে পারব না। ষোলোটা খুচরা টাকা সমেত লোহার বালা পরা একটা চওড়া কব্জি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে উর্দু-মিশ্রিত খানদানি হিন্দিতে বললে, আমাকে ডেরায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য চার টাকা মজুরি ও জরুর নেবে, এটা ওর করম্। ওয়ার্না ইনসানিয়াতের প্রতি ইনসানের যা ধরম্···

ধর্ম! আশ্চর্য শব্দটা। ভারত ভূখণ্ডে। একজন ইউরোপীয়ান executioner অনায়াসে তার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে মটোর মেকানিক হতে পারে, কারণ সেটা ছিল ডিউটি। একজন

শ্মশান-ডোম বা জল্লাদ তার বাপ-পিতেমোর 'ধরম্' ত্যাগ করতে পারে না। মিসেস্ সিম্‌সনের দ্বিতীয় স্বামী সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধতে পারেন, সীতাদেবীর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পারেন না দণ্ডকবনে গিয়ে নতুন করে একটি পর্ণকুটীর বাঁধতে।

কেঁও কি বহ্ তো উন্‌কে রাজ-'ধরম' থা ন?

কিছু মনে কর না, অজ্ঞাত বন্ধু! 'ইনসান' হিসাবে তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ইতিপূর্বেই ক্ষমা করেছি, ওয়ার্না ইনসানিয়াতের তরফে তোমার সমালোচনা না করলে কথাসাহিত্যিক হিসাবে আমিও যে আমার 'ধরম' থেকে চ্যুত হয়ে যাব, ভাই।

আমাকে টলটলায়মান অবস্থায় তুমি দেখতে পেয়েছিলে। জানি না, চেনা-চেনা মনে হয়েছিল কি না। গাড়ি থামিয়েছ। গোলাপের মালাজড়ানো হাতখানা নড়তে দেখে সিদ্ধান্তে এসেছ—লোকটা অচেনা এবং ডেড ড্রাংক।

কিন্তু 'ইনসানিয়াতের জন্য ইনসানের যা ধরম্' তা তো তুমি মাননি, বন্ধু! তোমার উচিত ছিল গাড়ি থেকে নেমে এসে প্রশ্ন করা: আপনি এমনভাবে টলছেন কেন? কী চান?

জবাবে আমি যদি বল্‌তুম,

"অভয় দাও তো বলি আমার wish কী—

একটি ছটাক সোডার জলে পাকি তিন পোয়া হুইস্কি।" —তাহলে তুমি যা করেছ তাতে আপত্তি করার কিছু থাকত না। কিন্তু···

না ভাই, আন্‌জান ইয়ার! যদি তর্কের খাতিরে ধরে নিই যে, আমরা তিনজনেই মদ-মাতাল, তাহলে স্বীকার করতেই হবে, তোমার ঐ ক্যালকাটা ক্লাবের রয়্যাল স্যালুট আজ সালাম জানাচ্ছে সর্দারজীর কালীমার্কা-মার্কা চোলাইয়ের ভাঁড়টাকে।

[23.2.89]

ট্যাক্‌সিটা চলে যাবার পরেই আমি পাঁচ নম্বর ভুলটা করলুম। পঞ্চম, না ষষ্ঠ? ঠিক হিসেব নেই ধর্মাবতার। বি·ই· কলেজে ছাত্রজীবনে 'ধূমপান আর রাত-জেগে-পড়া বাগর্থের মতো অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত', —এই ধারণা থেকে ধরলে ভুলের সংখ্যার সেঞ্চুরি হয়ে গেছে।

মোট কথা, ঠিক ঐ সময় আমি এন্-এথ্ ভুলটা করে বসলুম।

আমি তিনতলায় থাকি। দ্বিতল রেন্টেড, কিন্তু একতলায় আছেন মেজদি, আছে ভাইপো-ভাগ্নেরা। আমার উচিত ছিল একতলার বৈঠকখানায় বসা। রাত তখন দশটাও বাজেনি। কিন্তু একতলার ডোর-বেল-এ আঙুল না ছুঁইয়ে আমি সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠতে শুরু করলুম।

সিঁড়িটা আমারই ডিজাইনে, হুজুর। ডগ-লেগেড স্টেয়ার। সাড়ে দশ-ইঞ্চি 'ট্রেড', ছয়-ইঞ্চি 'রাইজ'। চারটে ফ্লাইটে মোট চার এগারোং চুয়াল্লিশটা ধাপ, প্লাস প্লিন্থের চারখানা, একুনে দুই-কম হাফ সেঞ্চুরি। দোতলার ল্যান্ডিং-এ মহাত্মাজীর একটি প্রমাণ মাপের আলেখ্য। নন্দলালের ডান্ডি অভিযান অনুসরণে। কালো মোজেইক মার্বেলে সাদা ইন্‌লে কাজ। পরের ফ্লাইটে ধ্যানস্থ স্বামী বিবেকানন্দ। কংক্রিটের অল্‌টো-রিলিভো। দুটোই আমার স্বহস্তে বানানো। বাড়ি তৈরী করার সময় ছুটি নিয়ে সখ করে বানিয়েছিলুম বিশ-বাইশ বছর আগে। প্রতিদিনই ওঠা-নামায় নজরে পড়ে, তবে অভ্যাসে তার গুরুত্ব হারিয়ে গেছে। নতুন কেউ অতিথি এলে হয়তো দাঁড়িয়ে দেখেন, তখন আমিও দাঁড়িয়ে দেখেছি। কিন্তু এই বিশ বছরে ঐ দুই

দ্বিতীয় পুলকেশী হিউয়েন ৎসাঙকে অজন্তা দেখাতে নিয়ে আসছেন

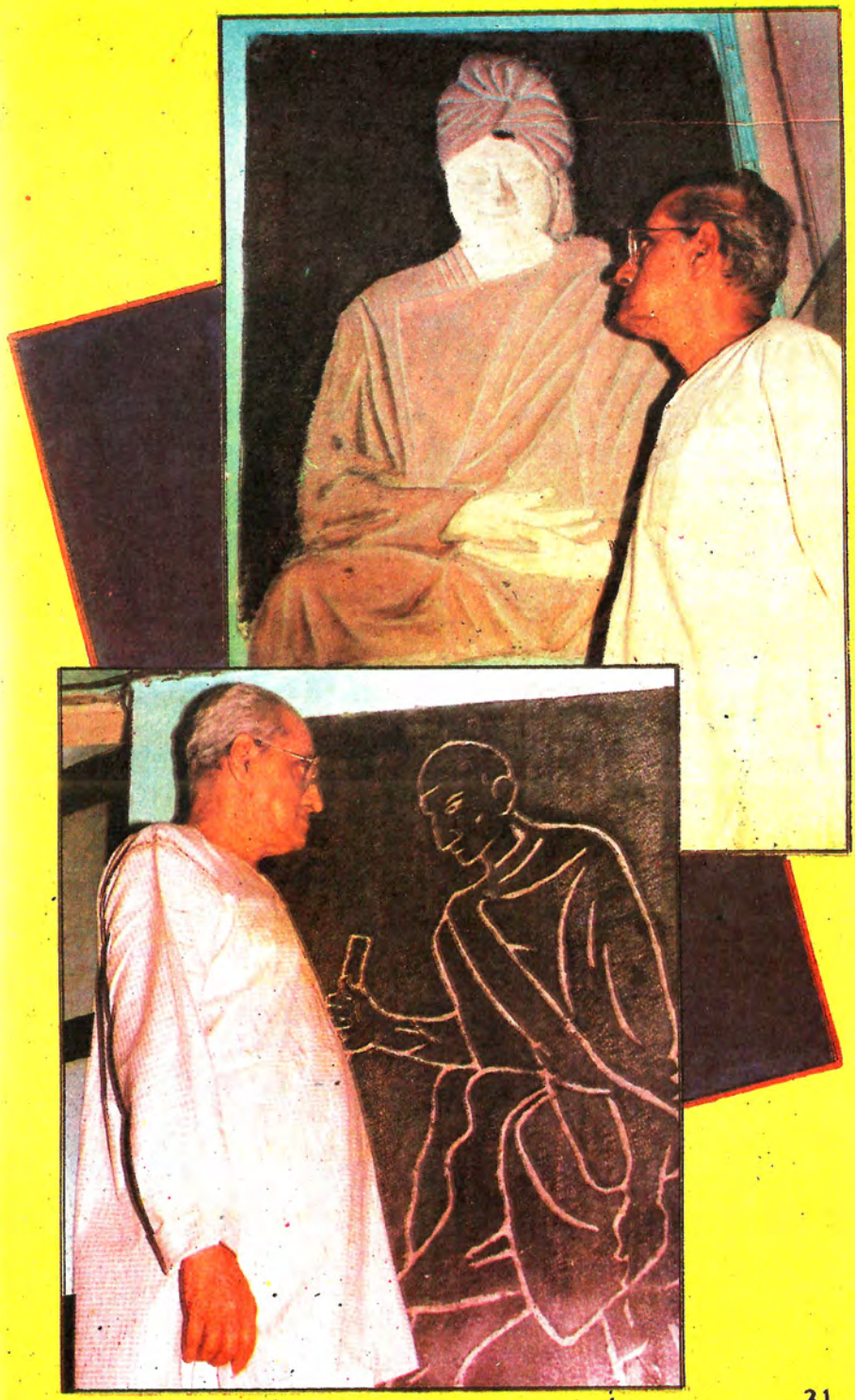

মহামানবের পদতলে বসবার প্রয়োজন, সুযোগ বা দুর্যোগ হয়নি। আজ হল। কারণ এই এন্-এথ্ ভ্রান্তির প্রায় সাথে সাথে—পাঁচ-সাত ধাপ ওঠার পরেই নাছোড়বান্দা 'অ্যাজমার' সেই শ্বাসকষ্টটা ফিরে এল।

মহাত্মাজীর শবরমতী আর স্বামীজীর আলমোড়া আশ্রম অতিক্রম করে তিনতলার তীর্থপ্রান্তে পৌঁছাতে আমার মিনিট পনের লাগল। আমি সিঁড়ির কোনও বাতি জ্বালিনি। রাস্তার আলোই যথেষ্ট। তাছাড়া কেদারনাথের পাণ্ডাজীর মতো পথের প্রতিটি বাঁক আমার মুখস্ত। এই পনের মিনিটে চড়াইয়ের পথে সাক্ষাৎ পাইনি উৎরাই পথের কোনও যাত্রীর। কেউ আচমকা শোনায়নি, জয় কেদারনাথজী কি!

তিনতলায় 'ডোর-বেল' বাজানোর পর প্রথম সাত-দশ মিনিটের ডামাডোলের আর কী বর্ণনা দেব হুজুর? বিছানায় লম্বমান হয়ে ভাগ্নে সুবাসকে বলি নাড়ির গতিটা একবার দেখতে। দেখে বলল, আশি। বাড়িতে ডাক্তার নেই। কিন্তু রক্ত-চাপ মাপার যন্ত্র আছে। পুত্র-পুত্রবধূ ভাইপো-ভাগ্নে সবাই সেটার ব্যবহার জানে। এটি হুজুর, আমার বেটার-হাফের কেরামতি। বছর দুই আগে তাঁর হৃদয়ঘটিত কী এক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। হপ্তাখানেক ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট আর হপ্তা-তিনেক কেবিনে কাটিয়ে ফিরে আসা পর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর রক্তচাপ মাপতে হত। ফলে যন্ত্রটা কিনে ফেলি। সুবাস আমার রক্তচাপ নিল: 150/90। গত বছর-দুই পারদ বাবাজী ঐ এলাকাই নির্দেশ করছেন। কোনক্রমেই বলা চলে না যে, তিনি লক্ষ্মণের গণ্ডীসীমা অতিক্রম করেছেন। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। তাহলে হৃদয়ঘটিত কিছু নয়। গিন্নিকে বললুম, দেখলে? তখন থেকে বলছি, ওসব কিছু নয়। জাস্ট অ্যাস্ফিক্শিয়া—বইমেলার ধুলোয় শ্বাসকষ্ট···

মৌ বললে, সে যাই হোক, আমি ডাক্তারবাবুকে একটা ফোন করছি। দেখে যান একবার।

প্রচণ্ড ধমক দিই তাকে, কেন ঝামেলা করছিস্? দেখছিস্ সব কিছু নর্মাল। পাল্স্, প্রেশার, টেম্পারেচার···

বেটার-হাফ আমার দৃষ্টি এড়িয়ে কন্যাকে চুপ করে থাকতে বললেন। আমাকে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। অহেতুক রাগারাগি কর না। রাতে কিছু খেয়ে কাজ নেই। এই ঘুমের ওষুধটা খেয়ে···

এক কথায় রাজী হয়ে যাই। বাতি নিবিয়ে শয্যা নিলাম।

আমি কবুল খাই-আর-না-খাই, ধর্মাবতার নিশ্চয় বুঝে নিয়েছেন, সে-রাত্রে ডাক্তার ডাকা উচিত ছিল। ই·সি·জি··টা তখনই করার প্রয়োজন ছিল। ভাষান্তরে মৌকে দেওয়া আমার ধমকটা হচ্ছে আমার তরফে—কী বলে ভালো—(n+1)th নম্বর ভুল।

* *

পরদিন ঘুম থেকে উঠ্লুম। যেন অন্য মানুষ। আবছা মনে পড়ছে, গতকাল বইমেলায় কার যেন শ্বাসকষ্ট হয়েছিল না? লোকটার নাম কিছুতেই মনে এল না।

রাত্রে গুরুভোজন সত্ত্বেও পরদিন চিরকাল 'ব্রেকফাস্ট' করি। আজ আক্ষরিক অর্থে উপবাস ভঙ্গ করলুম গুরুপাক ব্রেকফাস্টে। এগ্পোচ্, টোস্ট-মাখন। কেন খাব না? বয়স হয়েছে তাতে কী? ব্লাড-কোরেস্টরেল নর্মাল কি না আমি কি জানি না? হুঁ হুঁ বাবা।

কানের কাছে কে যেন বলল, আঁলবাৎ খাঁবি। খাঁ, খাঁ। যত পারিস অ্যানিম্যাল ফ্যাট।

তখন খেয়াল হয়নি, এখন বুঝতে পারি: বক্তা—বাঞ্ছারামের বাগানলোভী বাবুটির বারা।

বেটার-হাফ নিদান হাঁকলেন, আজ আর বইমেলায় যেতে পারবে না কিন্তু।

আমি বলি, পাগল! ঐ ধুলোয় ভদ্রলোকে যায়?

কারণ ছিল। বিকালে একটি সাহিত্যসভায় আমার প্রধান অতিথি হবার কথা। যুব সংগঠন ক্লাব, ব্যাচারাম চাটুজ্জে স্ট্রীট, বেহালায়। অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক ভবানীদার অনুরোধ মানেই আদেশ। স্বীকৃত হয়ে আছি অনেক দিন আগে থেকেই। এসব মিটিঙে গেলেই ঐ মাধুকরী বৃত্তিতে, না চাইতেই···

কাঁড়া-আকাঁড়ার বাছ বিচারের প্রশ্ন নেই। যাহা পাই তাহা খাই না করি বিচার। ত্রি-পঞ্চমী চার্মিনার সব একাকার। কী প্যাঁচেই যে ফেলে গেছে রিন্টি।

তবে সকালের ব্রেকফাস্ট টেবিলে সে-কথা আমি উত্থাপন করিনি। প্রভাতে মেঘডম্বরু লঘুক্রিয়া হতে পারে, কিন্তু তাতে সারাদিন লেখাপড়ায় বড় ক্ষতি হয়। আমি এক ঢাউস উপন্যাস নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি: রূপমঞ্জরী। এটি শেষ-মেশ হয়ে যাবে আমার লেখা বৃহত্তম উপন্যাস। শ'চারেক পৃষ্ঠা নামিয়েছি। আমি সারাটা দুপুর তাতে মেতে থাকতে চাই। যুব সংগঠন থেকে আমাকে নিতে আসবে বিকাল চারটে নাগাদ। ভবানীদা—মানে, শ্রদ্ধেয় ভবানী মুখোপাধ্যায়—সেই রকমই জানিয়ে রেখেছেন। সে-সময় সচরাচর আমার ঘরওয়ালী তাঁর দিবানিদ্রা শেষ করেন। চায়ের কাপটা ওঁর হাতে পৌঁছানোর আগেই যদি ঝটপট বলে ফেলতে পারি, 'আমি এক্টু বেরুচ্ছি, বুঝলে?'—তাহলে নাইন্টি-পার্সেন্ট চান্স ঘুম জড়ানো-কণ্ঠে একটা প্রত্যুত্তর শুনব, 'বেশি রাত কর না যেন, আর ঐ বইমেলার দিকে···'

বাক্যটা শেষ করতে না নিয়ে আমি শুধু বলব: 'পাগল!'

মাস দুই-তিন একটা অম্বলের ব্যথা হচ্ছে। হোমিওপ্যাথ ডাক্তারবাবু বলেছেন রোজ সকালে কিছুটা প্রাতর্ভ্রমণ করবেন; কিন্তু কবিরাজ মশাই বলেছেন, না, আপনার সর্দির ধাত, শীতকালে সান্ধ্যভ্রমণই বিধেয়। দুই বিধানের মাঝামাঝি রফা করে দিয়েছেন আমার অভিভাবিকা—না, না, মিস্ বিপুলা নন্দী নন—"দু-বেলাই সামান্য পায়চারি করা ভাল"। ফলে, বেহালার যুবসংগঠনে প্রধান-অতিথি হিসাবে··· আর সেখানে কি চা-পানান্তে বয়স্ক কেউ একটি পরিচিত চতুষ্কোণ বাক্স বাড়িয়ে ধরে বলবে না 'আসুন, বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিন।'

বাস্তবে সেসব কিছুই হল না। বিকাল চারটেয় বেহালার ছড়ে বেহাগ শোনার আগেই কানে গেল তার-সানাইয়ের একটা আচম্‌কা ঝঙ্কার, 'আর লিখতে হবে না, ওঠ। পাঁচটার আগে ওঁর চেম্বারে না পৌঁছাতে পারলে বড় ভিড় হয়ে যায়।'

আমি নেই! তলে তলে উনি যে এই ব্যবস্থা করেছেন তা আমি আন্দাজ করিনি।

ডক্টর সুহৃদ বোস আজ বছর-দুই ওঁকে মুঠো মুঠো নর্মাডেট-অ্যাসিটেন-নিকার্ডিয়া ইত্যাদি কীসব হাবিজাবি খাইয়ে চলেছেন। কী দাম সেসব 'হৃদয়-বিদারক' ওষুধের। দৈনিক ডবল-প্যাক ক্লাসিককেও ছাপিয়ে যায়। সেই কার্ডিওলজিস্ট আমার 'অ্যাজমা'-র চিকিচ্ছে করবেন—'অভিভাবিকা' সেই জাতের একটা ফর্মান জারি করে বসেছেন।

এই রকম মানসিক অবস্থাতেই বোধকরি অমন শান্ত শিষ্ট কবি-মানুষটি মনে মনে গাল পেড়েছিলেন, "রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা কঠোরা স্বামিনী···।"

অগত্যা ট্যাক্সি নিয়ে ডাক্তারবাবুর চেম্বারে। কিউ-সরীসৃপের অংশীদাররূপে আমাদের যখন সুযোগ এল, যুগলে পর্দা সরিয়ে প্রবেশ করলুম ওঁর চেম্বারে। চিরাচরিত রীতিতে ওয়ার্স-হাফকে উনি পাত্তাই দিলেন না। সাবেক রোগিণীকে প্রশ্ন করেন, এখন কেমন আছেন বলুন? পুরী ঘুরে এলেন?

দুটি প্রশ্নকেই উপেক্ষা করে উনি বললেন, আজ আমি নই, রুগী উনি।

ডক্টর বোস সবিস্ময়ে আমার দিকে এতক্ষণে তাকিয়ে দেখলেন। সুযোগ বুঝে আমি যুক্ত-করে ওঁকে নমস্কার করে হাসবার চেষ্টা করলুম। ডক্টর বোস বলেন, এ-ঘরের বাইরে উনি এঞ্জিনিয়ারও হতে পারেন আবার সাহিত্যিকও হতে পারেন, কিন্তু এই চার-দেয়ালের চৌহদ্দিতে ওঁর একমাত্র পরিচয় আমার পেশেন্টের 'এস্কর্ট'।

ভবি তাতে ভুলছে না দেখে ওঁকে প্রশ্ন করতেই হল, বলুন, কী কষ্ট হচ্ছে আপনার?

আমি হাসি হাসি মুখে বলি, কিশ্‌সু না। এখন আমি ভোরবেলাকার ভুঁইচাঁপাটির মতো··· আই মীন, সন্ধ্যাবেলার সন্ধ্যামণির মতোই তরতাজা। তবে গতকাল বইমেলা···

ধৈর্য ধরে গতকাল সন্ধ্যায় বইমেলায় আমার সেই 'অ্যাজ্‌মাটিক' আক্রমণের বিবরণটা শুনলেন। তারপর বললেন, নভেম্বরের মাঝামাঝি আপনি বলেছিলেন বুকে একটা অম্বলের ব্যথা হয়। আমি ওষুধ দিয়েছিলাম। সে ব্যথাটা সেরেছে?

নিদারুণ লজ্জা পেলুম। সারেনি। ওয়াকিবহাল শুভানুধ্যায়ীরা পরামর্শ দিয়েছিলেন, বদহজম বা অম্বলের কোনও আলোপ্যাথিক চিকিৎসা নেই। ফলে তাবিজ কবচ বাদে—ওসবে বিশ্বাস করি না—কোব্‌রেজি এবং হোমিওপ্যাথী দুটোই করেছি। হাকিমী করিনি। কাউকে চিনি না। আর লেডি ডাক্তারের কাছে যাইনি— 'অভিভাবিকা' তো বাড়িতেই মজুত।

ডাক্তারবাবু নাড়ি দেখলেন, রক্তচাপ দেখলেন। পেড়ে ফেললেন নিরীক্ষা-শয্যায়। হাতে-পায়ে বাঁধন দিয়ে ই·সি·জি· করলেন। তাঁর সেই বিচিত্র যন্ত্র থেকে অতিদীর্ঘ একটা গোখ্‌রো সাপের খোলস বার হয়ে এল। তেমনি চক্‌রা-বক্‌রা। উনি অদ্ভুত এক-জোড়া চোখ মেলে সেই সাপের খোলসটা দেখতে থাকেন। পাক্কা পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড। আমার মনে হচ্ছিল, ডক্টর বোস 'অ্যানাটমি' বা 'ফিজিওলজি'র পরীক্ষা দিতে 'হল'-এ এসেছেন কিন্তু প্রশ্নপত্র যেটা বিলি করা হয়েছে সেটা 'হিব্রু' বা সংস্কৃতের।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, স্ট্রেঞ্জ্‌। আপনার একটা হার্ট-অ্যাটাক হয়ে গেছে।

—হয়ে গেছে? অতীতকাল? কবে?

—'কবে' তা এখনি বলা যাচ্ছে না। কাল, পর্শু, দশদিন আগেও হতে পারে।

মুখে বলিনি, মনে মনে বলেছিলুম—এটা কী বলছেন স্যার? 'দোষী জানিল না কী দোষ তাহার, বিচার হইয়া গেল?' দিন-চারেক আগে সস্ত্রীক ছিলুম বহরমপুরের পি· এইচ· গেস্ট হাউসে। ফেডারেশন অব্‌ কন্ট্রাকটার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় প্রধান-অতিথি হিসাবে। দশদিন আগে ছিলুম পুরীতে। তাও সস্ত্রীক। পুরী হোটেলের ছয় তলায় একটি দক্ষিণের ঘরে। লোডশেডিং থাকায় একবার হেঁটে ছয়তলায় উঠেছি। এক্ষেত্রে কী বলতে পারি, বলুন? একবার ভাবলুম জিজ্ঞাসা করি, 'এটা কি সম্ভব, ডাক্তারসাহেব? প্রাতিঃকালে বমি হয় কিনা রোগী তাও Zনৃতি পারবে না?' কিন্তু ওঁর থমথমে মুখখানা দেখে সে-কথা বলার সাহস হল না। ফিরে দেখলুম অভিভাবিকার দিকে। তিনি তাকিয়ে আছেন, কিন্তু মনে হল, ধ্যানস্থ। আমতা আমতা করে বলি, মানে··· ইয়ে··· সাম ইন্ডিকেশন অফ স্লাইট মাইয়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাক্···

উনি আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, শুনেছি আপনি নিত্য-নূতন বিষয়বস্তু নিয়ে লিখতে ভালবাসেন। কার্ডিওলজি-র বিষয়ে কি কোনও বই-টই লিখছেন?

আমি নিরতিশয় লজ্জিত। বলি, আজ্ঞে না, না। কী যে বলেন!

—তাহলে শুনে রাখুন—সাদা বাঙলায় আপনার একটি ফুল-ফ্লেজেড হার্ট-অ্যাটাক হয়ে গেছে। অ্যান্ড য়ু হ্যাভ সার্ভাইভড্।

সম্মুখবর্তিনী নির্বিকার। একটুও নড়ে-চড়ে বসল না। এটাই বোধহয় দু-কুড়ি সাতের দুনিয়াদারীর নিয়ম। কখনো লায়ের উপর গাড়ি, কখনো গো-গাড়ির উপর লা। দু-বছর আগে ঐ নির্বিকার মহিলাটির রক্তচাপ উঠেছিল 284/140। এখন কত জানি না। এসব কথা ওঁর সামনে বলা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না; কিন্তু বলছেন যিনি তিনিই যে স্বয়ং···

ডক্টর বোস টেলিফোনটা তুলে নিয়ে কী-একটা নম্বর ডায়াল করলেন। পরমুহূর্তেই তাঁকে বলতে শুনি, ডক্টর প্রামাণিক ? ···হ্যাঁ আমিই। আপনি কি এখন একবার আমার চেম্বারে আসতে পারবেন ?··· না, না, সে সব কিছু নয়। আপনার ক্লাসফ্রেন্ড মিস্টার নারায়ণ সান্যাল এখানে বসে আছেন···হ্যাঁ হ্যাঁ সস্ত্রীক। একটু কনসাল্টেশন···

ডক্টর সত্যানন্দ প্রামাণিক আমার স্কুলের সহপাঠী। একই বছর আমরা ম্যাট্রিক দিই। ঠিক পাশের বাড়িটাতেই থাকে। মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই সে এসে গেল। এবং এসেই একটা ধাক্কা খেল। স্বাভাবিক। আমি সস্ত্রীক ডক্টর বোসের চেম্বারে আছি শুনে সে যে আশঙ্কা করেছিল তা নয়। আমি তখনও নিরীক্ষাশয্যায় শায়িত। হাতে-পায়ে বন্ধন।

দুই ডাক্তারে শুরু হল গুজগুজ ফুসফুস। সেই গোখ্‌রো সাপের খোলসের উপরে দুজনে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আমার পঞ্চাশ বছরের পুরানো সহপাঠী বন্ধু একবার আমাকে জিজ্ঞেস্ পর্যন্ত করল না—' প্র্যাক্তিকালে ' আমার বমি হয় কি হয় না। একবার মনে হল আলেকজান্ডার গ্রেহাম বেল-এর কোনও মতবাদ নিয়ে ওঁরা আলোচনা করছেন—চিৎপটাং অবস্থায় 'বেলস্ ভিয়ু' শব্দটা কানে গেল। তারপর শুনতে পেলাম গৃহিণীর কণ্ঠস্বর, আপনারা যেখানে ভাল বোঝেন।

ডক্টর বোস আবার তুলে নিলেন টেলিফোনটা। কথাবার্তায় বুঝতে পারি সেটা বেগবাগান নার্সিং হোম। সতুকে বললেন, বেড পাওয়া যাবে।

সতু বলল, তাহলে 'বুক' করুন। বলুন, আমিই পেশেন্টকে নিয়ে যাচ্ছি···

যা ব্বাবা। সুস্থ সবল মানুষটাকে···

ডক্টর সত্যানন্দ প্রামাণিক আজ না হয় বিলাতী ডিগ্রিধারী জাঁদরেল ডাক্তার। কিন্তু সেও তো এককালে সতীশবাবু-স্যারের কাছে ইংরেজি গ্রামার পড়েছে। তারও তো বোঝা উচিত, মার্জারধৃত মূষিকবৎ এমনভাবে বন্ধুর জামার কলার 'ক্যাচ-অ্যাট' করায় নেসফিল্ড-সাহেবের নিষেধ আছে।

তিনজনে সার বেঁধে বার হয়ে আসি। ঠিক পাশের বাড়িখানাই সতুর। ও ডোর-বেল বাজালো। খুলে দিল কণিকা, বন্ধুপত্নী। মিনিট-দশেক আগে যখন এ বাড়ি ছেড়ে ডক্টর বসুর চেম্বারে কন্‌সাল্‌টেশনে যায় তখন সতু বোধকরি তার অভিভাবিকাকে জানিয়ে গেছিল যে, আমি সস্ত্রীক ডক্টর বোসের ঘরে হাজির। আমার স্ত্রীর দুই বছর আগের কীর্তিকাহিনী কণিকার ভাল রকমই জানা। সে আমার স্ত্রীর হাত ধরে একটা সোফায় বসিয়ে দিল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, একটু গরম দুধ-টুধ···

সত্যানন্দ বললে, কিছু দরকার নেই। আমাদের এক্ষুনি বেগবাগান নার্সিং হোমে যেতে হবে। দাঁড়াও ! একটা ট্যাক্সি ডাকার ব্যবস্থা করি।

সতু আমারই বয়সী। রাতে ড্রাইভ করে না। বাড়ির ড্রাইভারকে আগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছে।

ও বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে ওর ভাইপোকেই বোধহয় নির্দেশ দিল একটা ট্যাক্সি ডেকে আনতে, বেগবাগান নার্সিং হোম যেতে হবে।

আমিও বার হয়ে এসেছি। সবিতা, আমার স্ত্রী, নিথর হয়ে বসে আছে সোফায়। এই সুযোগে কণিকা বারান্দায় এগিয়ে এল। ফিস্ ফিস্ করে আমার কানে কানে বলল, আপনি কিছু ভাববেন না নারান্দা, গতবারের মতো এবারও উনি ভাল হয়ে ফিরে আসবেন। মনকে শক্ত করুন।

প্রথমটা একটু হকচকিয়ে গেলেও ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

কণিকার ধারণা, সতু আর আমি সবিতাকে তোল্লাতুল্লি করে বেগবাগান নার্সিং-হোমে নিয়ে যাচ্ছি, মার্জারধৃত মূষিকবৎ।

আর তাতেই সবিতা ধ্যানীবুদ্ধের 'স্ত্রীয়াম-উ' হয়ে বুদ্ধুর মতো নিশ্চুপ বসে আছে।

বেগবাগান নার্সিং-হোমে যাওয়ার পথেই পড়ে আমার বাড়ি। ট্যাক্সিটা আমার বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে সতু আমার স্ত্রীকে বললে নেমে যেতে,—পাজামা, তোয়ালে, দাঁতমাজার ব্রাশ ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে একটু পরে নার্সিং হোমে আসতে। সহজ গলায় কায়দা করে জানতে চাইল, রানা এতক্ষণ বাড়ি ফিরে এসেছে নিশ্চয়।

সবিতা ওকে জানালো, রানা এখন বোম্বাইয়ে পোস্টেড। তবে বাড়িতে ভাইপো বা ভাগ্নে কেউ না কেউ আছেই। দশ-পনের মিনিট বাদে নার্সিংহোমে আসা কোন ব্যাপারই নয়। আমি বলি, বাল্লিশের নিচে প্যারী ম্যাসনের একটা ডিটেকটিভ বই আছে, সেখানাও নিয়ে এস।

সতু সিক্ত-মার্জারের ভূমিকায় সামনের সীটে চুপচাপ বসে রইল। আপত্তি করল না।

আমার ধারণা, নার্সিং-হোমে যাচ্ছি কিছু একটা চেক-আপ করাতে। রাতে থাকব কেবিনে। বেড-সাইড ল্যাম্প থাকলে ঐ রহস্যোপন্যাসটি শেষ করায় কেউ আপত্তি করবে না। সবিতা কতটা জানে খোদায়-মালুম, কিন্তু সত্যানন্দ জানে আমাদের ধারণাটা ভ্রান্ত। ঠিক সেই মুহূর্তে ট্যাক্সির গর্ভে আমার জীবন একটি সূক্ষ্মসুতোয় ঝুলছে।

ই·সি·জির গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসা সেই অতিদীর্ঘ গোখ্‌রো সাপের খোলসটা তা জানিয়েছে ওঁদের, দুই ডাক্তারকে। যে-কোন মুহূর্তে আমার নাকি দ্বিতীয় আক্রমণ হতে পারে। আমার ক্লান্ত হৃদ্‌পিণ্ডটা আর এ এলোপাথাড়ি মার সহ্য করতে পারছে না, টলছে। আর কালো মুখোশধারীটা প্রতীক্ষা করছে সুযোগের—রেফারির হুইসেল-এর ধ্বনি।

সত্যানন্দ জানে, আমার স্ত্রী কী জাতের হার্টের রুগী। তাই তাকে কায়দা করে নামিয়ে দিল আমার বাড়িতে, অন্য কোনও 'এস্‌কট'-সহ সে যেন নার্সিংহোমে আসে। কায়দা করে জেনে নিল, আমার একমাত্র পুত্র, রানা, এখন কোথায়।

নার্সিং হোমের দোর-গোড়ায় ট্যাক্সিটা দাঁড়ালো। সতুই ভাড়া মেটালো। দুজনে এগিয়ে গেলুম রিসেপশান কাউন্টারের দিকে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটি ডক্টর সত্যানন্দ প্রামাণিককে চেনে; চেনে কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অ্যানাস্‌থেশিয়া-বিশেষজ্ঞরূপে। অল ইণ্ডিয়া অ্যানাস্‌থেটিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্টরূপে। তাই ডক্টর সুহৃদ্ বসু যখন টেলিফোনে জানিয়েছেন যে, পেশেন্টের সঙ্গে স্বয়ং ডক্টর প্রামাণিক আছেন, তখন সে নিজেই দুইয়ে-দুইয়ে চার করেছে: পেশেন্ট অচৈতন্য! একটা জব্বর অপারেশন হতে চলেছে। ভি·আই·পি তো বটেই। না হলে ক্লোরোফর্ম দিতে ডক্টর প্রামাণিক স্বয়ং আসবেন কেন? তাঁর ফী কত তা ও জানে!

ইয়ে····কোন্‌টি রোগী বলুন তো?

আমাদের দুজনকে এগিয়ে আসতে দেখে মেয়েটি শশব্যস্তে সত্যানন্দকে প্রশ্ন করে, আপনি কি স্যার ঐ ট্যাক্সিতে এলেন?

সত্যানন্দ একটু অবাক হয়ে বললে, হ্যাঁ। কেন?

মেয়েটি উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়, ট্যাক্‌সিটা যে চলে যাচ্ছে, স্যার!

—তাই তো যাবে। ওর ভাড়া যখন মিটিয়ে দিয়েছি তখন···

—কিন্তু আপনার পেশেন্ট?

এতক্ষণে নজর হল স্ট্রেচারবাহকেরা দু'জন অ্যাটেনশানে দাঁড়িয়ে আছে। সত্যানন্দ বুঝল, ভুলটা কোথায় হচ্ছে। বুড়ো আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিল।

আমি নিদারুণ লজ্জা পেলুম। এই জন্যেই বরের মাথায় একটা টোপর দেওয়ার রেওয়াজ। বিবাহবাড়িতে পৌঁছানোর পর কাউকে জিজ্ঞেস করতে হয় না, কোনটি বর গো?

নাম-ধাম সত্যানন্দই লেখালো। দুজনে সরে এলুম লিফটের দিকে। মেয়েটি অবাকচোখে আমাকে দেখছে। কেন? ও কি আমার নামটা জানে? বই-টই পড়েছে? নাকি এমন একটা বেহায়া পেশেন্ট সে আগে কখনো দেখেনি যে, 'লাজের মাথায় হানিয়া বাজ' হাঁটতে হাঁটতে ইন্‌টেনসিভ কেয়ার ইউনিটের দিকে হাঁটা ধরে।

অবশ্য আমার তখনো ধারণা, আমি যাচ্ছি কোনও কেবিনে।

লিফ্‌টা থামল ইনটেনসিভ কেয়ার য়ুনিটের সামনে। সত্যানন্দ জুতো খুলে হুস্ করে ভিতরে ঢুকে গেল। আমার নজরে পড়ল ইংরেজিতে বিজ্ঞপ্তি লেখা আছে, বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ। আমি বহিরাগত। দাঁড়িয়ে রইলুম। একটু পরে দরজাটা ফাঁক হল, সতু উঁকি মেরে বললে, কী হল? আয়?

ও দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে দুজন সিস্টার এগিয়ে এসেছে। আমি নিচু হয়ে জুতোর স্ট্র্যাপটা খুলবার উপক্রম করতেই দু-দিক থেকে দুই সিস্টার আমার বাহুমূল চেপে ধরে:

—ও কী! ও কী করছেন?

যা ব্বাবা! কী এমন অন্যায়টা করেছি? নিজের পায়ের জুতোর স্ট্র্যাপ্ নিজে-হাতে খুলছি!

ওরা প্রবল আপত্তি জানালো। সেটা নাকি বে-আইনী! আমি জুৎ করে ওদের সঙ্গে এ নিয়ে বিতণ্ডা করতে পারলুম না। প্রায় তোল্লাতুল্লি করে দুজন ওয়ার্ড-অ্যাটেন্ডেন্ট আমাকে পেড়ে ফেলল একটা বেড-এ।

মনিব্যাগ, ঘড়ি, কলম, পকেট-ডায়েরি সব ছিন্তাই হয়ে গেল। আর আমার পঞ্চাশ বছরের পুরানো বন্ধুটি দাঁড়িয়ে দেখল। কড়ে আঙুলটি পর্যন্ত নাড়ল না। মেয়েটি—তখনও জানি না ওর নাম জবা—পাঞ্জাবির বোতামটা খুলবার উপক্রম করতেই বললুম, ওটা ছিন্তাই করে লাভ নেই। সোনার নয় ওটা। রোল্ড-গোল্ড!

সিস্টার জবা—সিস্টার থোড়াই, আমার বড় মেয়ের বয়সী, এক গাল হেসে বললে, বোতাম না খুলে পাঞ্জাবিটা গা থেকে খুলব কী-করে?

বুঝুন কাণ্ড! শুধু পাঞ্জাবি নয়, গেঞ্জি, ধুতি, মায় ড্রয়ার! এই নাকি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের স্ত্রী-আচারের কানুন। যতই সাজগোজ করে আস, টোপর থেকে গেঞ্জি সব খুলে কনের বাড়ির দেওয়া পোশাক পরতে হবে। অসীম দয়া—বামুনের পৈতেগাছটা ওরা কেড়ে নেয়নি!

ছোট্ট ঘর। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। একটি মাত্র জনকে-বেড। জানলার বালাই নেই। শোয়ার পরেই আমার বুকে কী-সব জিয়নকাঠি আট্‌কে দিল। মাথার কাছে চৌকো একটা যন্ত্তর—পকেট টি·ভি· সেটের মতো। তাতে ক্রমাগত একটা সবুজ গ্রাফ আঁকা হয়ে যাচ্ছে। তখন বুঝিনি, এখন শুনছি তাকে নাকি বলে 'মনিটর' যন্ত্তর—টি·ভি· স্ক্রীনে একটা বক্সিং টুর্নামেন্টের ফাইনাল রাউন্ডের খেলা দেখানো হচ্ছে সাঙ্কেতিক-ভাষায়। একটি বৃদ্ধ হৃদপিণ্ডের সঙ্গে একটি বক্সার ইন দ্য-ব্ল্যাক, কালো মুখোশধারীর।

একটু পরেই ঘরে এল আমার স্ত্রী। দিব্যি হাসি-হাসি মুখ। বললে, কেমন জব্দ! কথা শোন না যেমন! সারা রাত এখন এখানে আটক থাক।

আমি ম্লান হাসলুম। কেমন যেন ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। জবাব দিলুম না।

জবা আমার ব্লাড-প্রেসার নিল। তাকে জিজ্ঞেস্ করলুম, কত? 150/90 ?

ও মিষ্টি হেসে বললে, জানেন না? আমাদের বলতে নেই! গোপনে বলছি: নর্মাল!

ধর্মাবতার! বিশ্বাস করুন: স্ত্রীলোক মাত্রেই অভিনেত্রী। দুজনেই যে আমাকে টুপি পরাচ্ছে তা তখন বুঝিনি। বাস্তবে তখন আমার সিস্টলিক একশ'র কাছাকাছি। হৃদপিণ্ডটা ধুঁকছে। অথচ কী হাসি-হাসি মুখে জবা ডাহা মিথ্যেটা ঝাড়ল!

আর আমার চল্লিশ বছরের সহধর্মিণী! কোন সাহসে তাঁকে এতদিন অকুণ্ঠ বিশ্বাস করে এসেছি? সংসার না করে ফিল্‌ম্-লাইনে গেলেই পারতেন? কী দারুণ অভিনয় করে যাচ্ছে।

জানি, এ আমার হেয়ার-সে এভিডেন্স। স্বচক্ষে দেখা ঘটনা নয়। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলাকে একবার সাক্ষীর কাঠগড়ায় তুলুন, হুজুর, আমি পি· কে· বসুর মতো জেরায়-জেরায় প্রমাণ দিতে পারি—এ ঘটনা আদ্যন্ত বাস্তব।

বাস্তব ঘটনা—আমার অ্যাডমিশনের আধঘণ্টার ভিতরেই ওরা আসে। সবিতা, আমার কন্যা মৌ আর ভাগ্নে সুবাস। আই·সি·ইউ· ইন-চার্জ মাত্র একজনকে ভিতরে আসতে দেন। সতর্ক করে দেন, আমাকে কোনভাবে উত্তেজিত না করতে। আর রোগী কেমন আছেন প্রশ্নের জবাবে ডাক্তারবাবু জানান: বাহাত্তর ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা সম্ভবপর নয়! ডক্টর-ইন-চার্জ অবশ্য জানতেন না, সবিতা দৈনিক চারটি অ্যাসিটেন ও তিনটি নর্মাডেট খায়। গত দু'বছরের মধ্যে তার স্বামী তাকে কোথাও একা যেতে দেয়নি।

সবিতা নাকি জানতে চেয়েছিল, আমাদের একমাত্র পুত্র বোম্বাইয়ে আছে, তাকে টেলিগ্রাফ করে দেবে কি না। জবাবে ডাক্তারবাবু একটি প্রতিপ্রশ্ন করেছিলেন, ট্রাংক-টেলিফোনে যোগাযোগ করা বুঝি সম্ভবপর নয়?

স্থির করে রেখেছিলুম, প্যারী ম্যাসনের বইটা নিয়ে সবিতা এলে রাত্রে ওকে সাবধান করে দেব, রানাকে কিছু না জানাতে। চেক-আপ-এর ব্যাপারটা আজ রাত্রে চুকে যাক, কাল আমিই তাকে চিঠি লিখে দেব, যে আমার অজান্তে একটা হার্ট-অ্যাটাক হয়ে গেছে। ভয়ের কিছু নেই।

কিন্তু সবিতা যখন এল তখন আমার কেমন যেন ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। বোধহয় ঘুমের ওষুধ ওরা কিছু খাইয়ে দিয়েছে। ও জানতে চাইল, শরীরে কোন কষ্ট হচ্ছে? বললুম, না। বড় ঘুম পাচ্ছে শুধু। ও বললে, তাহলে ঘুমাও। ভয় পেও না। কাল সকালেই আসব।

আমি মনে মনে হাসি। কী বোকার মত কথা। ভয় পাব কেন? আমি কি কোন মেজর অপারেশন করাতে এসেছি যে, জীবনমৃত্যুর সমস্যা? একটু পরে সত্যানন্দও বিদায় নিয়ে চলে গেল। সে যে এতক্ষণ ছিল তা ভাবতে পারিনি।

তার কতক্ষণ পরে? রাত তখন কয়টা? কী জানি। আমার তন্দ্রা ভাবটা ছুটে গেল। পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এল আমার। এ কী! সেই নাছোড়বান্দা অ্যাজমার ব্যথাটা! আমি উঠে বসতে গেলুম, দু-পাশ থেকে দুজনে চেপে ধরল আমার বাহুমূল। একটা যান্ত্রিক লিভার ঘুরিয়ে আমার মাথাটা একটু উঁচু করে দিল। ক্রমেই শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে আমার। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে!

এই প্রথম প্রণিধান করলুম—এটা অ্যাজমা নয়! এখানে ধুলোর কণামাত্র নেই। জবা একটা রবারের নল আমার নাকে প্রবেশ করিয়ে দিল। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে! জীবনমৃত্যুর ফাইনাল খেলাতেই শুধু অক্সিজেন দেওয়া হয়—এই রকম একটা ভ্রান্ত ধারণা সবারই অবচেতনে থাকে।

এই প্রথম বুঝতে পারি, আমি মারা যাচ্ছি! সজ্ঞানে!

য়োর অনার্স! আমি আইনজ্ঞ নই। কিন্তু পি· কে· বাসু বার-অ্যাট্-ল-র সান্নিধ্যে আমার এটুকু সাধারণজ্ঞান আছে যে, সাক্ষী কী দেখেছে, কী শুনেছে, শুধু তাই বলতে পারে—'কী ভেবেছে' তা তার এজাহারে বলবার অধিকারী নয়। আমি জনপ্রিয় সাহিত্যিক না হলেও জানি, এ আদালতে দু-চারজন এসেছেন যাঁরা জানতে উৎসুক—ঐ বিশেষ মুহূর্তে আমার কী মনে হয়েছিল! জীবনমৃত্যুর সীমানায় দাঁড়িয়ে। এ-নিয়ে যদি কখনো স্মৃতিকথা লিখি তাহলে তা জানাব। আপাতত সে-কথা উহ্য রাখতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ আশঙ্কা হচ্ছে জনপ্রিয় বিপক্ষ-কাউন্সেল এখনি হাঁকাড় পাড়বেন: অবজেকশন!

অনেকদিন পরে, কেবিনে যাবার পর জবাকে আমি প্রশ্ন করেছিলুম, আমার মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিলে; কিন্তু তোমার কি মনে হয়েছিল—আমি ভয় পেয়েছি? মরতে?

জবা বলেছিল, এক কথা কতবার বলব, মেসোমশাই! সেই মুহূর্তটাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করুন না! কী দরকার সেটা মনে করার?

ও কী বুঝবে? ঐ 'যম-জাঙালের' নো-ম্যান্স-ল্যান্ডে—যার একদিকে জীবন রাজ্যের সীমান্ত, অপরদিকে সেই অজানা দেশটা—সেখানে দাঁড়িয়ে আমার কী অনুভূতি হয়েছিল তা আমাকে জানতে হবে না? জানাতে হবে না? ঐ সীমান্ত-রাজ্যে দাঁড়িয়েই তো গ্যোয়েটে বলেছিলেন, 'আলো! আরও আলো!' সক্রেটিস্-এর মনে পড়ে গেছিল কাকে যেন একটা মুরগীর দাম দেওয়া বাকি। আর সেদিন সেই যে মূর্তিটির সামনে পাঁচিলে ঠেশ দিয়ে নিশ্বাস নিয়েছিলুম, সেই মূর্তি মূর্তিমান অবস্থায় অন্তিম উক্তি হিসাবে বলতে প্রস্তুত ছিলেন, " 'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়' এই শেষ কথা বলে / যাব আমি চলে!"

'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি' বুঝতে পারার পর আমি কী ভেবেছিলাম তা বলবার অধিকারী না হলেও প্রত্যক্ষজ্ঞানে কী দেখেছি তা বলার অধিকার আমার আছে। সিস্টার জবা ডাক্তারের দিকে চোখ তুলে তাকালো। তিনি শুধু বললেন, ইয়েস!

আমার বাম বাহুমূলে জবা একটা ইন্‌জেকশান দিল। পর মুহূর্তেই ডাক্তারবাবু স্বয়ং আমার ডান-হাতে—হাত ও বাহুর সংযোগস্থলে, কনুইয়ের বিপরীতে, আর একটি ইনজেকশান দিলেন। যতই যন্ত্রণা হোক, আমার জ্ঞান ছিল টন্‌টনে। বিশ্বাস না হয় তদন্ত করে দেখবেন—আমি বলছি, জবার ইনজেকশানটা ছিল ইন্ট্রামাস্‌কুলার, ডাক্তারবাবুরটা ইন্ট্রাভেনাস!

ঠিক জানি না, আন্দাজে বলছি—পাঁচ-সাত সেকেন্ডের মধ্যেই আমি জ্ঞান হারাই। আমার অনুমান মৃত্যুযন্ত্রণায় নয়, ইন্‌জেকশনের প্রভাবে। সম্ভবত অত্যন্ত কড়া ঘুমের ঔষধ প্রয়োগ করা হয়েছিল আমাকে।

পাঁচ-সাত সেকেন্ড সময়টা বড় কম নয় হুজুর! গিরীন্দ্রশেখরের 'স্বপ্ন' বইটা পড়ে দেখবেন—আমরা যখন মনে করি 'কাল সারারাত ধরে কীসব আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখেছি', তখন বাস্তবে তা দেখেছি হয় তো ঐ পাঁচ-সাত সেকেন্ড। ফলে আমিও ঐ অতিদীর্ঘস্থায়ী খণ্ডমুহূর্তে অনেক-অনেকগুলি 'ভিশন' দেখলে কেউ সেটাকে অবৈজ্ঞানিক তথ্য বলতে পারেন না।

কিন্তু না, সে-সব কথা আমি এখন বল্‌ব না। আমার স্মরণে আছে, ধর্মাবতার; সাতই ফেব্রুয়ারি *আজকালে* প্রকাশিত সংবাদের যাথার্থ্য এই এনকোয়ারি কমিশনের মূল

উদ্দেশ্য—সাক্ষীটি কী-জাতের স্বপ্ন দেখেছিল—তা ইর্‌রেলিভেন্ট! ইম্মেটিরিয়াল! দো নট অ্যাবসার্ড!

স্বীকার্য, এরপর ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আমার যা অভিজ্ঞতা তা বাস্তব আর আমার কল্পনা মেশানো। দোষ আমার নয় ধর্মাবতার—'দোষ' ঐ ডাক্তারবাবুদের। ক্রমাগত আমাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আমার চৈতন্যকে ওঁরা আছন্ন করে রাখতেন। জাগ্রত অবস্থাতেও আমার বুদ্ধিবৃত্তি কিছুটা মোহগ্রস্ত হয়ে থাকত। কয়েকটি ঘটনার কথা—যা আমার মনে আছে—বলি; সত্য-মিথ্যা অন্যান্য সাক্ষীর এজাহারে প্রতিষ্ঠা পাবে।

এক নম্বর: চোখ মেলে দেখলুম, রানা এসেছে। আমার তখন মনে হয়েছিল রিপ ভ্যান উইঙ্কিলের মতো ঘুমের মধ্যে তিন চার দিন তাহলে কেটে গেছে। কারণ যে কোন ট্রেনেই আসুক, রানাকে দেড়-দুদিন ট্রেন জার্নি করতে হবে। আমি বুঝতে পারিনি যে, ট্রাঙ্ককল পেয়ে রানা বম্বে থেকে প্লেনে পৌঁছে গেছে পরদিনই।

দুই নম্বর: মৃত্যু যন্ত্রণাটা কী রকম হচ্ছিল এ কথা স্মরণ করতে গিয়ে প্রায় ষাট বছর আগেকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেছিল আমার। আমার বয়স তখন পাঁচ-ছয়। দলের সঙ্গে আমরা গেছি ঘূর্ণীর পাম্পিংঘাটে স্নান করতে—কৃষ্ণনগরে। আমি আর আ'ন্দ—আনন্দ আমার জাঠতুতো ছোট ভাই—বাজি ধরে দেখতে চেয়েছিলুম কতক্ষণ জলের নিচে থাকা যায়। আমরা দুজন কেউই তখন সাঁতার জানতুম না। সেই সময় এই রকম কষ্ট হয়েছিল। তথ্যটা যাচাই করা যাবে না। কারণ আ'ন্দ ঐ ঘটনার বছর-চারেক পরে মারা যায়। ঐ ঘাটেই, ঐভাবেই, জলে ডুবে।

তৃতীয়ত: মনে পড়ছে ছোট মেয়ে মৌকে বারণ করেছিলুম আমার সঙ্গে দেখা করতে

হৃদয় আমার হারালো!

যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা π তাহা চাই না।

না আসতে! পরে তদন্ত করে দেখেছি: বাস্তব। মৌ বুদ্ধিমতী। এমন মর্মান্তিক নির্দেশেও সে আমার উপর অভিমান করেনি। সে বুঝতে পেরেছিল, তাকে দেখলেই আমার ভীষণ কান্না পেত—ও সেটা লক্ষ্য করে দেখেছিল ঐ 'মনিটার' যন্ত্রের গ্রাফের হিজিবিজিতে। মৌ জানে, আমি অত্যন্ত ইমোশানাল! তাকে ভালবাসি বলেই বেঁচে ফিরে আসতে চেয়েছিলুম।

চার নম্বর: একটা ঘটনা পরিষ্কার মনে আছে। সেটা কোন্‌দিন তা বলতে পারব না। 'টাইম-ফ্যাকটার' বা সময়ের জ্ঞানটা গুলিয়ে গেছে। চোখ চাইতেই দেখি একজন অচেনা ডাক্তার আর একজন সিস্টার—জবা নয়—বিছানার দু-পাশে দাঁড়িয়ে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, শরীরে কোনও কষ্ট আছে?

বললুম, কষ্ট নয়, অস্বস্তি।

—কী অসুবিধা হচ্ছে, বলুন?

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলুম নাকের ফুটোয় একটা রবারের নল।

বললেন, আয়াম সরি! ওটা থাকবে। ওটা আপনাকে হেল্‌প করছে।

আমি জবাব দিলুম না দেখে পুনরায় বলেন, আপনি বুঝতে পারছেন আমার কথা?

আমার রাগ হয়ে গেল। কী এমন 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি' কপ্‌চাচ্ছেন যে, বুঝব না—অক্সিজেনটা আমার এখনো দরকার। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখলেন আমি নীরব, তখন আবার প্রশ্ন করেন, এরা এখন সলিড ফুড কিছু দিচ্ছে? না স্রেফ লিকুইড ডায়েট?

এতক্ষণে বুঝতে পারি, কেন এই খেজুরে আলাপ। বললুম, 1.41421 ...

ডাক্তারবাবু ঝুঁকে পড়ে বলেন, বেগ য়োর পার্ডন?

এবার বেশ স্পষ্ট উচ্চারণে থেমে-থেমে বললুম, 3.14159 ...

মনে হল ডাক্তারবাবু একটু থতমত খেয়ে গেলেন। অসহায় ভঙ্গিতে সিস্টারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সে মনে করল ডাক্তারবাবুকে মদৎ দেওয়া তার ডিউটি। তাই আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, আপনি ওঁর প্রশ্নটা বুঝতে পারেননি। ডক্টর জানতে চাইছেন, আপনি আজ কী খেয়েছেন?

আমার মেজাজ এতক্ষণে ক্ষেপচুরিয়াস! নাকের ফুটোয় সুড়সুড়ি-নল ঢুকিয়ে এসব খেজুরে আলাপের কোন মানে হয়? আমি সিস্টারকে উল্টে ধমক লাগাই, না! তুমিই ডক্টরের প্রশ্নটা বুঝতে পারনি। উনি জানতে চাইচেন, আমার ব্রেন-এ মেমারি-সেন্টারের গ্রে-সেলগুলো সজীব আছে কি না। সারাদিন কী কী খেয়েছি আমার কিস্‌সু মনে নেই, সে-কথা আমার অ্যাটেন্ডিং নার্স জানে। কিন্তু আমার কিস্‌সু মনে নেই এ-কথা বললেই ডাক্তারবাবু আমাকে ভুল ইনজেকশান দিতে থাকবেন। তাই ও কথা বলেছি। প্রথমটা 'রুট-টু'-র ভ্যালু, দ্বিতীয়টা 'পাই'-য়ের।

ডক্টর শশব্যস্তে বলেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে! আপনি ঘুমান।

আমি মুখে বললুম, থ্যাঙ্কু! আর মনে মনে, 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা π তাহা চাই না।'

[25.2.89]

প্রমোশন পেয়েছি। কেবিনে। দিন-তিনেক ইনটেনসিভ কেয়ার খাঁচায় আটক থেকে। আটই ফেব্রুয়ারি। এখন ভিজিটিং আওয়ার্সে কত কত লোক দেখা করতে আসছে। বারো ঘণ্টা বাদ-বাদ আমার অভিভাবিকা বদলায়। সম্পর্ক যদিও হওয়া উচিত সিস্টার-ব্রাদার, ওরা ডাকে 'মেসোমশাই'।

বাসের কন্ডাকটার থেকে বাজারের সব্‌জিওয়ালা আমাকে ডাকে 'দাদু'। ওরা তা ডাকে না। 'শ্যালিকাপুত্রী' বলে তো আর ডাকা যায় না, শুন্‌তেও খারাপ লাগে। তাই আমি ওদের নাম ধরেই ডাকি, অঞ্জলি, বাণী, আরতি, সেবা···

জবার সঙ্গে আর দেখা হয় না। তার এক্তিয়ার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে।

এখানে এরা ডিভিশন অব লেবারে বিশ্বাসী। কাজ সব ভাগ করা।

নার্সিংহোমটা যেন একটা 'ইউনিভার্সাল চেইন'-এর বিয়ে-বাড়ি। ক্রমাগত চক্রাবর্তন। একটা ফ্যাকটারি। একদিক দিয়ে ঢোকে কাঁচামাল। অন্যদিক থেকে বার হয়ে আসে ঝকঝকে কৌটায় ফিনিশড্ প্রডাক্ট। 'ওয়েস্ট' বা ভূষিমাল যেটুকু তা পাচার করার জন্য আসে হিন্দু সৎকার সমিতির ভ্যান। কাঁচামাল, অর্থাৎ এ বিয়ে-ফ্যাক্টারিতে বরের গাড়ি এলেই দোরগোড়ায় অপেক্ষারতা রিসেপ্‌শানিস্ট ইন্টারকম-শাঁখে চিক্কুড় পাড়ে: 'বর এসেছে! বর এসেছে!'

বরের গাড়ি—প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি, অ্যাম্বুলেন্স যাই হোক—এসে দাঁড়ায় দোরগোড়ায়। হিল্লি-দিল্লি চষে বেড়ানো ষণ্ডাটা সোলার টোপর পরে এখন এক্কেরে নির্জীব! নিজে-নিজে গাড়ি থেকে নামতে পর্যন্ত পারে না। পাকাচুলে-সিঁদুর-পরা মাসি-পিসি এসে হাত ধরে বর-বাবাজীকে নামিয়ে নিয়ে যান। এখানে মাসি-পিসির কাজটুকু সম্পন্ন করে স্ট্রেচারধারীরা। কিছু তফাৎ আছে। ন্যায্য বিয়েবাড়িতে মাসি-পিসি বরের হাত ধরেন, এখানে ওরা ধরে ঠ্যাঙ। আর

মাসি-পিসি পান-জর্দায় রাঙা জিবটুকু নেড়ে নেড়ে বরকে ঐ টোপর পরার ধাষ্টামোর জন্য প্রকাশ্যে গাল পাড়েন, ওরা পাড়ে মনে মনে: উল্লু-উল্লু—উল্লু-উল্লু।

জবা হচ্ছে স্ত্রী-আচার-ইন্-চার্জ। বরাসনে নবাগতকে পেড়ে ফেলা, তার পোশাক পালটানো, সুতো দিয়ে তার মাপজোপ নেওয়া ইত্যাদি, প্রভৃতি। কোন কোন কৌতূহলী বোকা-বর জানতে চায়, 'ব্লাড-প্রেসারটা কত?' তখন জবা তাকে টোপর পরায়, হাসি-হাসি মুখে বলে, "হাতে দিলাম মাকু ..."

'বি+পূর্বক বহ্ ধাতু'-র খড়্গখানা হাতে নিয়ে 'যা দেবী' খর্পরধারিণীরূপে স্বয়ং 'ঘঙ্' করাতে আসবেন তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে বলির পশুকে জীববিশেষের কণ্ঠস্বর অনুকরণ করাতে হয়। সেটাই প্রথা। সে-কাজটা জবার।

কেবিনে আসার পর খবরের কাগজ শোনার অনুমতি পেয়েছি। পড়া নয়, শোনা। এই সময়েই কে একজন সাত তারিখের '*আজকাল*' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরটা আমাকে দেখালেন। *যুগান্তর* পত্রিকায় গোপাল গডসের বই প্রকাশের সভায় আমার ফটোখানাও। দিন তিন-চার অনেকে অন্যান্য কাগজ আতি-পাতি খুঁজল—কিন্তু না, আর কোথাও কোনও খবর নেই। '*আজকাল*' কাগজ পর্শুর কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না। লোকটা বেগবাগান ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটে সেঁদিয়েছে, সৎকার সমিতির ভ্যানে বের হয়ে আসেনি। সোমবার তার অবস্থার উন্নতি হয়েছে—ব্যস্! আর কী জানতে চাও? 'মন্দ' খবর যখন ছাপিনি তখন ধরে নাও, সে ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠ্ছে। আর পাঁচটা খবরের কাগজ সংবাদটাকে পাত্তাই দেয়নি। আরে বাপু, 'অহন্যহনি' কত কত সাহিত্য-যশোপ্রার্থী ভেন্নরঙের পালকধারী আজীব চিড়িয়া হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নার্সিংহোমে 'গচ্ছন্তি', সেখান থেকে হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়িতে অন্যত্র 'পুনর্গচ্ছন্তি', সেসব খবর কি ছাপা সম্ভব? পার-কলম পার-সেন্টিমিটার স্পেস-এর দাম কত জান?

সেবা জানতে চায়, আপনি প্রতিবছর '*আজকাল*'-পূজাসংখ্যায় লেখা দেন, তাই নয়?

বলি, না তো! বছর-তিনেক আগে একবার লিখেছিলুম। সেই প্রথম, সেই শেষ। কেন?

—আর *আনন্দবাজার, দেশ, বর্তমান*-এর পূজা-সংখ্যায়?

—জীবনে কোনদিনই লিখিনি। কিন্তু এসব কথা কেন উঠ্ছে?

সেবা বললে, কিন্তু *দেশ* পত্রিকার 'ভ্রমণ-সংখ্যা', 'রম্য-রচনা সংখ্যায়' তো লিখেছেন?

—সো হোয়াট? তেমনি 'বিজ্ঞান-সাহিত্য' সংখ্যায় লিখিনি। আমন্ত্রিত হলে লেখা পাঠাই। মোদ্দা কথাটা কী জানতে চাইছ বল তো?

সেবা কথাটা ঘুরিয়ে নিল। বলল, সোমবারের *আনন্দবাজারে* দীপঙ্কর চক্রবর্তীর একটা লেখা বেরিয়েছে—"বইমেলার বিজায়া"। শুনবেন?

—শোনাও!

দীপঙ্করবাবু বর্ণনা দিয়েছেন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর কথাসাহিত্যিকদের কার বই কী রকম কেটেছে, "রমরমিয়ে বিকিয়েছে রমাপদ চৌধুরীর ... আর সুনীল গাঙ্গুলীর ... সেই সুনীল, অগুন্তি সুন্দরী মহিলা যাঁকে এই শেষ দিনটাতেও ঘিরেছিলেন 'আনন্দ'র স্টলের সামনে।"

জোড়াসাঁকোর সেই কী-যেন-নাম জমিদারবাবু শুধু চতুরিকা-নিপুণিকাদেরই দেখে গেছেন; 'স্লীভলেস' বা 'বয়েজকাট'দের না দেখেছেন চেখে, না দেখেছেন চোখে! তাই প্রবন্ধ-লেখকের বর্ণনায় সুন্দরীবেষ্টিতা *দেশ*-গৌরব কবিকুলতিলকের ঐ ভাঙাহাটের গাজন-নাচন: কালিদাসোত্তরকে হারিয়ে দিয়ে গর্বে বেড়াই নেচে।

জনপ্রিয়তার দিক থেকে যাঁরা 'দ্বিতীয়' শ্রেণীর, খানদানি পত্রিকা বা সাপ্তাহিকে যাঁদের লেখা হামে-হাল নজরে পড়ে না, অথবা যাঁদের লেখা বইয়ের সমালোচনা, তাঁদের কার বই কেমন কাটল সে-কথা প্রবন্ধলেখক জানাননি। তাই ঠিক মালুম হল না, বর্তমানকালের জীবিত লেখক-লেখিকাদের মধ্যে আশাদি, লীলাদি, অন্নদাশঙ্কর, গজেনদা, উমাপ্রসাদদা, আশুদা, প্রফুল্ল রায়, মহাশ্বেতা, অতীন, পূর্ণেন্দু, শক্তিপদ, শঙ্কুমহারাজ, নবনীতা, বরেন, নিমাই ভট্টাচার্য ইত্যাদি প্রভৃতির বই মেলায় কি কিছু কাটল? নাকি শুধু গুদামেই কাটল পোকায়? আনন্দ পাব্‌লিশার্স ছাড়া মিত্র-ঘোষ, এ· মুখার্জী, দে-বুক স্টোর ইত্যাদির উল্লেখও আছে প্রবন্ধে। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানটি ব্যতিরেকে আর সবাই তো জানতো—একটি অন্তেবাসী অভাগা অনুপস্থিত। শেষ তিনদিনই। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী! একই সঙ্গে তার 'বিজয়ার' আয়োজন হচ্ছে বেগবাগানে। একটু অভিমান হল শুনে: কেউ আমার নামটা পর্যন্ত করেনি গা? ভানুবাবু, মনীশ, সুধাংশু, বামাচরণ, প্রসূন, অশোক বারিক বা সমীর নাথ!

না করেছে। লেখক শেষ দিকে বর্ণনা দিচ্ছেন, "মেলা শেষের পাঁচ মিনিট আগে মাইক্রোফোনে বেজে ওঠে শেষ গান: 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।'"

কী কাকতালীয় ঘটনা! ঠিক ঐ সময়ে 'ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে' যাবতীয় যন্ত্রপাতি সাজিয়ে ওঁরা দুজন বসে আছেন ঐ 'মনিটার' যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে। ডাক্তারবাবু আর জবা। তবে 'আশায়' নয়, ওটা বোধহয় ছাপার ভুল: 'আশঙ্কায়'! সর্বনাশের।

অন্তত মাইক্রোফোনটা আমাকে ভোলেনি!

আমাকে ভুল বুঝবেন না, য়োর অনার্স। আমি কাউকে দোষারোপ করছি না, কারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। না ইনসান হিসাবে, না ইনসানিয়তের তরফে। এটা নিত্যসত্য! রাজনীতির মতোই, সাহিত্যবাজারেও এসেছে 'পোলারাইজেশান'। অন্তত এই আ-মরি বাংলা ভাষায়। দলছুটকে মরতে হবেই। এখন এটা বাংলাসাহিত্যে তীব্র হয়েছে বলে নজরে পড়ছে। কিন্তু 'একান্তচারীর অনিবার্য অবলুপ্তি' একটা শাশ্বত সত্য। সর্ব কালে, সর্ব দেশে। রামায়ণে শম্বুককে নামিয়ে দিতে হয়েছিল ঘাড় থেকে মাথা, মহাভারতে একলব্যকে দক্ষিণহস্ত থেকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। যূথবদ্ধ সমালোচকের আক্রমণে চ্যাটার্টন বিসর্জন দিয়েছে তার আঠারো বছরের তরতাজা জীবন, ভ্যাঁ স ভ্যান গখ্ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে কেটে ফেলেছে নিজের কান। *ব্ল্যাকউড* ম্যাগাজিনে উদীয়মান কবি 'কীটস্'-এর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ *এণ্ডিমিয়ান*কে এমন বর্বর ভাষায় সমালোচনা করা হল যে, সে আঘাত থেকে কবি আর সামলে উঠ্‌তে পারলেন না—মাত্র ছাব্বিশ বছরেই শেষ হয়ে গেল অনাদৃত কবির কল্পনাবিলাস!

সজনীকান্ত দাস, দেবজ্যোতি বর্মন বা দীপ্তেন সান্যাল আজ প্রয়াত—তাঁদের শূন্য আসন পূর্ণ করতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছিল যেকটি শিশু নটে গাছ তা মুড়িয়ে দেওয়া গেছে। তাই পূজাপ্যান্ডেলে কেটে যাওয়া রেকর্ডে ঐ একটি কানে-তালা-লাগানো কলিই সারা রাত বেজে চলবে পাড়া গমগমিয়ে: 'আনন্দ' ধারা বহিছে ভুবনে!

কারও হিম্মৎ হবে না কেটে-যাওয়া রেকর্ডটা পালটিয়ে আর একখানা গান বাজানো!

মতে না মিললে আ-সজনীকান্ত-দীপ্তেন সমালোচনা বিভাগে লেখককে ঝেড়ে কাপড় পরাতেন। এখন পদ্ধতির বদল হয়েছে। প্রতিবাদের পরিবর্তে উপেক্ষা। গোষ্ঠীবহির্ভূত-সাহিত্যিকের গ্রন্থ সমালোচনা না করলেই হল। এক-ডালে-বসা এক-পালকী

বিষয়: পরস্পর পৃষ্ঠকণ্ডূয়ন সমিতির কৃতিত্ব

বিদেশ-এ উনবিংশ শতাব্দী

"Passez-moi la rhubarbe
et je vous passerai
le sene"
[You scratch my back
and I'll scratch yours]

দোমিয়ের আঁকা ব্যঙ্গচিত্র—
Academic des Beaux-Arts
—এর দুই শিল্পী পরস্পরের
শিল্প-প্রশংসা করে পুষ্পবৃষ্টি করছেন।

দেশ-এ বিংশ শতাব্দী

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি খাসা তোর চ্যাঁচানি।
শুনে শুনে আনমন নাচে মোর প্রাণমন।
... ...
তোর গানে পেঁচি রে সব ভুলে গেছিরে
চাঁদ মুখে মিঠে গান শুনে ঝরে দু'নয়ান।

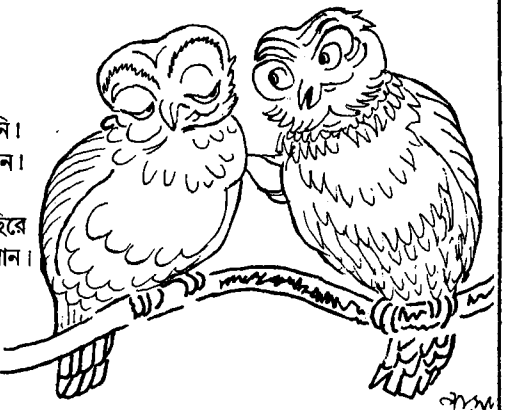

পাখিরা ক্রমাগত কোরাস গেয়ে চলুক না: 'তোর গানে পেঁচি রে, সব ভুলে গেছি রে'!

প্রতিবাদে কাজ হয় না। উল্টে প্রতিবাদের প্রতিবাদ হয়। এটা প্রতিষ্ঠিত। সালোঁ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে ইম্প্রেশানিস্টরা সাজিয়েছিল 'প্রত্যাখ্যাতদের সালোঁ'। বোঝ বখেড়া! লোকজন তাই দেখতেই ছুটছে। তাই ফরাসী সংস্কৃতির ক্যাপিটালিস্টরা পরের জমানায় আর ঐ ভুলটা করেননি। পোস্ট-ইম্প্রেশানিস্টদের ক্ষেত্রে।

গঁগ্যাঁ দেশত্যাগী হয় হোক, সেটা কাগজে ছেপ না! ভ্যান গখ্ বিকর্ণ হয়ে হাসপাতালে অথবা সেখান থেকে পাগল হয়ে উন্মাদাশ্রমে ভর্তি হয় হোক—সেসব খবর দৈনিক-সাপ্তাহিকে না ছাপলেই হয়। ক্রমশ পাঠক-পাঠিকা ভুলে যাবে ঐ সব 'দ্বিতীয়-তৃতীয়' শ্রেণীর শিল্পীদের কথা। 'গোয়েবল্স্-সূত্র' অনুসারে ক্রমাগত শুন্‌তে শুন্‌তে তারা অভ্যস্ত হয়ে যাবে নানান সুরে গাওয়া মন-মাতানো ঐ একটি পংক্তির গানে: নীল গানে লাল সুর হাসি-হাসি গন্ধ!

[26.2.89]

আবার প্রমোশন। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে। কেবিন থেকে বাড়ি। এবার তিনতলায় ওঠা গেল ডুলি চেপে। এবারও শবরমতী আশ্রম আর আলমোড়ায় বিশ্রাম নিতে হল। আমার নয়, ডুলিবাহকদের: অজয়, দীপ্তেন, সুবাস, রানা।

কেবিনে থাকতেই ডক্টর সুহৃদ বোস অনুমতি দিয়ে রেখেছেন—এখন দৈনিক আধঘণ্টা লিখতে এবং দুই ঘণ্টা পড়তে পারি। লেখা বলতে দিনপঞ্জী, অথবা দু-একটা পোস্টকার্ড। বই পছন্দমত পড়ছি দিনে দুই ঘণ্টা। কিন্তু বাড়িতে দেখতে এসেই ডাক্তারবাবু খামোকা আমাকে বকাঝকা করলেন: একী! বই পড়তে বলেছি বলে এই সব বই?

ধর্মাবতার! আমি কোনও নিষিদ্ধ পুস্তক তখন পড়ছিলুম না। কোনও অশ্লীল বইও নয়। বেড-সাইড টেবিলে ছিল—জর্জ গ্যামোর *'থার্টি ইয়ার্স দ্যাট শুক্ ফিজিক্স'*; হিরণ্ময় বাঁড়ুজ্জে মশায়ের *'উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ'*; আর পল মূডীর *'ইনট্রোডাকশন টু এভল্যুশান'*। আমার অবাকদৃষ্টির জবাবে বললেন, হাল্‌কা ধরনের বই পড়বেন। যা ভাবায় না, উত্তেজিত করে না··· অর্থাৎ ইয়ে, 'লাইট লিটেরেচার'।

ভয়ে ভয়ে বলি, দু-একটা নাম যদি সাজেস্ট করতেন···

ডাক্তারবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন, মায়ের কাছে মাসির গপ্পো আমি কী শোনাব মশাই? আপনি নিজেই তো লিটেরেচার নিয়ে পড়ে আছেন··· দেখি, জিবটা দেখি।'

জিব বার করলে আর তর্ক করা যায় না। ঐ সুযোগে ডাক্তারবাবু চট করে কেটে পড়লেন। উনি চলে যাবার পর মৌকে বলি আমার নিজের লেখা কয়েকটা বাছা বাছা বই নিয়ে আসতে। সেগুলির বর্তমান সংস্করণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এক কপি করে প্রুফ-রীডিং করে রেখে দিলে সময়টা কাজে লাগানো যাবে। ভুল-ভাল কিছু থাকেই। পাঠক-পাঠিকার চিঠিও পাই। তাই দেখে সংশোধন করি।

বিকালে দেখা করতে এল সত্যানন্দ। মৌকে ধমক দিল, এ কী করেছ? ডাক্তারবাবু পড়তে আর লিখতে অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু প্রুফ-রীডিং তো অন্য জাতের মস্তিষ্ক পরিচালনা!

গিন্নি শাড়িটা গাছকোমর করে এগিয়ে আসেন। বলেন, তাহলে কলমটা কেড়ে নিই শুধু? কলম কেড়ে নিলে প্রুফ-রীডিং করতে পারবে না। আর নিজের লেখা গল্প তো ও জানেই। ভাবনার বা উত্তেজনার কোন অবকাশ নেই!

সত্যানন্দ মাথা নাড়ে। না, তাতে ও রাজী নয়। বললে, তাহলে একটা গল্প বলি। গল্প নয়, সত্য ঘটনা। পারীর ঘটনা, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। সী'ন নদীর ধার দিয়ে পদচারণা করছিলেন ভিক্টর হুগো তাঁর প্রিয় সঙ্গিনীর সাথে—মাদমোয়াজেল দ্রোলে। হঠাৎ নজর হল একটা উইলো গাছের তলায় বসে একটা বুড়ো রুমালে চোখের জল মুছছে। ভিখারী নয়, ভদ্রলোক। হুগো ভাল করে তাকিয়ে দেখেন—কী আশ্চর্য! স্বয়ং ব্যালজ্যাক! ফরাসী সাহিত্যের সেই দীপ্তসূর্য! ভিক্টর হুগোর চেয়ে বয়সে তিনি মাত্র তিন বছরের বড়। হুগো এগিয়ে এসে বললেন, একী! মসুয়ে ব্যালজ্যাক! কাঁদছেন কেন? কী হয়েছে?

ব্যালজ্যাক উঠে দাঁড়ালেন। বন্ধুর হাতটি টেনে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, লীজা আমাকে ছেড়ে চলে গেল! আমি···আমি কেমন করে বাঁচব?

হুগো স্তম্ভিত! লীজা কে, তা উনি জানেন না। ব্যালজ্যাকের প্রেমিকা, আত্মীয়া,নাকি পোষা কুত্তি! কিন্তু এমন আবেগঘন উচ্ছ্বাসের জবাবে তো প্রশ্ন করা চলে না—'লীজা কে?' ভাবলেন, দু'চার কথা চালাচালির পরেই রহস্যটা প্রকাশ পাবে। হুগো তাই সমবেদনা জানিয়ে বলেন, সে কী! কবে? কখন? কোথায়?

—আজই দুপুরে! আমার বৈঠকখানায়!

—বলেন কী! তা বাড়িতে এখন আর কে আছে?

ব্যালজ্যাক পকেট থেকে একটি 'ল্যাচ-কী' বার করে দেখান: কেউ নেই! সদর-দরজা বন্ধ করে আমি এখানে চলে এসেছি! কী করে বাড়িতে ফিরব?

দুজনেই দুর্ধর্ষ সাহিত্যিক। খ্যাতির তুঙ্গশীর্ষে তখন। কিন্তু হুগো পাগল নন। বাড়িতে একটি মৃতদেহকে অরক্ষিত তালাবন্ধ করে ফেলে রেখে ব্যালজ্যাক গাছতলায় হাপুস-নয়নে কাঁদছেন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। কী বলবেন, ভেবে পেলেন না। মাদাম দ্রোলের আর সহ্য হল না। বলে ওঠেন, পাঁদ মসুয়ে। আমি···মানে ঠিক মাদমোয়াজেল লীজাকে চিনতে পারছি না···

রুমালে চোখে মুছে ব্যালজ্যাক বলেন, কেমন করে চিনবেন? আপনার সঙ্গে তার পরিচয়ই তো হয়নি এখনো। সে হতভাগিনী এখনো আমার পাণ্ডুলিপিতে বন্দিনী। আমার উপন্যাসের নায়িকা।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল হুগোর। কল্পনায় পোষা কুত্তি পর্যন্ত নেমেছিলেন। তার নিচে নয়।

মাদাম দ্রোলে ব্যালজ্যাকের দুটি হাত টেনে নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে বললেন, মসুয়ে ব্যালজ্যাক! কাহিনীটা একটু অদল-বদল করে লীজাকে কি কিছুতেই বাঁচানো যায় না? একটা অসহায়া মেয়েকে এই পরিণত বয়সে নাই বা খুন করলেন!

ওভারকোটের দুই পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে ব্যালজ্যাক উঠে দাঁড়ালেন। সীলমাছের মতো। অথবা রোদ্যাঁর গড়া মূর্তিটার মতো! এখন আর তাঁর চোখে জল নেই। আগুন! বললেন, লীজাকে বাঁচানো যায়! কিন্তু তাহলে আমাকে জোড়া-খুন করতে হবে। তখন আবার আপনি আপত্তি করবেন না তো?

—জোড়া খুন! উপন্যাসের আর দুটি চরিত্রকে?

—না। প্রথমে উপন্যাসটাকে। তারপরে—লেখককে!

কাহিনীর উপসংহারে সত্যানন্দ মৌকে বলল, তোমার বাবার লেখা এইসব 'ছেলেখেলা'গুলো সরিয়ে রাখ। কোন্ কল্পিত নায়ক-নায়িকার দুঃখে···

কী আপদ! আমি বলি, সতু! দু-চারখানা ট্র্যাশ্ বইয়ের নাম দয়া করে বলবি? যা ভাবায় না, উত্তেজিত করে না? কী পড়ব তবে? পুরানো পাঁজি?

ডক্টর সত্যানন্দ প্রামাণিক থাইসানুরা বর্গের পতঙ্গের মতো। বইয়ের পোকা। হরেক কেতাব তার লাইব্রেরী-ঘরে, থরে-থরে। বাংলা, ইংরেজী। অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে ভেবে নিয়ে বললে, ইয়ে আর কি···লাইট লিটেরেচার!···এখন ঠিক মনে আসছে না। পরে টেলিফোনে জানাব।

আচ্ছা, এই যে একটা সামাজিক সমস্যা দিনকে-দিন জটিলতর হয়ে উঠ্ছে এ নিয়ে বুদ্ধিজীবী পণ্ডিতেরা কেন চিন্তা করছেন না? হার্টের রুগী এখন ঘরে ঘরে। আমাদের বাপ-পিতেমোর আমলে ষাট-সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধদের দেখেছি ট্যাঁকে হরীতকীর টুকরো নিয়ে ঘুরতে। মাঝে মাঝে টুক্‌টাক্ নিদন্ত-মুখগহ্বরে নিক্ষেপ করছেন। আর এখন চল্লিশ ছুঁই-ছুঁইরা 'সর্বিট্রেট'-এর কৌটো পকেটে নিয়ে ঘোরে। টপাটপ খেয়েই চলেছে। কার্ডিওলজিস্টরা হামে-হাল তাদের পরামর্শ দিয়ে চলেছেন, 'টেনশান' এড়িয়ে চলুন, 'লাইট লিটেরেচার' পড়ুন—যা ভাবায় না, হাই তোলায়। কিন্তু হাই-তোলানো কেতাবের লেখক/লেখিকা কোন্ হিজ্-হাইনেস/হার-হাইনেস্? ডাক্তারবাবুরা ভাসা-ভাসা ভাষায় বলছেন, এমন বই পড়ুন যাতে 'কাম্পোজ'-এর মতো কাম পোষ মানে, ঘুম পাড়ায়! কিন্তু মুখের উপর জিজ্ঞাসা করে দেখবেন, 'অমন দু-চারখানা 'কাম্পোষী' বইয়ের নাম বলুন না স্যার?' অমনি দেখবেন, ডাক্তারবাবু চুপ্‌সে-যাওয়া বেলুনটি। হয় আপনাকে জিব বার করতে বলবেন, না হলে 'ইয়ে··· পরে টেলিফোনে জানাব।'

আমার উর্বর মস্তিষ্কে একটা জবর ফন্দি এসেছে, ধর্মাবতার। আমার ধাই-মা বলত, আম্মো নাকি ছেলেবেলায় 'গুংগা' বল্‌তুম। শুনুন বুঝিয়ে বলি—

একটি সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা তো হর-হপ্তা বাঙলা-সাহিত্যে 'বেস্ট-সেলার লিস্ট'-এ দশ-দুকুনে-বিশ (প্রেস! ভূতদের সামলান! মানহানির মকদ্দমায় ফেঁসে যাব—আমি তালব্য-'শ' লিখেছি কিন্তু!) ছড়াচ্ছেন! আর পাঁচটা দৈনিকের কোন সাহসী সম্পাদক এগিয়ে আসুন। দায়িত্বটা নিন: হর-হপ্তা একটা করে 'ওয়ার্স্ট'-সেলার লিস্ট' ছাপুন! অর্থাৎ বিগত সপ্তাহে কলেজস্ট্রীট পাড়ায় কোন অভাগার বই সবচেয়ে কম কেটেছে কাউন্টারে··· ইয়ে, অর্থাৎ গুদামে বেশি কেটেছে, পোকায়!

ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কোন হাঙ্গামা নেই। সম্পাদক-মশাইকে কেউ বিরক্ত করবে না। একডালে বসা পাখিরা এসে কিচির-মিচির করবে না—'স্যার,পরের হপ্তায় আমার নামটা আর একটু উপরে তুলতে হবে।' যাঁরা অ্যানুয়াল কন্ট্রাক্টে 'হাফপেজ' বা 'ত্রিপ্‌ল কলাম' বিজ্ঞাপন দেন তেমন প্রকাশক অভিমান প্রকাশ করবেন না, 'আমাদের কোন বইয়ের নাম পর-পর তিন হপ্তায় যায়নি কিন্তু।'

অথচ দেখুন, হার্ট-পেশেন্টরা কত সুবিধা পাবেন। ঐ লিস্ট দেখে নিশ্চিন্তে বই কিনতে পারবেন। সে বই উত্তেজক নয়, ঘুম-পাড়ানিয়া! 'কাম-পোষ'-এর মতো! কার্ডিওলজিস্টরা ঐ পেপার-কাটিং ই·সি·জি-যন্তরের খাঁজে গুঁজে রুগী দেখতে বেরুবেন!

নিরুত্তেজক, নির্ভাবনার, নিদ্রাকর্ষক, 'ওয়ার্স্ট-সেলার' বই জোগাড় হয়নি। ছাদটাও কড়ি-বরগার নয় যে গুণে সময় কাটবে। নিশ্চুপ পড়েছিলুম বিছানায়। সংবাদ পাওয়া গেছে,

'না-মানুষী বিশ্বকোষে'র দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য যে-সব সাপ-ব্যাঙ, মাছ, পাখিদের রেখার খাঁচায় ধরেছি, সেগুলি বাণ্ডিল বেঁধে আলমারিতে তুলে রাখা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্যানভাসে যে পেল্লায়মাপের ঐতিহাসিক উপন্যাসখানি লিখছিলাম তার পাণ্ডুলিপিও আলমারিতে বন্দিনী। আশ্বাস পাওয়া গেছে ন্যাপথলিন সুরভিত '*রূপমঞ্জরী*'-র ক্ষতি হবার কোন আশঙ্কা নেই। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরে সে পাণ্ডুলিপির দিকে আর দেখি নাই ফিরে। রানার ছুটিও ফুরিয়ে এসেছে। কাল সে বোম্বাই ফিরে যাবে। বলল, এত মনমরা লাগছে কেন তোমাকে? লেখাপড়া বন্ধ বলে, নাকি হঠাৎ এতদিনে উপলব্ধি করলে—এভাবে একা-একা কলম নিয়ে লড়াই করা চলে না?

বলি, আমি কারখানার মজদুর নই রানা যে, হয় 'সিটু', নয় 'আয়েনটিউসি'-তে নাম লেখাতে হবেই।

বাপ-বেটায় আমাদের মন-খুলে তর্কাতর্কি চলে। ও বলে, কলম একটা হাতিয়ার, এ-কথা নিশ্চয় অস্বীকার করবে না। এ-যুগে একা-একা লড়াই করা চলে না।

—স্বীকার করি, কলম একটা হাতিয়ার। কিন্তু তলোয়ারের মতো সেটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়।লড়াই করেননি বলে বেদব্যাস থেকে কালিদাস, জীবনানন্দ থেকে জসিমউদ্দীনের কলম ব্যর্থ নয়। 'আমাকে যোগভ্রষ্ট করে কার কী লাভ? কতটুকু লাভ? আমি যদি আমার সাধনায় নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অতন্দ্র থাকি তবে কার ক্ষতি? কতটুকু ক্ষতি? আমিও তো একটা দিক সামলাচ্ছি। সংস্কৃতির দিক···'

রানা বাধা দিয়ে বলে, কিছু মনে কর না, বাবা, ওটা তোমার ধার-করা কথা। নিজের নয়। উদ্ধৃতি। অন্নদাশঙ্করের 'যোগভ্রষ্ট' থেকে। বেদব্যাস থেকে জসীমউদ্দীন মূলত কবি। তুমি কথা-সাহিত্যিক। মূলত। তাছাড়া অন্নদাশঙ্কর ঐ 'যোগভ্রষ্ট' লিখেছিলেন এক যুগ আগে। এখন বাঙলা-সাহিত্যে 'পোলারাইজেশন' আরও তীব্র। হয় ইষ্টবেঙ্গল নয় মোহনবাগান, বেছে নাও। দুটোর একটা দলকেও যদি সাপোর্ট না কর তাহলে সাহিত্যের এই খেলার-মাঠে বেহুদ্দো আসা কেন? ফাইনাল খেলাটা তো ঐ দুই দলের মধ্যেই। স্টেডিয়ামের ঐ হাজার হাজার দর্শক উন্নত মানের ফুটবল খেলা দেখতে মাঠে আসেনি। এসেছে নিজের দলকে জয়ী দেখতে।

এবারেও আপত্তি জানাই। বলি, না, রানা। আমি একমত নই। মাঠে তবু একজন উপস্থিত যে নিরপেক্ষ। এগারো-দুকুনে বাইশজন খেলোয়ারের মতোই সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারা মাঠ দাবড়ে বেড়ায়। কিন্তু গোল দিতে নয়। গোল ঠেকাতেও নয়। সে সর্বক্ষণ দলাদলির ঊর্ধ্বে। কোন্ পক্ষের সাপোর্টার তাকে কখন ধরে ঠেঙাবে তা সে জানে না, তবু সে মাঠ-কামড়ে পড়ে থাকে। মাঠের 'সুপার-হিরো' ফাউল করলে নির্ভয়ে তার নাকের ডগায় মেলে ধরে লাল-হলুদ কার্ড! ঐ খানকয় লাল-হলুদ কার্ড আর বিবেকটুকু সম্বল করে সে মাঠে এসেছে। আমি যদি সেই ভূমিকাটুকুই পালন করি তাহলে কার কিসের আপত্তি?

—আপত্তি আর কিসের? কিন্তু 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' বলে কোনদিনই কেউ রেফারী বা আম্পায়ারকে কাঁধে তুলে নাচে বলে তো শুনিনি!

—নাই নাচল! তাই বলে আমাকে হয় শাক্ত, নয় বৈষ্ণব দলে নাম লেখাতে হবে? কবীরপন্থী হতে পারব না? কিংবা অদ্বৈতবাদী? হয় এ-দলের শ্মশানকালীর মণ্ডপে কারণবারি পান, না হলে ও-দলের অকারণ মাথা-মুড়িয়ে অষ্টপ্রহর কীর্তন! আর 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' পুরস্কার? শোন্ বলি, কিছুদিন আগে এক সাহিত্যিক আড্ডায় রবীন্দ্র-পুরস্কার পাওয়া একটা বইয়ের কথা উঠ্‌ল। লেখকের নামটা সকলের মনে আছে, লেখক হিসাবে নয়, একটি অত্যন্ত নামকরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা-হিসাবে। তাছাড়া একটা দীর্ঘস্থায়ী হত্যা মামলায় তাঁর নামটা বারে বারে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল বলে। সে-বছর রবীন্দ্র-পুরস্কার-এর বিচারক হিসাবে কে কে ছিলেন সেই নেপথ্যবার্তাও সবার মনে আছে, কিন্তু পাঁচ সাতজন সাহিত্যিক—তার ভিতর একজন আবার বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক—বইটার নাম মনে করতে পারলেন না।

রানা বলে, বুঝেছি, তুমি সেই বইটার কথা বলছ, ঐ যে, ইয়ে···

—তবেই দ্যাখ! তোরও মনে নেই সে-বছরের সেই কাঁধে-তুলে-নাচা বইটার নাম!

রানা বলে, তাহলে তোমার মেজাজ খারাপ হচ্ছে কেন? নিজেকে অভিমানিত মনে করছ কেন?

আমি দৃঢ় প্রতিবাদ করি, মোটেই না! আমি নিজেকে অপমানিত মনে করতে যাব কেন? এসব অনাদর-উপেক্ষায় আমি অভ্যস্ত। বছর বিশেক আগে কী একটা পুরস্কার পেয়েছিলুম বলে শিক্ষামন্ত্রক প্রথামাফিক আমাকে প্রতি বছর চিঠি পাঠান—রবীন্দ্র-পুরস্কারের জন্য নাম সুপারিশ করতে। অথচ পুরস্কার-বিতরণী সভায় বিশ বছরে কোনদিন আমার নিমন্ত্রণ হয়নি। এতে অপমানিত বোধ করার কী আছে? এই শহরে তার চেয়েও সাড়ম্বরে একটি পত্রিকাগোষ্ঠী কোনও 'ব্যাঙ্কোয়ে হল'-এ কিছু পুরস্কার বিতরণ করেন। দ্বিতীয় ছেড়ে তৃতীয় শ্রেণীর জনপ্রিয়তা যাঁদের আছে, সে জাতের কথাসাহিত্যিকও নিমন্ত্রিত হন। এককালে আমারও হত।

তারপর 'যাযাবর'-এর *অমনিবাস* প্রথম প্রকাশের দিন বইমেলায় একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল। 'আনন্দ'-অনুষ্ঠানে অতর্কিত যবনিকাপাত ঘটিয়ে প্রয়াত হলেন একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যরসিক। তার পরের বছর থেকে কী-জানি-কেন এই অন্তেবাসী বামুনের নামটা নিমন্তন্নের লিস্টি থেকে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাতে আমি অপমানিত হব কেন? নামটা যাঁর নির্দেশে ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়েছে—এটুকু বোঝা যায়—তাঁর মূল্যায়নে কথাসাহিত্যিক হিসাবে আমার জনপ্রিয়তা তৃতীয় থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে নেমে গেছে। কিন্তু তিনিই যে অভ্রান্ত তা মেনে নেব কেন?

রানা বলে, তুমি আমার কথাটা মন দিয়ে শোননি। 'অপমানিত' হবার কথা বলিনি। আমি বলেছি 'অভিমানিত' হবার কথা।

দীর্ঘদিন বোম্বাই প্রবাসের ফল! বোম্বাই-মার্কা বাংলা! আমি ওর ভুলটা শুধরে দিতে গেলুম—'অভিমানিত' শব্দটা অশুদ্ধ প্রয়োগ। এমন ব্যবহার ভাষায় নেই। রানা বললে, জানি! তবে, তোমার heart-attack ঘটিত ব্যাপারটা 'The most unkindest cut of all' তো, তাই ভেবেছিলাম অশুদ্ধ হলেও··· কিন্তু থাক! মা আসছে!

গত দু-বছর আমরা রানার মায়ের সামনে সামলে-সুমলে বাৎচিৎ করে থাকি। রানার মা ওর শেষ কথাটা শুনতে পেয়েছেন। রানাকে বলেন, এখন চাকা ঘুরে গেছে। তোমার বাবাকে এই ব্যাগটা দাও। সব অভিমান দ্রব হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু অবশ্য বলেছিলেন পরের সপ্তাহে; কিন্তু নাঃ···

একটা পেট-মোটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। কী আছে ওতে?

রানা উবুড় করে সেটার গর্ভ থেকে ঢেলে দিল—

এবার আমি নিজেই একটা অশুদ্ধ বৈয়াকরণিক প্রয়োগ মনে মনে করে ফেললুম: 'কিউরিঅসার! অ্যান্ড কিউরিঅসার!!'

প্রণিধান করা গেল: বইমেলায় মাইক্রোফোনের শেষ-গানটায় ভুল ছিল না কিছুই। 'আশঙ্কায়' নয়, কথাটা 'আশায়'—'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়।'

দুঃখের বেশে তিনি না এলে তো এ সত্যের উপলব্ধি হত না। আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে! যথার্থ 'আনন্দ' ছড়িয়ে আছে মধুময় ধরণীর ধুলিতে! তা অমূল্য!

ব্যাগ ভর্তি শুধু—চিঠি, চিঠি আর চিঠি!

তিন সপ্তাহ ধরে জমেছে। অসুস্থ মানুষটার চোখের আড়ালে। খামগুলো কেউ খোলেনি। লেটার-বক্স থেকে সরাসরি আশ্রয় পেয়েছে সেই ব্যাগে। স্তম্ভিত হতে হল। এত লোক '*আজকাল*' পত্রিকা পড়ে? আর কোন খবরের কাগজে এ সংবাদ ছাপা হয়েছে বলে তো শুনিনি! আর এত লোক এই অন্তেবাসীর নাম ঠিকানা জানে? কিছু কিছু চিঠি অবশ্য প্রকাশকের ঘর ঘুরেও এসেছে। কিন্তু অধিকাংশই সরাসরি। রিপ্লাই-কার্ডগুলোয় শুধু সই দিলুম 'ভালো আছি'-র তলায়। মৌ দায়িত্ব নিল ঐ '*আজকাল*' সংবাদপত্রেই ব্যক্তিগত কলামে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানাবে যে, আমি ক্রমশ ভাল হয়ে উঠ্ছি। একটি মেয়ে, রিন্টির অনুকরণে আমাকে 'গ্র্যান্ড-পা' সম্বোধন করেছে। সে বোধহয় আমার লেখা *পয়োমুখম্* পড়েনি। বন্ধখামে ঁমা মঙ্গলচণ্ডীর নির্মাল্য পাঠিয়েছে। গড়-ঠিকানার এক 'আনন্দ' লিখেছে, "জবাব আপনাকে দিতে হবে না দাদা, তাই ঠিকানা দিচ্ছি না। নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখলেই বুঝব চাঙ্গা হয়ে

কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে
মন মোর নহে রাজী!

উঠেছেন। খবরের কাগজে সংবাদটা দেখে এ চিঠি লিখছি আপনার আশু রোগমুক্তি-কামনায়।"

তাহলে কি খবরটা ভুল শুনেছিলুম? পঞ্চাশ বছর আগে? আমার সেই ছোট ভাই 'আনন্দ' জলে ডুবে মারা যায়নি? সেও মিশে আছে এই মধুময় ধূলিধূসরিত ধরণীর আনন্দ-বাজারে? সেই ছেলেবেলার মতো লুকোচুরি খেলছে: টু—কি।

ঠিকই বলেছে সবিতা—সব অভিমান দ্রব হয়ে গেল।

বুঝতে পারি—আমার পরিবর্তে ঐসব 'তথাকথিত দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর' উপেক্ষিত কথাসাহিত্যিকের মধ্যে কোন একজন—ঐ যাঁদের বই 'বইমেলায়' কাটল কি-না তা বোঝা গেল না—যদি এমনভাবে অসুস্থ হতেন, তাহলে তিনিও এমন বাণ্ডিল-বাণ্ডিল চিঠি পেতেন। 'ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনে' যাঁরা কবিকে গালমন্দ করেছিলেন তাঁদের নামও আমরা জানি না, ম্যাগাজিনটাও বোধহয় উপে গেছে, বেঁচে আছেন ভর্ৎসিত কীট্‌স।

পাগলা দাশু ছিল বিকর্ণ—দু-কান-কাটা বেহায়া। নাট্যকার তাকে যতটুকু বলতে অনুমতি দিয়েছেন তাতে সে খুশি হয়নি। দেবদূতের চরিত্রটাও সে জোগাড় করেছিল অনেক কায়দা-কানুন করে। সহপাঠীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, যাতে সে ফুট-লাইটের সামনে কোনদিন না উঠে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু পাগলা দাশুকে রোখা যায়নি। মঞ্চে ফিরে এসে সে শুনিয়ে দিয়েছিল মন-গড়া স্বগতোক্তি—"এ রাজ্যেতে নাহি রবে হিংসা অত্যাচার, নাহি রবে দারিদ্র্যযাতনা!"—না, ঠিক

মনগড়া নয়, এ-কথাগুলো বলার কথা ছিল তার সহ-অভিনেতাদের—ঐ যারা সুযোগ পেয়েছে ফুট-লাইটের সামনে দাঁড়াবার। কিন্তু তারা সুসময়ে সে-কথা বলতে ভুলেছে। তাতেই না পাগলা দাশু শুনিয়ে দিয়েছিল ঐ 'মনলোগ!'

দুর্ভাগ্য আমার! মঞ্চে কোনক্রমে ফিরে এলেও ও-কথাটা বলতে পারব না! কী করে প্রতিশ্রুতি দিই? আমার কি সে-কথা বলার হক আছে? এ রাজ্যে হিংসা-অত্যাচার চলতেই থাকবে, চল্‌ছে-চলবে দারিদ্র্যযাতনা! তবে এটুকু প্রতিশ্রুতি দিতে পারি: হিংসা-অত্যাচার হতে দেখলে মুখ বুঁজে সহে যাব না। 'সুপার-হিরো' হলেও অন্যায়-ফাউল করলে তার নাকের ডগায় মেলে ধরব: লাল কার্ড!

ভ্যাঁস ভ্যান গখ্‌ও কানকাট্টা। কিন্তু নিজে-হাতে নিজের কান কাটার পর আর তিনি সূর্যমুখী ফুল আঁকতে পারেননি। বৃদ্ধ বয়সে বন্দী ছিলেন উন্মাদাশ্রমের গরাদ-দেওয়া রুদ্ধকক্ষে। তুলিকে ছাড়েননি তা বলে! কিন্তু বিকর্ণ হয়ে যাবার পর *আলোর সাঁকো, সূর্যমুখী, বীজবপনকারী* জন্ম নেয়নি তাঁর তুলির ডগায়। এঁকেছিলেন *হতাশ বৃদ্ধ, উন্মাদাশ্রমের আবাসিক*।

ফিরে তো এলাম। কিন্তু দৈহিক সামর্থ্য ফিরে পাবার পর এ বিকর্ণের কলম থেকেও কি ঐ জাতীয় হতাশাব্যঞ্জক রচনা জন্ম নেবে?

নিশ্চয়ই না!

"—তবু ভাঙা মন্দির বেদিতে প্রতিমা অক্ষুণ্ণ রবে সগৌরবে।
তারে কেড়ে নিতে শক্তি নাই তব!"

এখনো তো সে অবস্থা হয়নি: "যদি মোরে অন্ধ কর, কর পঙ্গুপ্রায়…"

সুতরাং শেষপাতে কিছু মিষ্টান্ন বিতরণ করে যাই।

বিশ্বাস রেখ: 'জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা/ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা।'

জানি ভাই জানি—অস্থিতে-অস্থিতে জানি। বিশ্বাস রাখা খুব কঠিন। বুঝতে পারি তোমাদের অবস্থা। না, তোমাদের মতো অতটা যন্ত্রণা, অতটা দারিদ্র্য, অবহেলা সইতে হয়নি আমাকে। বেকার থাকতে হয়নি, পাণ্ডুলিপি-বগলে সম্পাদকের দোরে দোরে ঘুরতে হয়নি। তাই বলে কি অবজ্ঞাকে চিনি না? উপেক্ষাকে জানি না?

স্বীকার করি, মাঝে-মাঝে বিশ্বাস হারিয়ে যায়! এই তো সেদিন *যুগান্তর* পত্রিকায় নজরে পড়ল *বাঙলার বাতায়ন*-এ একঝাঁক অজানা, অচেনা মুখ। মফঃস্বলে যে এসব ভিন্-পালকী চিড়িয়া আছে, তারাও যে পুব-আকাশে প্রথম আলোর ছোঁয়া লাগলে সমস্বরে কিচির-মিচির করে ওঠে, সে-কথা তো কলকাতায় বসে টের পাইনি! কিন্তু ভাল করে সে-সব একলব্যের সঙ্গে আলাপই হল না। 'বাতায়ন'-এ আবছা একটা মুখের আদল শুধু নজরে পড়ল। সেই সব ভিন্-জেলার ইস্কুল-মাস্টার, কেরানি, প্রাইভেট-ট্যুশানি-নির্ভর বেকার সহযাত্রীদের নামগুলো ভাল করে চিনে নেবার আগেই দেখি *বাংলার বাতায়ন* রূপান্তরিত হয়ে গেল মুড়ি-মশলার ঠোঙায়। নামগুলি কী করে মনে থাকবে? কোনও প্রকাশক তো তাদের একসূত্রে গেঁথে স্থায়িত্ব দেওয়ার আয়োজন করেননি। কোনও খানদানি সম্পাদক তো তাঁদের ঠিকানা সংগ্রহ করে পূজা-সংখ্যায় ছোট গল্প লিখতে অনুরোধ করেননি! সম্পাদকেরা অন্তর থেকে বিশ্বাস করেন পাঠক-মানস কোন পরিবর্তন চায় না। ক্রমাগত প্রচারে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁদের বাঁ-হাতের লেখার দাম তাই বেশি—নবীনদের নতুন-সুরের চাইতে। বাংলার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা

তাই নবীনদের কাছে আউট-অব-বাউন্ডস্। খানদানি পত্রপত্রিকায় একই গানের কেটে-যাওয়া রেকর্ডে বেজে চলেছে: 'লাল গানে নীল সুর হাসি-হাসি গন্ধ'।

তবু বলব: বিশ্বাস হারিও না। প্রতিষ্ঠা পাও না পাও, সমাদর পাবেই! এগিয়ে চল। না হয় 'শম্বুক' গতিতেই। বেদপাঠের অধিকার তোমাদের ছিনিয়ে নিতে হবে ঐ সব মৌলবাদী কট্টর নীতিবাগীশদের হাত থেকে। হয়তো প্রখ্যাত মাসিক-সাপ্তাহিকের চোখধাঁধানো সালোঁতে কোনদিনই ঠাঁই হবে না। পোস্ট-ইম্প্রেশানিস্টদের মতো 'প্রত্যাখ্যাতদের সালোঁ'-সাপ্তাহিকও তোমরা প্রকাশ করে উঠ্‌তে পারবে না। হয়তো ছাপা-হরফে নিজের লেখা দেখতে পাবে—ঐ যাকে ওরা বলে 'লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন', তাইতে। তবু মনকে শক্ত রেখ। ভেঙে পড়লে চলবে না। তোমার লক্ষ্যস্থল কোনও পাঁচতারা হোটেলের 'ব্যাঙ্কোয়ে হল' নয়, যেখানে 'প্রথম সারির' সাহিত্যসেবীরা সমবেত হন বৎসরান্তে!

তোমার গানকেই শুধিয়ে দেখ, কোন হাটে সে বিকোতে চায়!

আবার বলি: প্রতিষ্ঠা পাও-না-পাও, সমাদর পাবেই। আমি জামিন থাকছি। ছাপার হরফে না হলে, পাণ্ডুলিপিতেই! প্রায় শওয়া শ' বছর আগে তোমার-আমার বন্ধু কমলাকান্ত চাটুজ্জে কী বলেছিল মনে আছে তো?

কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা! পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না—ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

অন্তরে সৌরভ যখন সঞ্চিত হয়েছে, কলমের মুখে যখন তা ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে তখন কেউ-না-কেউ তার সৌগন্ধ্যে মোহিত হবেই! এই হা-ভাত পোড়া দেশে নাই-নাই শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা—কিন্তু দরদী পাঠক-পাঠিকার অভাব এদেশে হয় না কোন দিন!

"সেই খানেতে সরল হাসি সজল চোখের কাছে" তোমার রচনা সার্থক হয়ে উঠ্‌বে!

এখন দৈনিক দশ-দুকুনে-বিশ মিনিট বারান্দায় পায়চারি করছি। কোনও ক্ষোভ নেই, কোনও অনুশোচনা নেই! কী পাইনি তার হিসাব মিলাব না! বিশ্বাস হারাইনি—নতুন করে প্রাণ পেয়ে ফিরে যখন এসেছি, কলমটাও ফেরত পেয়েছি, তখন 'হতাশবৃদ্ধের' ছবি আঁকবে না এই বিকর্ণ! সে ফিরে পাবে তার আজন্মের আশাবাদ। আগামী সপ্তাহেই সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায় নামব—ডক্টর বোস অনুমতি দিয়েছেন। যথেষ্ট সময় হাতে আছে। পাক্কা এগারো মাস। ঠিক পারব! কেন পারব না? প্রথম শৈশবেও—মনে থাক বা না থাক—এভাবেই তো শুরু করেছিলাম: হাঁটি-হাঁটি পা-পা! তাহলে এই দ্বিতীয় শৈশবেই বা পদস্খলন হবে কেন? আমাকে পারতেই হবে।

তোমরা দেখে নিও—আগামী বছর নব্বই সালের জানুয়ারীতে পায়ে হেঁটেই বইমেলায় যাব। 'ছাতা-কিয়স্ক'-এর নিচে লিট্‌ল্ ম্যাগাজিন বিছিয়ে তোমরা যখন তারস্বরে চিল্লাবে তখন গুটিগুটি আমো সেখানে হাজির। মিটি-মিটি হাসব তোমাদের কানে-তালা-লাগানো চিক্কুর শুনে। কিনব দু'এক সংখ্যা নাম-না-জানা জান-কবুল লিট্‌ল-ম্যাগাজিন, প্রতিবারের মতোই।

আর সেই যে-সন্ধ্যায় তরুণ-তরুণীরা জমায়েত হবে মুক্তমণ্ডপে, তাদের স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনাতে—কারো মুখে দাড়ি, চুল উস্‌কো-খুশ্‌কো, তাপ্পি-দেওয়া পাঞ্জাবির পকেটে চেপ্টে

যাওয়া চারমিনার,—কারও তৈলতৃষিত রুক্ষচুল দেখে ভুল হবে বুঝি শ্যাম্পু করা, ব্লাউজের হাতায় সীবনের চিহ্ন, আঁচলটা উড়ছে পৎপৎ করে—সেদিন আমাকে দেখতে পাবে আবার। কোথায়? ঐ কবিতাপাঠের আসরে, সবার পিছনে, শেষ 'রো'-তে সাড়ে-তেপায়া প্রতিবন্ধী ফোল্ডিং চেয়ারখানায়।

আর দৈবাৎ যদি সেই অস্তসূর্যউদ্ভাসিত সন্ধ্যায়—সেই যখন মাইকে গান শোনা যাচ্ছে, 'তারার পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে', তখন যদি তোমাদের নজরে পড়ে সাড়ে তে-পায়া চেয়ারখানা ফাঁকা, তাহলেও যেন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বস না!

ভুলো না: মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ!

বুঝে নিও—তা সত্ত্বেও সেই বুড়োটা লড়াইয়ে জিতেছে! সব জ্বালা জুড়িয়েছে সেই অন্তেবাসী বুনো বামুনটার—খানদানি দৈনিক-সাপ্তাহিকে সেই অকিঞ্চিৎকর খবরটা ছাপা হোক বা না হোক! সে টেনে খুলে ফেলেছে সেই আপাত-ভয়াল কালো মুখোশখানি। উপলব্ধি করেছে তার কল্যাণময় স্বরূপ!

রেখা ও লেখা—একই উৎস

আমার এই রোমান্টিক কাহিনীর নায়কের নাম সাহিত্য, নায়িকার নাম ছবি। ওরা একই অঞ্চলে, ললিতকলা-পাড়ায় পাশাপাশি বাড়ির বাসিন্দা। ছবি যখন তার বাড়ির ছাদে বেগ্‌নি-রঙের শাড়ি শুকাতে দেয় তখন পাশের বাড়িতে পড়ার ঘরের টেবিলে বসে সাহিত্যের সেটা নজরে পড়ে। ওর কলেজের নোট-টোকায় ভুল হয়ে যায়—মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে সামনের বাড়ির ছাদের দিকে। ওর মনে পড়ে যায়—ছেলেবেলায়, বাল্যে ও কৈশোরে ওরা কী দারুণ হুটোপুটি জড়াজড়ি করত। তারপর কৈশোর অতিক্রমণে ওরা পা দিল যৌবরাজ্যে। দুজনেরই দেহে-মনে দেখা দিল নানান পরিবর্তন। এখন সাহিত্যের সঙ্কোচ হয় ছবির দিকে চোখ তুলে চাইতে। পথে-ঘাটে হঠাৎ দেখা হলে নেহাৎ সৌজন্যের খাতিরে হয়ত বলে, 'ভালো?' অথবা 'পরীক্ষা তো এসে গেল, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?' ছবি জবাব দেয় না। জানে, জবাবের জন্য এ প্রশ্ন করা হয়নি। সে অহেতুক রাঙিয়ে ওঠে—কালো পাইকা-আখরে ছাপা 'নিশ্চিত্র' উপন্যাস যেমন হঠাৎ রাঙিয়ে ওঠে চার-রঙা প্রচ্ছদের সীমিত চৌহদ্দিতে। তার চেয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়া মানা। ওরা জানে, প্রতিবেশীরা তীক্ষ্ণ নজর রাখছে—ওদের মেলামেশাটা তারা ভালো চোখে দেখে না।

কিন্তু দুর্গা পূজার সময়? তখন সমাজের ঐ কঠিন শাসন কদিনের জন্য কেন জানি শিথিল হয়ে যায়। পূজা-মণ্ডপের ভিড়ে ওরা যখন হাত-ধরাধরি করে এ-পাড়া ও-পাড়ার বারোয়ারী প্রতিমা দেখে বেড়ায়—*আজকাল, আনন্দবাজার, যুগান্তর, নবকল্লোল, দেশ, প্রসাদ, উল্টোরথের* পূজা-প্যাণ্ডেলে—তখন কেউ গ্রাহ্য করে না। বরং বলে, ওদেরই তো আনন্দ করার দিন! আহা, কী সুন্দর দুটিতে মানিয়েছে!

কিন্তু পূজার পরেই যে-কে সেই! আবার ফিরে আসে সামাজিক শাসন। সাহিত্য যখন সুনীতিবাবুর 'ও, ডি, বি, এল'-এর ক্লাস করতে যায়, অথবা ছাতিমতলায় 'শান্তিনিকেতন প্রবন্ধাবলী'র পাঠ নিতে আসে তখন সে কঠোর ব্রহ্মচারী! চোখ তুলেও দেখে না, গেট-এর ওপাশে বকুলতলায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে অন্তেবাসিনী ছবি। উপেক্ষিতা! অভিমানিনী!

অথচ রাজশেখর বসু মশায়ের বাড়িতে বৌভাতের নিমন্ত্রণ হলে? সেদিন সাহিত্য পরে সিল্কের পাঞ্জাবি, ছবির খোঁপায় সে সন্ধ্যার বেলকুঁড়ির মালা জড়ানো। ওরা দুজনে হুটোপুটি করে পাশাপাশি বসে পড়ে পংক্তিভোজের আসরে। এ ওর পাতের রসগোল্লা কেড়ে নিয়ে টপ

করে মুখে পুরে দেয়। সামাজিক কর্তাব্যক্তিরা তেড়ে আসেন না। বরং হাসতে হাসতে বলেন, ব্যাটা-বেটির কাণ্ড দেখসে!

'মিলটনিক সিমিলি'টাতে এখানেই ছেদ টানা যাক!

বোঝা যাচ্ছে, আমরা কী যাচাই করতে চাই। ললিত-কলার ঐ দুই শাখা—রেখা ও লেখার সম্পর্কটা কী জাতের। কেন আমরা তাদের ক্ষেত্রে এক-এক সময় এক-এক রকম ব্যবহার করি। রেখার উপর লেখা এবং লেখার উপর রেখা কতটা প্রভাব ফেলে।

একেবারে প্রাগৈতিহাসিক যুগ যখন ঐতিহাসিক যুগে সংক্রামিত হচ্ছে তখন সাহিত্য ও চিত্রকলা ছিল মাতৃগর্ভে-লীন যমজ সন্তান। তারা শুধু জড়াজড়ি করেই ছিল না, ছিল একাত্ম হয়ে। আমি মিশরীয় হিয়েরোগ্লিফ্‌স-এর কথা বলছি। আদম-ঈভের প্রেম-কাহিনী যখন ওল্ড- টেস্টামেন্ট সংকলিত হচ্ছে প্রায় সেই আমলের কথা। মিশরীয়রা রেখা ও লেখাকে শ্যামদেশের যমজসন্তান রূপে পয়দা করে। ওরা আঁকতে আঁকতে লিখতে শেখে। অবশ্য তারও পূর্বযুগে—গুহামানবদের আমলে, শুধু রেখাই ছিল, লেখা নয়। সে হিসাবে লেখার জননী রেখা। মানুষ আগে তুলি ধরেছে, পরে কলম।

মিশরীয় হিয়েরোগ্লিফ্‌স্-এর এই রেখা-লেখার পৃথকীকরণ ব্যাপারটা ভারি মজার। ছেলে-বেলায় যাঁরা ধাঁধা করতে ভালোবাসতেন তাঁদের জন্য একটু বিস্তারিত করে বলি। বিশেষ, এ প্রবন্ধের যা মূল প্রতিপাদ্য—রেখা ও লেখার সম্পর্ক—তার সঙ্গে এ বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত।

সুধীজনমাত্রেই জানেন, মোহন-জো-দারোর লিপির পাঠোদ্ধার আজও করা যায়নি। মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার করা গেছে উনবিংশ-শতাব্দীর প্রথম পাদে। আবিষ্কারক—ফরাসী পণ্ডিত জাঁ ফ্রাঁসোয়া শ্যাপোঁলিয়ঁ। তিনি যে লিপিটার পাঠোদ্ধার করেন তার নাম 'রোজেটা (Rosetta) লিপি।' সেটি ফরাসী সৈনিকেরা ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করেছিল অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হবার মুখে। এতদিন সেটা ছিল একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন। জাঁ ফ্রাঁসোয়া দীর্ঘ চৌদ্দ বছরের সাধনায় ওটা পড়ে ফেললেন। বললেন, ওটা 197 খ্রীষ্টাব্দে খোদিত পঞ্চম-টলেমির সম্মানার্থে।

ধাঁধা সমাধানের একটিমাত্র সূত্র ছিল তাঁর হাতে। একটি প্রস্তরলিপি—যা গ্রীক সূত্র থেকে জানা যায়, টলেমির নামাঙ্কিত। ফ্রাঁসোয়া ঐ টলেমির নামে প্রথম চারটি অক্ষর চিনে ফেললেন:

P (কালো বর্গক্ষেত্র) **O** (ভারনম্র ফল) **T** (অর্ধচন্দ্র) এবং **L** (বসা-সিংহ)। এই চারটি অক্ষর অপর একটি অনুরূপ ফলকে আরোপ করে বোঝা গেল যে, সেটি 'ক্লিওপেট্রা'র নামাঙ্কিত। এভাবেই একে একে গোটা রোজেটা-লিপির পাঠোদ্ধার করলেন ফ্রাঁসোয়া।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ-সরল নয়। প্রতিটি চিত্র যে ধ্বনিসর্বস্ব একটি অক্ষরকেই বোঝাবে এমন কোনো বাঁধা-ধরা আইন নেই। বস্তুত মিশরীয় হিয়েরোগ্লিফ্ বা চিত্র-হরফ চার জাতের। প্রথম জাতের প্রতিটি চিত্র এক-একটি বিশিষ্ট ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করবে। যেমন আমরা এইমাত্র দেখেছি। দ্বিতীয় জাতের চিত্র-হরফ কোনো বিশেষ্য শব্দ বা ধারণাকে বোঝাতে

চাইছে; যেমন: চোখ, পাখি, কোণ। তৃতীয় জাতের ছবি কোনো একটি ক্রিয়াপদকে ইঙ্গিতে জানাচ্ছে। যেমন: পাখি পোকা খুঁজছে=সন্ধান করা; অধিকার-দণ্ড মাটিতে প্রোথিত=শাসন করা; অথবা মানুষ আকাশের দিকে হাত তুলেছে=প্রার্থনা করা। চতুর্থ জাতের ছবি—প্রতীকী। প্রয়োগ দেখে এবং পৌনঃপুনিক ব্যবহার দেখে পাঠক তাদের চিনতে পারে; যেমন 'আকাশ', অথবা আকাশে তারা থাকলে='নৈশআকাশ।'

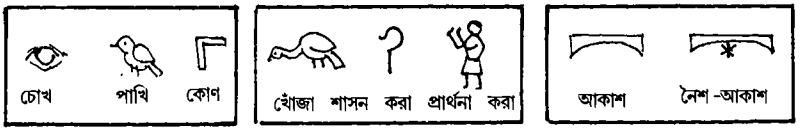

মাতৃগর্ভে-লীন এই যে রেখা ও লেখার যমজ-প্রকৃতি, বাগর্থের মতো সম্পৃক্তি, এটা ক্রমশ ঘুচে গেল তারা ভূমিষ্ঠ হবার পর। হামা দিতে শেখার পর। লেখা ভাষার মাধ্যমে পাঠকের জিজ্ঞাসু মনকে চরিতার্থ করতে চাইল, আর রেখা ভাবের মাধ্যমে চাইল দর্শকের মনোহরণ করতে। দুজনের উদ্দেশ্য আলাদা, পদ্ধতি ভিন্ন এবং প্রয়োগক্ষেত্র পৃথক। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ওরা একই মঞ্চে ফিরে এল পরস্পরের পরিপূরক রূপে, একে অপরকে সাহায্য করতে। যাকে আমরা 'সচিত্র রচনা' বলি, তার জন্ম হল।

তার প্রাচীনতম যে নিদর্শনটি আমাদের হাতে এসেছে তা: রামেসিসি প্যাপিরাস।

একটা সচিত্র স্ক্রোল্—যা মাদুরের মতো গুটিয়ে নেওয়া যায়। দ্বাদশ বংশের মিশর-সম্রাট প্রথম সেসোত্রিয়াস্-এর অভিষেক (খ্রীঃ পূঃ 1900) এতে বর্ণিত ও চিত্রিত। স্ক্রোলের উপর দিকে কিছু লেখা, নিচের দিকে গোটা-ত্রিশেক মনুষ্যমূর্তি। সবগুলিই 'প্রোফাইল' বা পাশ থেকে আঁকা। পুরুষদের দাড়ি আর মেয়েদের চুল এক বিশেষ স্টাইল-এ আঁকা—যে অঙ্কনরীতি মিশরীয় ছবিতে বহুলব্যবহৃত। এ ধরনের অনেক অনেক স্ক্রোল্ মিশরীয় পিরামিড থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। যেহেতু ওরা পরজন্মে বিশ্বাসী তাই স্ক্রোলগুলি অতি যত্নে সংরক্ষিত। আবহাওয়া বা পোকামাকড় তিন চার হাজার বছরেও কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। ঐ স্ক্রোল্গুলিকে বলা হয়: 'বুক অফ্ ডেড' বা 'মৃতদের মহাগ্রন্থ'।

গ্রীক সভ্যতাতে সচিত্র-রচনা অতি আদিম যুগ থেকেই দেখা যায়। পণ্ডিত প্রবর জাঁ পোর্চারের একটি পঙ্‌ক্তি এ বিষয়ে লক্ষণীয়:

> সাধারণ লোকের বিশ্বাস গ্রীক-সভ্যতায় সচিত্ররচনা এসেছে গ্রীক মহাকাব্য, নাটক, 'ভাস' (Vase)-এর অনুগামী হয়ে। এটা ভ্রান্ত ধারণা। বরং ঐসব শিল্প-বস্তুগুলিই অনুপ্রেরণা পেয়েছে অতি প্রাচীন সচিত্র সাহিত্য থেকে।

গ্রীক সভ্যতার প্রাচীনতম যে সচিত্র স্ক্রোল্টি আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি তার নাম—'অ্যামব্রোসিয়ান ইলিয়াড।' বর্তমানে সেটি মিলান সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। যে অংশটুকু পাওয়া গেছে তাতে গোটা-পঞ্চাশ ছবি আছে। পণ্ডিতদের অনুমান অবিকৃত অবস্থায় তাতে অন্তত আড়াই শ' ছবি ছিল। লাল, নীল, গোলাপি, সবুজ ও হলুদ—মোটামুটি এই পাঁচটি রঙেই ছবিগুলি আঁকা। প্রতিটি দেব-দেবীর জন্য বিশেষ-বিশেষ রঙ চিহ্নিত, যাতে দর্শক সহজেই তাদের সনাক্ত করতে পারে। যেমন জিয়ুস্ গোলাপি, আফ্রোদিতে সবুজ প্রভৃতি। গ্রন্থকার পূর্বসূরীর উল্লেখ করেছেন। তাই বোঝা যায়, খ্রীঃ পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর এই গ্রন্থটির আগেও সচিত্র

পুস্তক রচিত হয়েছে। পণ্ডিতদের মতে হোমার অথবা এউরিপিদেস্-এর মহাগ্রন্থগুলি হয়ত বা তাঁদের জীবিতকালেই সচিত্র আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

গ্রীকদের হাতে ক্রমে সচিত্র রচনার আর একটি বিবর্তন হল। স্ক্রোল-এর পরিবর্তে পুথির আকারে পৃষ্ঠাসংখ্যা সমন্বিত গ্রন্থ। এজন্য অঙ্কনপদ্ধতি ও শৈলীরও পরিবর্তন হল। নিরবচ্ছিন্ন পটভূমির পরিবর্তে এখন এল সীমিত পরিধিতে খণ্ড-চিত্র।

রোমান সভ্যতাতেও সচিত্র গ্রন্থ দুর্লভ নয়। প্লিনি বলছেন, ডার্‌রো 39 খ্রীষ্টাব্দে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন যাতে সাতশ জন প্রতিষ্ঠাবান রোমানের শুধু বর্ণনাই নয় প্রতিকৃতিও স্থান পেয়েছিল।[১]

রেখা-লেখার দ্বন্দ্ব-সমাসে মানবসভ্যতার ইতিহাসে চীনের অবদান অসামান্য। তিন-তিনটি যুগান্তকারী আবিষ্কারে। প্রথমটি কাগজ, দ্বিতীয়টি ব্লক বানানো, তৃতীয়টি ছাপার 'টাইপ'। গাছের ছাল, ছেঁড়া-ন্যাকড়া বা মাছ ধরার জাল থেকে ওরা কাগজ বানাতে শেখে প্রথম খ্রীষ্টাব্দেই। ওদের দাবি, কাগজের প্রথম ব্যবহার হয়েছিল খ্রীঃ পূঃ 105 সালে। অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি আরব সৈন্যবাহিনী কয়েকজন চীনা সৈনিককে গ্রেপ্তার করে, যারা কাগজ বানাতে জানত। যুদ্ধের 'ফলাফল কী হয়েছিল জানি না—কিন্তু ঐ বন্দীদের মাধ্যমে আরবেরা এবং পরে তাদের কাছ থেকে য়ুরোপ কাগজ বানাতে শেখে। অনুরূপভাবে কাঠের ব্লকে উলটো করে খোদাই করে কালির ছাপে কাগজে ছবি আঁকার কায়দাটাও চীনের আবিষ্কার। ঠিক কবে এটা ঘটেছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না; কিন্তু পৃথিবীর প্রথম ছাপা-হরফের বই—যা আজও সংরক্ষিত, তা 868 খ্রীষ্টাব্দে চীনে মুদ্রিত: 'হীরক সূত্র'। একটি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। দশম শতাব্দীতে মুদ্রিত কন্‌ফুশিয়াস-এর বাণীতে শুধু লেখা নয়, কাঠ খোদাই-এ ছবির ব্লকও ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু চীনা পণ্ডিতেরা এ ব্যাপারটাকে বিশেষ পাত্তা দেননি। এ প্রযুক্তিবিদ্যা যেন নেহাৎ খেলো ব্যাপার। যামিনী রায়ের মূল পট আর প্রিন্টের মধ্যে যে বাজার-দরের প্রভেদ, তাই যেন! চীনারা ঐ যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফায়দা ওঠালো না—ক্রমাগত নিপুণ-তুলিতে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির অনুলিপি করে গেল।

চীনারা 'লেখা'র চেয়ে 'রেখা'কেই বেশি প্রাধান্য দিল। ওরা আদপেই কলম ব্যবহার করেনি। লিখত তুলি দিয়ে। লিপিকুশলতা বা ক্যালিগ্রাফি একটা দুর্লভ গুণ বলে বিবেচিত হত। ওদের লিখিত বর্ণলিপি হচ্ছে চিত্র-কল্প, ধ্বনি-নির্ভর নয়। যদিও ওদের কথ্যভাষা এক-এক অঞ্চলে এক-এক রকম, কিন্তু ভাষার লিখিতরূপটি সর্বত্র সমান। এই এক 'লিখিত ভাষা' মহাচীনকে একতা-বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে সাহায্য করেছে। ভারতবর্ষের মতো ভাষাগত বিরোধ সেখানে প্রকট নয়। ফলে কী দক্ষিণাঞ্চল, কী উত্তরাঞ্চল যে-কোনো শিক্ষিত চীনা একই মুদ্রিত পুস্তক পড়তে পারবেন, যদিও তাঁদের পাঠ শুনে ভিন্ন অঞ্চলের পাঠক তার অর্থ বুঝতে পারবেন না! ব্যাপারটা বোঝা গেল না, তাই নয়? একজন কেরালাবাসী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত যদি কোনও সংস্কৃতগ্রন্থ পাঠ করেন তাহলে কোনও সংস্কৃতজ্ঞ কাশ্মীরী পণ্ডিত তা অনায়াসে বুঝতে পারবেন; কারণ সংস্কৃত ভাষার লিখিতরূপ ধ্বনি-নির্ভর। কিন্তু কোনো দক্ষিণবাসী চীনা-পণ্ডিত একটি চীনাগ্রন্থ পাঠ করলে তার অর্থ বুঝবেন না উত্তরাপথের পণ্ডিত, যদিচ তিনি নিজে ঐ গ্রন্থটি পাঠ করতে পারবেন। এমন অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটছে কেন?

গল্পটা শুনলে বুঝবেন। ক্লাসিকাল কাহিনী। পুনরুক্তি দোষে এর রসাভাস হয় না। মুজতবা আলীসাহেবও এর অন্য একটি ভার্শান শুনিয়ে গেছেন:

খোলা সদর-দরজা দিয়ে 'ঘটি-গিন্নিমা' দেখতে পেলেন ঝাঁকা মাথায় উদ্বাস্তু মেয়েটি এসে দাঁড়িয়ে জানতে চাইছে: 'সব্‌জি নিয়েন নিকি মা?'

গিন্নি-মা শুধালেন, কী আছে গো ঝাঁকায়? নাউ?

মেয়েটি 'now' চেনে না, অতীত-সর্বস্ব! বললে, আজ্ঞে না মাঠান, বায়গন।

'বায়গন' আবার গিন্নি-মার অপরিচিত। বলেন, নামাও তো দেখি, কী তোমার by gone!

দেখে হাসলেন। সস্নেহে ধমক দিলেন ঐ 'বাঙাল' পসারিনীকে, তোমরা একে 'বায়গন' বল কেন? 'বেগুন' বলতে পার না? 'বেগুন' কথাটা কত মিষ্টি!

মেয়েটিও হাসল মুখে আঁচল চাপা দিয়ে। ঘটি গিন্নি-মাকে ফিরিয়ে দিল জবাব: মিঠা বুলি কওন যদি প্রেয়জন হয়, তয় অরে 'প্রাণনাথ' কইলেই পারেন! শুনতে আরও মিষ্ট লাগব।

অর্থাৎ বেগুন অথবা তার ছবি দেখলে ঘটি-বাঙাল দুজনেই বুঝতে পারেন, কথিত ভাষায় তার ধ্বনিভেদ ঘটলেও।

ধরুন যীশুখ্রীষ্টের cross-চিহ্ন। ইংরেজ তাকে বলছে 'ক্রস', ফরাসী বলছে 'ক্রোয়া', বাঙালী বলছে 'ক্রুস্', কিন্তু উচ্চারণ যাই হোক ঐ চিহ্নের যে চিত্রকল্প তার ব্যঞ্জনা তিনজনের কাছেই অভিন্ন।

একটু আগে বলেছি 'চীনা অক্ষরগুলি চিত্রকল্প', কিন্তু সেটাও ভুল তথ্য। কারণ চীনাভাষায় 'অক্ষর' আদৌ নেই। ওদের সব শব্দই এক ধ্বনির এবং হস্-অন্ত যুক্ত—যাকে বলি এক সিলেব্‌ল্-এর। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চিত্ররূপ। এরকম হাজার চল্লিশ 'চিত্রকল্প' চীনা অভিধানে খুঁজে পাওয়া যাবে। তার ভিতর ছয়-সাত হাজার শব্দ মধ্যযুগে লিখিত ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত হত; আর কেউ যদি তার আধা-আধি আয়ত্ত করতে পারতেন তাহলে তাঁকে পণ্ডিত বলে মেনে নিতে কেউ আপত্তি করত না।

আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের যা বিষয়বস্তু—রেখা আর লেখার 'দ্বন্দ্ব'—তা সব চেয়ে জমাট বেধেছিল মহাচীনে। 'দ্বন্দ্ব' শব্দের উভয় অর্থেই। তাই একটু বিস্তারিত করে বলতে হবে:

চীনা শব্দের দুটি করে অংশ। একটা হচ্ছে মূল ধাতু বা মূল রূপ; অপরটি তার প্রত্যয়াংশ বা রূপান্তর। 'সূর্য' এবং 'চন্দ্র' এ-দুটি শব্দের প্রতীকচিহ্ন যখন পাশাপাশি বসবে তখন তার যোগফল 'সূর্যচন্দ্র' হবে না, হবে ভিন্ন অর্থবহ যোগরূঢ় একটি শব্দ: ঔজ্জ্বল্য। তেমনি দুটি গাছ-চিহ্ন পাশাপাশি বসলে তার অর্থ হল—অরণ্য।[২]

তা যে আমাদের 'আ-মরি বাঙলা ভাষা'তেও হয় না তো বলতে পারি না। 'সিংহ' আর 'আসন' যোগ করলে উঠে বসার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কিন্তু চীনাভাষায় এ-জাতীয় রূপান্তর প্রায় প্রতিটি শব্দে। ফলে ভাষাটা রীতিমতো দুষ্পাচ্য হয়ে পড়ে। মূলচিত্রের সঙ্গে প্রত্যয়ের লেজুড় জুড়ে-জুড়ে কেমন নানান অর্থবহ নতুন শব্দ উৎপন্ন করা যেতে পারে—বিশেষ্য অথবা ক্রিয়াপদ, তা সংলগ্ন চিত্রে দেখানো গেল। 'পাও' একটি মূল ধাতু, অর্থ: 'পুঁটুলি'। এর সমুখে অথবা পিছনে বিভিন্ন প্রত্যয়াংশ যোগ করে ধাতুটাকে নানান অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে—বহন করা, ছুটে পালানো, জল-বুদ্বুদ, অথবা ফুলের কুঁড়ি। অথচ মজার কথা প্রতিটি নূতন শব্দের উচ্চারণ থাকছে অপরিবর্তিত—সেই আদি-অকৃত্রিম 'পাও'! আর একটা উদাহরণ নিন: 'ডুঙ'। এই মূল ধাতুর সঙ্গে যদি 'জল' প্রত্যয় যোগ করেন অর্থ হয়ে যাবে 'জমে যাওয়া'; আবার যদি 'গাছ' প্রত্যয় যোগ করেন পাবেন 'ছাদের কড়িবরগা'! অথচ 'বললে-না-পেত্যয় যাবেন' প্রত্যয়-যোগ করার পরেও সংযুক্ত শব্দটি দুটি ক্ষেত্রেই থাকছে

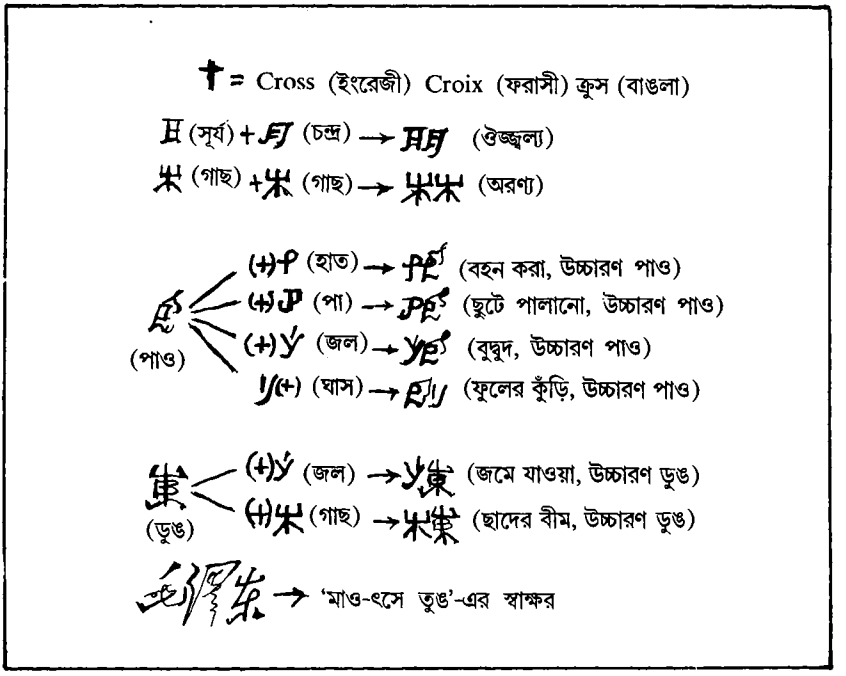

অপরিবর্তিত : 'ডুঙ', যদিও ইংরেজের অনুকরণে আমরা ওটাকে 'টুং' বলি অথবা 'তুং'—যেমন 'বর্ধমান'কে বলি 'বাডওয়ান', শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানকে বাল্মীকির মনোভূমি ব্যতিরেকে—'আউদ' !

এই যে রকম একই শব্দ—কী লিখিত রূপে, কী-উচ্চারণে—ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বা ক্রিয়াকে বোঝাচ্ছে, তা কম-বেশি সব ভাষাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে। 'তীর' বললে নদীর কিনারা অথবা ধনুকের পরিপূরক, দুটোকেই, বোঝাতে পারে। ইংরেজিতে bank বললে নদীর কিনারা অথবা অর্থসঞ্চয়ের কিনারা বোঝাতে পারে। বাক্যে শব্দটির ব্যবহার দেখে আমরা শব্দটির সঠিক কিনারা করতে পারি। কারণ এ জাতীয় 'দ্ব্যর্থ-বোধক' শব্দের ব্যবহার অল্প। অপরপক্ষে চীনাভাষায় তা ঝুড়ি-ঝুড়ি ! একই বাক্যে ব্যবহৃত চার-পাঁচটি শব্দের প্রত্যেকটি যদি চার-পাঁচটি অর্থবহ হয়, আর তাদের প্রত্যেকের উচ্চারণই যদি হয় অভিন্ন, তাহলে ভাষার প্রত্যেকটি বাক্যই হয়ে যাবে সেই জাতীয় অনর্থ, যার অর্থ সমঝাতে অভিধান খুলেও কিনারা করা মুশ্‌কিল :

"হরির উপরে হরি, হরি বসে তায়।
হরিরে দেখিয়া হরি, হরিতে লুকায়।"

আজ্ঞে হ্যাঁ, 'হরি' শব্দের সবকটি অর্থ নিয়ে পার্মুটেশন অঙ্ক কষে দেখুন, অর্থলাভ হবে। 'রুবিক-কিউব' নিয়ে যাঁরা সময় কাটাতে ভালবাসেন তাঁদেব জনান্তিকে জানাই—'হরি' শব্দের অর্থ হতে পারে : সাপ, ব্যাঙ, জল, পদ্ম, ভগবান।

এই দুর্বোধ্যতা দূরীকরণ-মানসে বিপ্লবের পর, বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চম দশকে, চীনা পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়ে 'রেখা' ও 'লেখা'র 'দ্বন্দ্ব' (কাজিয়া) মিটিয়ে 'দ্বন্দ্ব' (সন্ধি)

করেছেন। এখন চীনা ভাষায় সর্বমোট 214টি মূল শব্দ বা ধাতু। বলা যায়, এরা সেই ভূমিকাটি পালন করে যা ইংরেজি ভাষায় পালন করে ছাব্বিশটি অক্ষরের অ্যালফাবেট।

কিন্তু রেখা-লেখার এই লড়াই-কাজিয়া মেটার ব্যাপার তো ইদানীং কালের ঘটনা। মধ্যযুগে কী হত? বলি শুনুন:

অতিপ্রাচীন কালেও রাজপরিবারের পোলাপানেরাই বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা অথবা ব্যুরোক্রাসির বিভিন্ন ধাপে 'সিংহ-চিহ্নিত আসনে' উপবিষ্ট হতেন। ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী থেকে এ নিয়ম ক্রমশ লোপ পেল। বড়কর্তারা সমঝে নিলেন—ভাই-ভাতিজা, বে।-পোতাকে শাসন দায়িত্ব দিলে নিজেরই 'সিংহাসন' খোয়া যাবার আশঙ্কা। তার চেয়ে ওদের 'ভাতা' বা 'মাসোয়ারা' দেওয়াটা বাঞ্ছনীয়। এল সিবিল-সার্বিস্ পরীক্ষা নেওয়ার রেওয়াজ। তার নাম: 'চিন-শীহ্'।

পরীক্ষা দিতে আসত দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেরা ছাত্রের দল। পরীক্ষায় তিনটি প্রশ্ন আবশ্যিক: হস্তলিপি, চিত্রাঙ্কন ও কবিতা রচনা।

জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হতে চাও? —বেশ কথা, পট আঁকতে জান? —ভাবখানা এই রকম। ফলে প্রাণের দায়ে চীনা-যুবক পটুয়া হতে শিখেছে চাকরি বলে কথা! তার মানে এ নয় যে, আমার বক্তব্য—চীনা শিল্পী আভ্যন্তরীণ সৃষ্টির তাগিদে ছবি আঁকেননি। মোটেই তা নয়। বরং সেই জাতের জাতশিল্পীই সিবিল-সার্ভিসে রেকর্ড মার্ক পেতেন।

দু-একটা মজার উদাহরণ দিই। তাহলে ব্যাপারটা সহজে বোঝা যাবে:

একবার পরীক্ষায় প্রশ্ন এল—চিত্রের বিষয়বস্তু, একটি চীনা কবিতার এক অসমাপ্ত পংক্তি: "সাঁকোর পাশে, বাঁশঝাড়ের আড়ালে ভাঁটিখানার ঐ দোকানটা—"

চমৎকার বিষয়বস্তু। কেউ বাঁশঝাড়টাকে প্রাধান্য দিল, কেউ সাঁকোটাকে। সাঁকোর সূত্র ধরে চুটিয়ে আঁকল নদীটাকে। আবার কোন কোন ধুরন্ধর সমঝে নিল: আরে বাপু! বাঁশঝাড় আর সাঁকোটা তো শুধু পথটা চিনিয়ে দিতে—মূল বিষয়বস্তু যেটা প্রশ্নকর্তা আঁকতে বলেছেন তা হচ্ছে ঐ শুঁড়িখানা। চুটিয়ে আঁকল সেটাকেই—মাজাভাঙা, খড়ো-চাল ঘর, ভূশয্যালীন মদ্যপ আর তার মুখশোঁকা লেড়িকুত্তা। চিত্রশিল্পের ইতিহাসে দেখছি লেখা আছে, সে-বছর যে ছেলেটি ফার্স্ট হয়, সে ভাঁটিখানাটিকে আদৌ আঁকেনি। এঁকেছে সাঁকোটাকে, বাঁশঝাড়টাকে আর বাঁশঝাড়ের একটি নুয়ে পড়া বাঁশের গায়ে দোদুল্যমান একটি সাইনবোর্ড:

'তৃষ্ণা নিবারণের আয়োজন এই পথে →।'

ব্যাস্! মদের দোকান চিত্রে অনুপস্থিত।

প্রশ্নের ঐ 'আড়ালে' শব্দটার লা-জবাব জবাব! বাঁশঝাড়ের আড়ালে যারা এই জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে সাময়িক মুক্তি চায় তারা অন্তরালেই থাকতে চায়।

মনে পড়ে যায় অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশ:

> কুটিরটি আধখানা লিখিলাম, আর আধখানি গাছের আড়ালে ঢাকিয়া দিলাম। কুটিরের লেখা অংশটি কুটিরের ভঙ্গি বা কুটিরের ভাবের প্রকাশের দিকটা আমাদের দেখাইল, আর গাছের আড়ালে ঢাকা কুটিরের প্রচ্ছন্ন অংশটুকু জানাইতে লাগিল কুটিরের ভিতরের ভাব, কুটিরবাসীর নানা লীলা। সে দিকটায় আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি নানা অলিখিত বস্তু।[৩]

আপনাদের বিশেষ করে লক্ষ্য করতে বলব ঐ ক্রিয়াপদটি: 'লিখিলাম'।

লেখা আর রেখার ঐ সম্রাট ছবি 'আঁকতেন' না—অবন-পটুয়া ছবি 'লিখতেন'!

আর একবার। সেবার চিত্রাঙ্কনের বিষয় ছিল:

"ধনকুবেরের অর্থপ্রাচুর্য!"

এবারেও দেখছি, ধনকুবেরের অর্থপ্রাচুর্য দেখাতে পরীক্ষার্থীর দল হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। শ্বেতপাথরের মূর্তি, ফোয়ারা, গালিচা, শ্যাণ্ডেলেয়ার, নর্তকী, সুরাপাত্র, ভৃঙ্গার—ইত্যাদি প্রভৃতির ভিড়। এবারেও দেখছি যে ছোকরা প্রথম হয়েছে সে ঐ ধনকুবেরের প্রাসাদে আদৌ প্রবেশ করেনি! এঁকেছে একটা ফুটপাথ, একটা 'উপচীয়মান' ডাস্টবিন, তার উপর হুমড়ি-খেয়ে-পড়া একটা খেঁকি-কুকুর আর একটা ভিখারী! ব্যস্!

এ কী রে বাবা? এই হচ্ছে 'ধনকুবেরের অর্থপ্রাচুর্য'?

আজ্ঞে হ্যাঁ। দৃষ্টি থাকলে দেখতে পাবেন। নজর করে দেখুন—ক্যানভাসের একপ্রান্তে কারুকার্যখচিত একটা লোহার-গেট-এর আভাস। তার পাল্লাটা আধখোলা। বেরিয়ে এসেছে একজন কিঙ্করীর কাঁকনপরা হাত—সে হাতে একটি পাত্র, তাতে অর্ধভুক্ত খাদ্যসামগ্রী: চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া, মুর্গির ঠ্যাঙ।

শিল্পী যেন দর্শককে ধমক দিয়ে বলছেন: কে হে বাপু তুমি হরিদাস পাল! 'ধনকুবেরের অর্থপ্রাচুর্য' দেখতে ঐ প্রাসাদের ভিতরে ঢুকতে চাও? তুমি-আমি তো সগোত্র! এখানে আমার পাশে এসে দাঁড়াও, ঐ ডাস্টবিনটা ঘেঁষে। ধনকুবেরের অর্থপ্রাচুর্যের অপচয়টা দেখতে পাবে ঐ লোলুপ ভিখারীটার চোখের আয়নায়, যে হতভাগ্য একটা হাত বাড়িয়ে কুকুরটাকে ঠেকাচ্ছে!

চীনারা, আগেই বলেছি, লেখার জন্য কলম ব্যবহার করত না। রেখা-লেখা দুটোই তুলির সাহায্যে। ঐ তুলি ধরেই তিন-তিনটি প্রশ্নের জবাব দিত: ক্যালিগ্রাফি, কবিতা, আর ছবি।

তার ফলে চীনা চিত্রে ঐ রেখা বা 'আউট-লাইন' হচ্ছে মৌল উপাদান। যাকে বলি —বর্ণিকাভঙ্গ'। আমরাও মাটির প্রতিমা গড়তে বাঁশ-দড়ি-খড় ব্যবহার করি; কিন্তু সেগুলি সযত্নে চাপা দিই। চীনা চিত্রকর হালকা জলরঙের ছবিতেও ঐ প্রাথমিক বহিরঙ্গ রেখাকে চাপা দেন না। দেবেন কেমন করে? তা তো পেনসিলে আঁকা নয় যে, ইরেজার ঘষা যাবে!

কিন্তু মুশ্‌কিল হল এই যে, ওদের 'অ্যালফাবেট্' সীমাহীন। ইংরাজী হরফে **STREET** লিখতে ছয়টি অক্ষরের প্রয়োজন এবং তারা পাশাপাশি বসে। বাংলায় আমরা দুটি অক্ষরে কাজ সারি, কিন্তু প্রথম পাঁচটি ইংরাজি হরফের এমন এক খিচুড়ি পাকাই যে, প্রেস-এর হাঙ্গামা বাড়ে। চীনাদের ঐ রকম হাজার-হাজার অক্ষর-যুক্তাক্ষর। তাই মহাচীন যদিও একাদশ শতকে সম্প্রসারণশীল 'টাইপ' আবিষ্কার করে ফেলেছিল, কিন্তু তা কাজে লাগাতে পারেনি। পশ্চিমখণ্ড প্রায় চারশ বছর পরে তার পুরো ফায়দা ওঠালো।

চীন থেকে আবার য়ুরোপ-খণ্ডে ফিরে আসা যাক।

চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ থেকে খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের তৈরী স্ক্রোলের পরিবর্তে পার্চমেন্টে পৃষ্ঠাসংখ্যাসম্বলিত পুথির কথা জানা যায়। গ্রীক ভাষায় রচিত প্রাচীনতম বাইবেলখানি 350 খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত। এটি রাখা আছে রোমের ভ্যাটিকান সংগ্রহশালায়। ইংরাজি ভাষায় প্রথম বাইবেল 1535 সালে মুদ্রিত—সেটি জার্মানিতে ছাপা।[৪] প্রাচীনতম ইলুমিনেটেড মুদ্রিত পুস্তকটি (1461) হচ্ছে Ulrich Boner-কৃত Der Edelsten.

এইখানে 'ইলুমিনেটেড' শব্দটির কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 'ইলাস্ট্রেটেড' বই হচ্ছে সচিত্রগ্রন্থ—বর্ণিত-বিষয়ের চিত্ররূপ যাতে দেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে 'ইলুমিনেটেড' অর্থ অলঙ্কৃতগ্রন্থ। মধ্যযুগে রচনা অনেক সময় সচিত্র হত না; কিন্তু গ্রন্থটিকে নয়নাভিরাম করতে নানান রকম অলঙ্করণ করা হত। প্রতিটি অধ্যায়ের আদ্য-অক্ষর একটি ছবি—তার ভিতরেই 'ক্যাপিটাল' অক্ষরটি বসানো। পৃষ্ঠাতে বর্ডার দেওয়া হত— নানা ফুল-লতা-পাতা এমনকি নর-নারী, জীবজন্তু, কল্পলোকের পরী বা দেবশিশু। তাতে দেখা যেত সোনালি রঙের বহুল ব্যবহার, যাতে প্রদীপের আলোয় পৃষ্ঠাখানি জ্বলজ্বল করত, যা থেকে 'ইলুমিনেশান'-এর ধারণাটা এসেছে। শব্দটা এসেছে লাতিন illuminare (আলো) থেকে।

রেনেসাঁস প্রাগ্-ঊষা লগ্নে—একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতেও সচিত্র এবং সালঙ্কৃত পুথির সন্ধান পাওয়া যায়। রেনেসাঁসের জোয়ারের ভরা-কোটালে একাধিক রাষ্ট্রপ্রধানের আর্থিক সহায়তায় সচিত্র ও সালঙ্কৃত গ্রন্থের এল প্লাবন। ফ্লোরেন্স নগরীর রাষ্ট্রপ্রধান লরেঞ্জো মেদিচির উৎসাহে লিপিবদ্ধ হল—'লরেঞ্জো আওয়ার্স' (1458), তাতে ছবি এঁকেছিলেন ফ্রাঁসেস্‌কো দ'আন্তোনিয়। মিলানের ডিউক ইল্-মুর-এর অর্থ সাহায্যে রচিত হল 'স্‌ফরজা বুক অব আওয়ার্স' (1490)। বিচিত্রিত যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আন্তোনিয় দা মৌজা এবং আম্‌ব্রোগিয় দে প্রেদিই শুধু নয়,স্বয়ং লেঅনার্দো দ্য ভিঞ্চির তুলিও সম্ভবত সক্রিয় হয়েছিল। ডিউক অব উরবিনোর আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় পেরুৎসিনো কর্তৃক অলঙ্কৃত 'আলবানি আওয়ার্স' গ্রন্থের মূল কপিটি আজও ভ্যাটিকান সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত। এ জাতীয় সচিত্র গ্রন্থরচনায় আরও অনেকে অর্থ সাহায্য করেছেন—হাঙ্গেরি, পর্তুগাল, স্পেন ও আরাগঁ-র নৃপতিবৃন্দ। য়ুরোপের অন্যান্য রাজ্যে রাজা-রাজড়ার সালঙ্কৃত 'কমেমরেশন ভল্যুম' প্রণীত হলেও ইংল্যান্ডে তেমন কিছু হয়নি। যে বছর কুখ্যাত অগ্নিকাণ্ডে লন্ডন শহর বিধ্বস্ত হয়েছিল সেই 1666 খ্রীষ্টাব্দে দেখছি প্রথম ইংরাজি সচিত্র পুস্তক ইংলন্ডেই ছাপা হয়ে বের হচ্ছে: ফ্রান্সিস্ বারলোর একখণ্ড ঈশপের গল্প। আরও ষাট-সত্তর বছর পরে ছাপা হয় উইলিয়াম হোগার্থ বিচিত্রিত (1726) বাটলার লিখিত Hudibras। এর প্রায় সমসাময়িক রিচার্ড বেন্ট্‌লের আঁকা টমাস গ্রের একটি কাব্য সঙ্কলন।

মধ্যযুগে এমন অনেক চিত্রশিল্পী—যাঁদের আমরা চিত্রকর হিসাবে জানি—তাঁরা এনগ্রেভার হিসাবে মুদ্রণ-শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। অনেক বই তাঁরা সচিত্র করেছেন। যেমন ড্যুরের (1471-1528); যেমন রুবেন্‌স (1577-1640)। বুশের (Boucher, 1703-70) এবং ফ্রাগোনার (Fragonard, 1732-1806) শুধু তৈলচিত্রই আঁকেননি, Lives de paintres (সচিত্র-গ্রন্থের শিল্পীসঙ্ঘ)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানান বইয়ে ছবি এঁকেছেন। দেলাক্রয়া (1798-1863) গেটের 'ফাউস্ট'-মহাগ্রন্থটি চিত্রিত করেন। ইম্‌প্রেশনিস্ট স্কুলের জনক মানে (Manet, 1832-83) এডগার এলেন পো-র 'দ্য র‍্যাভেন' কবিতাটির ছবি আঁকেন, তুলুজ-লোত্রেক (Toulouse - Lautrec, 1864-1901) এবং রেদঁ (Readon 1840-1916) সাহায্য করেন ফ্লবেয়ার-এর গ্রন্থ বিচিত্রিত করার কাজে। এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে যাই স্বয়ং পিকাসো 1960 সালে লিথোগ্রাফ-প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে Tauromachia নামে একটি গ্রন্থের সচিত্র এডিশন প্রকাশে অংশ নিয়েছিলেন।

দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী-কালে এনগ্রেভার তথা গ্রন্থচিত্রিত করার কাজে যাঁর নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে তিনি আর্থার এরিক গিল (1882-1940)। যদিও তিনি মূলত এনগ্রেভার ও ভাস্কর,

তবু তাঁর আঁকা ডিজাইন এবং নিজস্ব ছাপাখানায় তৈরি ব্লক পুস্তকে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিখ্যাত ইলাস্ট্রেটর: বার্নেট ফ্রীম্যান, এডওয়ার্ড ব'ডেন এবং আরডিজম।

সম্প্রতি বিড়লা আকাদেমীতে একটি অসাধারণ প্রদর্শনী হয়েছিল 'Exhibition of Modern Artists as Illustrators'— চিত্রগুলি অধিকাংশই নু-ইয়র্কের মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট থেকে সংকলিত। যাঁদের ছবি এই প্রদর্শনীতে ছিল তাঁরা হলেন—পিকাসো, অঁরি লরেঁস্, হুয়ান গ্রিস, মাতিস, রুয়ো, শাগাল, চিরিকো, অঁরি মূর, মাত্তা, মিরো, ওয়ারহল, রবার্ট ইলিয়ানা, জিম, ডাইম, ডেভিড হক্‌নি ইত্যাদি ইত্যাদি। পিকাসো 'অভিদ-এর মেটামরফসিস'-কে ছবিতে রূপদান করেছেন (স্মর্তব্য: রদ্যাঁ-প্রদর্শনীতে একই বিষয়ে একটি ভাস্কর্য ছিল): যেমন মালার্মের কবিতাকে অলঙ্করণ করেছেন অঁরি মাতিস। এই প্রদর্শনীর একটি সুন্দর সমালোচনা করেছিলেন প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত[৫]। ছবির উদাহরণ যখন দিতে পারছি না তখন বিস্তারিত আলোচনা করে প্রবন্ধটি ভারাক্রান্ত করা নিরর্থক।

এতক্ষণ আমরা শিল্পীকে দিয়ে লেখক বা কবির রচনাকে অলঙ্করণের কথা আলোচনা করছিলাম। লেখক বা কবি যেখানে স্বয়ং শিল্পী সেদিকে এবার দৃষ্টি ফেরাই। লেঅনার্দো দ্য-ভিঞ্চিকে দিয়ে উদাহরণ শুরু হওয়া উচিত; কিন্তু তিনি না লেখক, না কবি। মিকেলেঞ্জেলো কবিতা লিখেছেন, অনবদ্য ছবিও এঁকেছেন, কিন্তু নিজেই নিজের কবিতার অলঙ্করণ করেছেন এমন কথা শুনিনি। লেঅনার্দোর নোটবুক ছবিতে ঠাসা, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বক্তব্য বিষয়টি ছবি এঁকে বোঝাতে চাননি; বরং তাঁর ছবিটি ব্যাখ্যা করতে কিছু কিছু লিখতে বাধ্য হয়েছেন।

পশ্চিমখণ্ডে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ কবি উইলিয়াম ব্লেক (1757-1827)। অপরের বইতেও তিনি ছবি এঁকেছেন—যেমন এডওয়ার্ড ইয়ং-এর 'নাইট-থট্‌স্' (1795-97); কিম্বা রবার্ট ব্লেয়ারের 'দ্য গ্রেভ'। কিন্তু নিজের কবিতাগুলি অলঙ্করণেই 'ইলাস্ট্রেটার' হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্লেকের কবিতা ও ছবির পারস্পরিক সহযোগিতার একটি অনবদ্য আলোচনা করেছেন একসময়। তাঁর মতে, "কবিতার ইতিহাসে ব্লেকই একমাত্র যিনি ভাষা ও ছবির সাযুজ্যে কবিতা গড়েছেন।"[৬]

'একমাত্র' না হলেও ব্লেকই যে সর্ববিখ্যাত উদাহরণ একথা অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় উদাহরণ দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি (1828-1882)।

> তিনি কবি, চিত্রকর উভয়ই। ইংলণ্ডে 'প্রি-রাফালাইট' আন্দোলনের উদ্যোক্তা। প্রথম যুগের ইতালিয়ন চিত্রকরদের আদর্শে ইনি ছবি আঁকতেন। তাঁর The Day-dream ছবিখানি জগৎবিখ্যাত। ইংরাজ কবিসাহিত্যিকদের অনেকেই ছবি আঁকার চর্চা করে গেছেন। ভিক্টর উগোর খুব ঝোঁক ছিল ছবি আঁকার দিকে। একটু বই-পত্র না ঘেঁটে বলতে পারব না, তাঁর কোনো রচনায় তিনি ছবি এঁকেছিলেন কিনা।[৭]

আমেরিকায় ইদানীং যাঁরা গ্রন্থচিত্রণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন তাঁদের পরিচয় ও ইতিবৃত্ত পরিমাপ করা যাবে A Treasury of American Book Illustration গ্রন্থটি থেকে। এক্ষেত্রেও সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরিহার করে তিনটি নাম মাত্র উল্লেখ করছি—এডগার এলেন পো-র ছোট গল্পের একটি অনবদ্য সংস্করণ বিচিত্রিত করেছিলেন আইজেনবার্গ; ড্যানিয়েল ডিফো-র 'রবিনসন ক্রুসো'-র একটি অপূর্ব সংস্করণ ছিল ডুভয়সন

অলঙ্কৃত এবং 'অল মেন আর ব্রাদার্স'-গ্রন্থের ইলাস্ট্রেটার—কোভারুবিয়াস্।

এবার বরং ইসলাম জগতে দৃষ্টি ফেরাই।

কোনো কোনো ইসলামি পণ্ডিতের মতে কোরানে নাকি নির্দেশ আছে—ধর্মস্থানে বা ধর্মগ্রন্থে ছবি আঁকা মানা। বিশেষ করে পীর পয়গম্বরদের বা মানুষের প্রতিকৃতি। কিন্তু হজরত মহম্মদের দেহান্তের তিন-চারশ' বছরের ভেতর আরবীয় বাহিনী যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল তার একাধিক অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করলেও ঐ নির্দেশটা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি—তুরস্ক, পারশ্য, মিশর প্রভৃতি দেশ যে সহস্রাব্দীকাল ধরে তুলির সাহায্যেই অব্যক্তকে ব্যক্ত করতে শিখেছে, ছবি এঁকে পেয়েছে শান্তি, করেছে অপরের মনোহরণ। তাই ওসব রাজ্যে কোরানশরিফ সচিত্র না হলেও সালঙ্কৃত হয়েছে। তারা মানুষের ছবিও এঁকেছে, এমনকি পীর পয়গম্বরদেরও। তুর্কিস্থানে প্রাপ্ত একটি রঙিন স্ক্রোলে[৮] দেখছি, মক্কার অধিবাসীরা হজরৎ মহম্মদ ও আবু বকরকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। এটি ষোড়শ শতাব্দীর শিল্প প্রচেষ্টা। শিল্পী সাহস করে মহম্মদের মুখটুকু আঁকেননি—অথবা কে-জানে হয়তো এঁকেছিলেন, পরবর্তীকালে কোনোও ধর্মান্ধ সাদা রঙের পোঁচড়া বুলিয়ে পূর্বসূরীর 'অপকীর্তিটা' অবলুপ্ত করতে চেয়েছে। যেভাবে স্বয়ং আওরঙ্গজেব চুনকাম করে ঢেকে দিয়েছিলেন আকবরের উৎসাহে অঙ্কিত ফতেপুর সিক্রি ও সেকেন্দ্রা-প্রাচীরে অনবদ্য কিছু ইন্দো-পারসিক প্রাচীরচিত্র। অপর একটি উদাহরণে—তবরিখ্ অঞ্চলের জমিরে, ইরাণে, রসিদ-অল-দীন্-এর আঁকা একটি স্ক্রোলে (1307-08) হজরৎ মহম্মদ ও আবু বকরকে একত্রে আঁকা দেখছি। এখানে হজরৎ মহম্মদের মুখাকৃতি নিষ্ঠাভরে আঁকা। চিত্রটি বর্তমানে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত।[৯]

ধর্মপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থে—বিশেষত কাব্যে, ঐ সব মুসলিম রাজ্যে অনবদ্য পুথি দেখা যায়—সচিত্র ও সালঙ্কৃত। রাশিয়ান পণ্ডিতেরা দাবি করেন সোভিয়েত খোয়ারিজান (Khwarizan) অঞ্চল থেকে ওঁরা সপ্তম শতাব্দীর একখণ্ড সচিত্র পুথি পেয়েছেন—সোরাব-রুস্তম কাহিনীর।[১০]

ওমর খৈয়াম-এর একটি অনবদ্য রুবাইয়াৎ—হাতে আঁকা পুথি, আজও দেখতে পাবেন হায়দ্রাবাদের সফদরজঙ সংগ্রহশালায়।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে আরও উল্লেখ করি, তুর্কিস্থানে-প্রাপ্ত ঐ রঙিন স্ক্রোলে হজরৎ মহম্মদের মুখখানি যে আঁকা হয়নি তা দেখতে পাবেন একটি সহজলভ্য গ্রন্থে—*'The Last Two Million Years'* ; The Reader's Digest, 1973, p.157. এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত চিত্রটির একটি অনুলিপি দেখতে পাবেন Jeam Porcher সম্পাদিত মহাগ্রন্থে: *History of World Art*-এ।

আমার স্মরণে আছে, চল্লিশের দশকে বাবা আমাকে একটি মোটা ইংরেজি বই কিনে দিয়েছিলেন—পোকায় কাটেনি, কোনও পুস্তকপ্রেমী বন্ধু সেটি নিয়ে কেটে পড়েছে, তাই নামটা বলতে পারছি না। প্রকাশক The Home Library Club (The Statesman এবং The Times of India Associated সংযুক্তভাবে সে-আমলে অনবদ্য সব বই প্রকাশ করতেন 'দ্য হোম লাইব্রেরী ক্লাব' নামে) তাতে মানবসভ্যতার একশতজন শ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবনী ছিল। নতুন বই পড়তে গিয়ে আমি দেখি মাঝের কতকগুলি পৃষ্ঠা-সংখ্যা নাপাত্তা। বইয়ের নাম যদিচ 'শত মহামানব', বাস্তবে আছেন নিরানব্বইজন। আমি তখন ছাত্র। প্রকাশককে চিঠি

দিয়েছিলাম। জবাবে প্রকাশক জানিয়েছিলেন শততম মহামানব ছিলেন 'হজরৎ মহম্মদ'। তাঁর চিত্রসমেত জীবনী প্রকাশিত হওয়ায় অনেক ইসলামী পণ্ডিত তীব্র আপত্তি জানান। বাধ্য হয়ে বাঁধাই-এর সময় ঐ ফর্মাটি পরিত্যক্ত হয়।

জাঁ পোচার সম্পাদিত মহাগ্রন্থে এ-জাতীয় আপত্তি না হওয়ায় আমরা বিশ্বশিল্পে ইসলামের অবদান সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি আজকাল।

এবার সর্বতীর্থসার ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি ফেরাই।

পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক আদিপর্বের কোনো হাতে-লেখা পুথি আবিষ্কৃত হয়নি। তাই জানি না হোমার, এউরিপিদেস্-এর সমতুল্য সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন কিনা বাল্মীকি, বেদব্যাস, তাঁদের জীবিতকালে। এমনকি শ্রুতির যুগ থেকে পাঠের যুগে সংক্রামণের সময়েও রামায়ণ, মহাভারত বা জাতক পরিবেশনে কলমের সঙ্গে তুলিও উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করেছিল কী না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সুনীতিবাবুর ব্যাকরণের মতো ব্রহ্মচারী ছিল সন্দেহ নেই—উপেক্ষিতা ছবির দিকে চোখ তুলে তাকায়নি; কিন্তু বাৎস্যায়নের কামসূত্র? আধুনিক প্রকাশকদের মতো ব্যবসায়িক বুদ্ধির তাড়নায় নয়, বিষয়বস্তুটা পাঠককে সহজে বুঝিয়ে দেবার প্রেরণায় কি তা সচিত্র আকারে লিখিত হয়নি? কিংবা '*মেঘদূতম্*?' গুপ্ত-সংস্কৃতিতে চিত্রশিল্প তখন তো মধ্যগগনে। গুপ্তসম্রাটের অর্থানুকূল্যে অজন্তায় যখন অপরূপ চিত্র আঁকা হচ্ছে ঠিক তখনই যে এই চিত্রকল্প কাব্যটির জন্ম! প্রাচীনকালের কোন চিত্রিত গ্রন্থ, এমনকি চিত্রও আমরা পাইনি। কিন্তু ছবি যে আঁকা হত তার প্রমাণ আছে। '*বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ*-এর তেতাল্লিশ নম্বর পরিচ্ছেদে চিত্রকলার বিষয়ে আলোচনা আছে। পুরাণকার বলছেন, মন্দিরগাত্রে এবং রাজপ্রাসাদের প্রাচীরে নবরস বিভিন্ন রঙে বিকশিত হয়ে উঠত। সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণনার মাধ্যমে তার অস্তিত্ব স্বীকৃত। শ্রীহর্ষের *উত্তরনিষাধচরিতে* মহারাজ নল-এর রাজপ্রসাদ বর্ণনা কালে কবি দুটি প্রাচীরচিত্রের কথা বলেছেন। অষ্টাদশ সর্গের বিংশতি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে একটি প্রাচীরচিত্রে পদ্মসম্ভবের সুরতদৃশ্য। অপর একটি প্রাচীরে দেবরাজ ইন্দ্র ও ঋষি গৌতমের পত্নী অহল্যার অবৈধ মিলনদৃশ্য। সূত্রকার বলেছেন, এ জাতীয় প্রাচীরচিত্রের মূল উদ্দেশ্য: কামোদ্দীপনার্থম্!

তাই যদি হয়, তাহলে বাৎসায়নের কামসূত্র কি সচিত্র হয়নি? বিশ্বাস হয় না!

তবে একটা আনন্দের কথা। সিন্ধু সভ্যতার লিপির যখন পাঠোদ্ধার করা যায়নি তখন বলতে পারি ব্যাপক অর্থে ভারতবর্ষের আদিমতম সাহিত্য—যা আজও বর্তমান, এবং যার পাঠোদ্ধার করা গেছে—সেটি সচিত্র।

আমি ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে অবস্থিত ধৌলি শিলালেখের কথা বলছি। কলিঙ্গযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এই 'সিনিয়ারমোস্ট' অশোক শিলালেখের পাশাপাশি উৎকীর্ণ করা আছে গৌতমবুদ্ধের প্রতীক এক হস্তিমূর্তির ভাস্কর্য।

প্রাচীনতম ভারতীয় পুথি—যা আমাদের হাতে এসেছে—তা একাদশ শতাব্দীর আগের নয়। পাল যুগে প্রণীত এগুলি। মহাযান ও বজ্রযান মতের বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ। বহু দেবদেবীর মূর্তি সেসব পুথিতে আঁকা—অবলোকিতেশ্বর, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, প্রজ্ঞাপারমিতা, হারিতী, জম্ভল, হেবজ্র। অষ্ট-সাহস্রিকা, পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রভৃতি পুথি কীভাবে সচিত্র করা হয়েছে তা জানতে পারবেন সরসীকুমার সরস্বতী মশায়ের গবেষণায়।[১১]

এসব চিত্রে অজন্তা শৈলীর প্রতিফলন স্পষ্ট। যদিও অজন্তা চিত্রে বজ্রযানের প্রভাব নেই।

অশোকের ধৌলী-শিলালেখের পাশে উৎকীর্ণ বুদ্ধপ্রতীক

ছবিগুলি টেম্পারা-পদ্ধতিতে, অর্থাৎ অনচ্ছ সাদা-রঙ মিশিয়ে আঁকা—সাদা, নীল, হলুদ, মেটে, লাল ও সবুজ রঙের ব্যবহারই বেশি এবং কালো অথবা মেটে রঙের বহিরঙ্গ রেখা।

> এই চিত্রগুলিতে কোন আলোকসম্পাত না করে সর্বাংশে সমান রঙের উপর সূক্ষ্মরেখার সাহায্যে যে সরল ও অনাড়ম্বর সৌন্দর্যসৃষ্টি পাল শিল্পীরা করে গেছেন তা সত্যই অনবদ্য।...ভারতে শিল্পবস্তুর অভাব নেই, কিন্তু শিল্পীর নাম কোথাও জানা যায় না। পালযুগের ইতিহাস একটি ব্যতিক্রম। ...ররেন্দ্রভূমের শিল্পীগোষ্ঠি-চূড়ামণি রাণক-শূলপানি, সমতট নিবাসী শুভদাসের পুত্র মঙ্গলদাস, সূত্রধর বিষ্ণুভদ্র, শিল্পী মহীধর, শশীদেব, কর্ণভদ্র ও তথাগতসার প্রভৃতি শিল্পীর নাম পাওয়া যায়।[১২]

প্রাক-মুসলমান যুগের আরও একটি শৈলীর নাম উল্লেখযোগ্য: গুজরাটি পট। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গুজরাটের রাজ-অমাত্য কুমারপালের অর্থানুকূল্যে বহু জৈন ধর্মগ্রন্থের সচিত্র পুথি রচিত হয়; যার ভিতর 'কল্পসূত্র' প্রধান। পরবর্তীকালে নানান 'সেকুলার' বিষয় নিয়েও সচিত্র পুথি রচিত হয়েছে—'চৌরপঞ্চাশিকা', 'লৌরচন্দা' প্রভৃতি। এগুলিও টেম্পারা-পদ্ধতিতে চিত্রিত।

> এই পটগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশকে কৌণিকভাবে আঁকা। এজন্য নাক, মুখ, চিবুক ও চোখ অতি ছুঁচালো। সামনের চোখটি বিশাল, প্রায় কান অবধি বিস্তৃত...চোখটি যেন মুখের 'ড্রইং' থেকে বেরিয়ে এসেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় মানুষটি যেন চশমা পরে বসে আছে।[১৩]

শিল্পী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর ঐ উদ্ধৃতি শুনে সন্দেহ হয়—গুজরাটের পটেই কি কালীঘাটের পট তথা যামিনী রায়ের ছবিতে দেখা চোখের গঙ্গোত্রী?

1296 খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্‌দীন খিল্‌জির গুজরাট ধ্বংসের পরে এই অবিমিশ্র শৈলীতে পারসিক প্রভাব পড়তে শুরু করে: কিন্তু শিল্পীরা আকবরী-জমানা-তক্ ঐ রীতিতে পুথি রচনা

করে গেছেন। বাজবাহাদুর ও রূপমতীর অনবদ্য প্রেমকাহিনীও রচিত হয়েছিল সচিত্র পুথিতে—তালপাতায় নয়, এতদিনে কাগজে!

এরপর ভারতীয় শিল্পে এল মুঘল স্কুল বা ইন্দো-পারসিক শৈলী। বাবর বাদ্‌শার চুঘতাই তুর্কি ভাষায় রচিত অনবদ্য আত্মজীবনীটি ছিল সচিত্র। অন্তত তাঁর নাতি আকবর বাদশার অমাত্য, বৈরাম-তনয় আবদুর রহিম খান্-ই-খানান ঐ আত্মজীবনীর যে ফারসি অনুবাদটি করেছিলেন সেই পুথিটি। ভারতবর্ষের পশু-পাখি, নদ-নদী, প্রাকৃতিক দৃশ্য এমনকি পোকা-প্রজাপতিও নিপুণ তুলিতে আঁকা। বাবরের আত্মজীবনীর একটি পৃষ্ঠা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে-রাখা মূল পাণ্ডুলিপির অনুকরণে এখানে এঁকে দিলাম। আখরগুলি আপনাদের মতো আমিও চিনি না। দু-একটা অক্ষর যদি বাস্তবে মক্ষিকার মৃতদেহ হয় তবে আপনারা ক্ষমা-ঘেন্না করে মেনে নেবেন।

বাবরের আত্মজীবনীর একটি অলংকৃত পৃষ্ঠা

হুমায়ুন দ্বিতীয়বার ভারত প্রবেশের পরে অন্তত তিনজন প্রতিভাধর পারসিক চিত্রশিল্পীকে হিন্দুস্থানে নিয়ে আসেন—মীর মুসাবীর, তাঁর পুত্র মীর সৈয়দ আলী এবং আবদুস সামাদ। হুমায়ুনের দেহান্তের পর আকবর মীর সৈয়দ আলীকে দিয়ে বহু ছবি আঁকিয়ে দ্বাদশখণ্ডে 'হামজানামা' মহাগ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া—চেঙ্গিসনামা, জায়ফরনামা, আকবরনামা, মহাভারত ও নল-দময়ন্তীর সচিত্র পুথিও রচিত হয়। বহু হিন্দু শিল্পী এসব পুথি সচিত্র করেন। মীর সৈয়দ আলী এবং আবদুস সামাদ ছাড়া যেসব মুসলমান শিল্পী আকবরি-জমানায় বিখ্যাত হন তাঁরা হচ্ছেন—ফার্‌রুক বেগ, খস্‌রৌ কুলি, জামসেদ প্রভৃতি। পাশাপাশি হিন্দু চিত্রশিল্পীরা হচ্ছেন—বসওয়াল, লাল, কেশু, মুকুন্দ, হরিবংশী, দাসবন্ত। এঁদের মধ্যে দাসবন্ত্ ছিলেন পাল্কিবাহক—নিতান্ত মেহনতি মানুষ। অবসর সময়ে তাকে ছবি আঁকতে দেখে আকবর ঐ

পাল্কিবাহকের কৈফিয়ৎ তলব করেন। দাস্‌বস্ত যখন নিজের ঘাড়ের উপর মুণ্ডুটার অবস্থান সম্বন্ধে সন্দিহান তখন বাদশা হুকুম দিলেন বরখাস্তের। খুশি হয়ে দাসবস্ত্ যখন পালাবার পথ খুঁজছে তখন আকবর বলেন, "পালাচ্ছ কোথায়? কাল থেকে তুমি মীর সৈয়দ আলীর কাছে ছবি আঁকা শিখবে! এই তোমার শাস্তি!"

সেই পাল্কিবাহক শিল্পী দাসবস্ত্কে আজও আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। তাঁর ছবি দেখতে পাবেন ফতেপুর সিক্রিতে।

আকবরের নির্দেশে ফারসিতে রচিত 'মহাভারত'-এর একখানি ছবি এখানে অনুলিপি করে দিলাম। শরশয্যার শায়িত পিতামহ ভীষ্মকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি মুঘল সৈন্যের এক

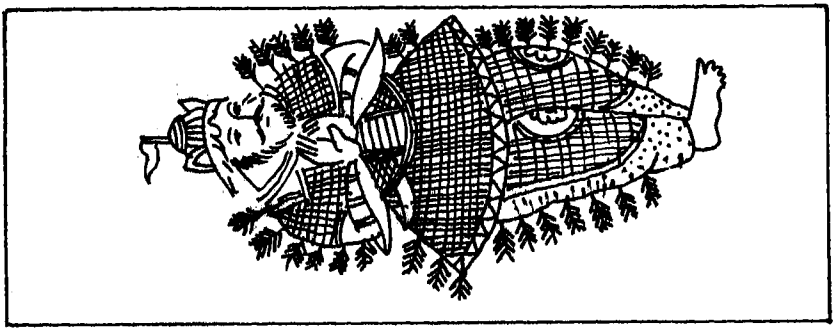

আকবরী-মহাভারতে শরশয্যার শায়িত ভীষ্ম যেন
মুগলবাহিনীর এক বিশহাজারী মনসবদার

বিশহাজারী মনসবদার। আর লক্ষণীয়, ভীষ্মের ছবিটি যেন 'ছবি' নয়, 'প্ল্যান'—গরুড়াবলোকনে উপর থেকে আঁকা। এই সুযোগে বলে নিই—পারস্পেক্‌টিভ বা পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে যে জ্ঞান অজন্তা-শিল্পীরা ধ্যানের দৃষ্টিতে লাভ করেছিলেন তা ভারতীয় শিল্পীকে নতুন করে শিখতে হয়েছিল জাহাঙ্গীরি-জমানায়—স্যার টমাস রো যখন সম্রাটকে খান-কয়েক য়ুরোপীয় চিত্র উপহার দেন। স্মর্তব্য—পশ্চিমখণ্ডে পরিপ্রেক্ষিতের মূল সূত্রগুলি যিনি প্রথম আবিষ্কার করেন সেই ফিলিপ্পোর (Fillippo Brunelleschi) মৃত্যু হয়েছে আকবরের জন্মের বিরানব্বই বছর আগে এবং সেই সূত্রগুলি যিনি নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করেন সেই লেঅনার্দো দ্য-ভিঞ্চির মহাপ্রয়াণ হয়েছে আকবরের জন্মের তেইশ বছর পূর্বে।

মুঘলযুগের ছাপ নিয়ে শুরু হলেও বিভিন্ন আঞ্চলিক শৈলীতে জন্ম নিল আরও অনেক-অনেক শিল্পরীতি—রাজস্থানী পট, পাহাড়ি কলম, জয়পুরী কলম, কাংড়া ও চম্পা কলম। 'কলম' অর্থে আঞ্চলিক শিল্পরীতি। শিল্পীরা পট এঁকেছেন, সালঙ্কৃত পুথিও।

এবার বরং বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমস্যাটাকে যাচাই করা যাক—অর্থাৎ কনভার্স থিওরেমটা। মানে, পরিবেশিত মূল আহার্য বস্তুটা যেখানে চিত্র; আর ভাষা তার চাট্‌নি, সাইড-ডিশ্। তার প্রধানতম উদাহরণ—কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা সুনীতিকুমারের ব্যাকরণ যদি চিত্রের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে খাড়া থাকতে পারে তবে ধ্রুপদী কার্টুনও তা পারে ভাষার ঠেকো ছাড়া। অন্তত মানবসভ্যতার আদিমতম ব্যঙ্গচিত্র—আমি যতটুকু জেনেছি—তাতে তো তাই দেখছি।

মিশরীয় 'বুক অব্ ডেড'-এ একটি অনবদ্য স্ক্রোল্ আছে—জনৈক মিশর-সম্রাটের শেষ

যাত্রা। শত শত দাস ও অমাত্যবর্গ সম্রাটের মৃতদেহ পিরামিডে নিয়ে যাচ্ছেন, তারই বর্ণাঢ্য শোকযাত্রা। ঐ সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছিল প্রায় সমসাময়িক আর একটি স্ক্রোল্ [সময়কালটা সঠিকভাবে জানাতে পারছি না, তবে খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বটেই। এটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সুরক্ষিত: (Exhibit No. 10016, plate 253][১৪]। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি উটের মৃত্যুর শোকযাত্রা। ঘোড়া, গরু, ছাগল, গাধার দল দ্বিপদীভঙ্গিতে অশ্রুপাত করতে করতে শোক-যাত্রার অনুগামী হয়েছে। শিল্পী কোনো 'ক্যাপশান' ব্যবহার করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। রাজকীয় শোকের মেকি বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে শিল্পীর তীব্র শ্লেষ বিনা ক্যাপশানেই সোচ্চার! লক্ষণীয়, মিশরীয়দের রসবোধও ছিল। না হলে, ঐ কার্টুনটি—যা নাকি তাদের সামাজিক বিধানের বিরুদ্ধে নির্মম কষাঘাত—সেটিকে সযত্নে সঞ্চয় করত না।

পোপের স্বেচ্ছাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার (1483-1546) যখন য়ুরোপে প্রতিবাদের ঝড় তুলছেন তখন তিনি বুঝেছিলেন—লেখার চেয়ে রেখার ক্ষমতা বেশি। 'প্লিউম' যদি 'পনিয়ার্ড'-এর চেয়ে শক্তিশালী হয়, তবে 'পেইন্টার্স ব্রাশ' 'পেন'-এর চেয়েও বেশি শক্তিধর।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের একটি পত্রিকা আছে নিশ্চয় জানেন: The Journalist. চুরাশি সালে সেই পত্রিকার 'পেন'-এর কারবারীরা দেখছি 'পেইন্টার্স ব্রাশ'-এর কাছে একটি প্রবন্ধ যাচ্ঞা করেছিলেন। প্রখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পী শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী ঐ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন: *"লুথার, চৈতন্যদেব ও কার্টুনের পাঁচশ বছর"*। তাতে রেখার যাদুকর লেখার মাধ্যমে জানাচ্ছেন:

> লুথার তাঁর প্রচার অভিযানে মুদ্রাযন্ত্রকে কাজে লাগালেন। সাধারণ ছবি আক্রমণাত্মক অভিযানে সাহায্য করবে না। কার্টুনকে তিনি কাজে লাগালেন। লুথারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কার্টুনেরও আজ পাঁচশ বছর পূর্ণ হল। জার্মানিতেই আক্রমণাত্মক কার্টুন প্রচলিত হল মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে। সেকালের বিখ্যাত শিল্পী লুকাস ক্র্যানাক্ (Lucas Cranach, 1472-1553) তৈলচিত্রের সঙ্গে সঙ্গে কার্টুন আঁকায় হাত দিলেন। লুথারের অনুচর ফিলিপ্ মেলাক্‌ঠন 1521 সালে 'দি প্যাশনেল অব ক্রাইস্ট অ্যান্ড অ্যান্টিক্রাইস্ট" নামে বই লিখলেন। তার পাতায় পাতায় ছবি[১৫]।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ঐ আদিমতম মিশরীয় কার্টুনটি আমি স্বচক্ষে দেখিনি; শুধু তার বাঁশি শুনেছি। লণ্ডন-প্রবাসী কোনো বন্ধুর মাধ্যমে যদি তার একটি ফটো-কপি সংগ্রহ করতে পারি তাহলে শ্রীচণ্ডী লাহিড়ীর সঙ্গে আমি ধূম তর্ক বাধিয়ে দেব: আধুনিক ব্যঙ্গচিত্রের পাঁচশ নয়, দ্বিসহস্র বর্ষ আজ পূর্ণ হচ্ছে!

মানসিকতার দিক থেকে মিশরীয় কার্টুনিস্ট 'আধুনিক' বৈকি।

ঐ একই পত্রিকার একই সংখ্যায় প্রাবন্ধিক কমল সরকার একটি প্রবন্ধ লেখেন: *স্বাধীনতা আন্দোলনে কার্টুন*। তিনি লিখেছেন,

> উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে আধুনিক ব্যঙ্গ-চিত্রকলার আমদানি। ভারতের রাজনৈতিক তথা জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় নানা কার্টুন প্রকাশ করেছিল বোম্বাই-এর হিন্দি পাঞ্চ[১৬]।

শ্রীসরকার সেই দুর্লভ চিত্র কিছু উদ্ধার করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। মুশকিল হচ্ছে ঐ জাতের কার্টুনের সম্যক রস উপলব্ধি করা যায় সমকালে দাঁড়িয়ে অথবা সেই কালের পটভূমি

সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হতে পারলে।

প্রসঙ্গত আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলি। রবীন্দ্রসদনের বহিরঙ্গের অলঙ্করণে পশ্চিমবঙ্গের নির্মাণ পর্ষদ যে নক্‌শা ছকেছিল সে-বিষয়ে সে-কালীন কিছু শিল্প পণ্ডিতদের মতামত গ্রহণের দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। ঐ সুযোগে উদয়শঙ্কর এবং ও· সি· গাঙ্গুলীর সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য ঘটে। যে গল্পটি বলছি তা ঐ শিল্পাচার্য অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে শোনা। তখন তিনি অশীতিপর, থাকতেন এলগিন রোড আর চৌরঙ্গী রোডের মোড়ের কাছাকাছি। সেই সাক্ষাৎসময়ে শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মাণ পর্ষদের মুখ্যবাস্তুকারও উপস্থিত ছিলেন। খোশগল্পে মেতে গাঙ্গুলীমশাই পুরাতন দিনের স্মৃতিচারণ করেছিলেন। যতদূর স্মরণে আছে, তাঁর জবানীতেই বলি:

সেটা বোধহয় উনিশ শ উনিশ অথবা কুড়ি। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিএন্টাল আর্টের বার্ষিক প্রদর্শনী। সেবার গগনেন্দ্রনাথ খানকয় কার্টুন দিয়েছিলেন। কার্টুন আঁকায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একটা ছবি ছিল বিবাহ-বিশারদ কুলীন বামুনদের আক্রমণ করে, একটা ছিল ইঙ্গবঙ্গ-বাবুদের ব্যঙ্গ করে, আর একখানার ক্যাপশান ছিল "*পীস ডিক্লেয়ার্ড ইন দ্য পঞ্জাব।*" জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের উপর। নর-কঙ্কাল আর নরমুণ্ডে আকীর্ণ জালিয়ানওয়ালাবাগের ময়দান। দু-একটা বুড়ো শকুন বোধকরি অতিভোজনে পীড়িত হয়ে ঝিমাচ্ছে।' আর মড়ার খুলিগুলিকে ইজিচেয়ারের ভঙ্গিমায় সাজিয়ে সুখশয্যায় ইংরাজশাসক ও'ডায়ার। তা সেবার বড়দিনে কলকাতায় এসেছিলেন ভাইসরয় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড। বড়লাটকে প্রদর্শনীতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হল। কেউ কেউ বললেন, পঞ্জাবের উপর আঁকা ঐ কার্টুনখানা বড়লাটের প্রদর্শন সময়ে সরিয়ে রাখাই ভাল। কিন্তু গগনদা-অবনদা তা মানবেন কেন? অগত্যা ছবিখানা থাকল যথাস্থানে।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড এলেন। প্রদর্শনীর সকলে তাঁর পিছু পিছু চলেছেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ, অতুল বসু, স্যার আর· এন· আছেন। আমিও ছিলাম দলের সঙ্গে। স্টেলা ক্র্যামরিশ প্রতিটি চিত্রের বিষয়ে দুচার কথা পরিচিতি হিসাবে বলতে বলতে চলেছেন। বড়লাট কখনো উৎসাহব্যঞ্জক দু-চার কথা বলছেন। ব্যঙ্গচিত্রটির সামনে এসে হঠাৎ স্টেলা নীরব হয়ে পড়লেন, বড়লাট হয়তো খেয়াল করতেন না, কিন্তু ঐ হঠাৎ নীরবতাই তাঁর দৃষ্টিটা আকৃষ্ট করল চিত্রপটের দিকে। যেন হোঁচট খেলেন বড়লাট বাহাদুর। ঘুরে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন স্টেলা ক্র্যামরিশের দিকে। সে দৃষ্টির বক্তব্য বোধকরি: 'হাউ ডেয়ার য়ু...'

স্টেলা মিষ্টি হেসে বললেন, "আই শুডন্ট, অফ কোর্স, ট্রাই টু অ্যানালাইজ এ কার্টুন অ্যান্ড মার ইটস্‌ ... ওয়েল, য়োর এক্সেলেন্সি নোজ হোয়াট আই মীন....

লাটবাহাদুর ঝুঁকে পড়ে দেখলেন চিত্রকরের স্বাক্ষরটি। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন নির্ভীক চিত্রকর দাঁড়িয়ে আছেন ওঁর পাঁজর ঘেঁসে। মাথায় কাজ-করা গেরুয়ারঙের টুপি। পরিধানে খদ্দরের জোব্বা। উপযুক্ত খুড়োর উপযুক্ত ভাইপো। খুড়ো যদি জালিয়ানওয়ালাবাগের খাতিরে অতবড় 'নাইটহুড' ছাড়তে পারেন তাহলে ভাইপো কি পারেন না একখান্ ছোট্ট-মতন কার্টুন ছাড়তে?

বিশ-ত্রিশ বছর আগে শোনা ঘটনাটি আমি স্মৃতিনির্ভর 'ডাইরেক্ট ন্যারেশানে' রচনা করেছি।

বস্তুত ও· সি· গাঙ্গুলি-মশায়ের কাছে শোনা এ কাহিনীটি আমি ইতিপূর্বেই পাঠকদের দরবারে পেশ করেছি: *আবার যদি ইচ্ছা কর* উপন্যাসে। তবে পাঠক সেখানে সেটাকে ঔপন্যাসিক সত্য হিসাবেই মেনে নিয়েছিলেন। এবার তথ্য-উৎস দাখিল করেছি। ঘটনাটা যে ঘটেছিল, অর্থাৎ সেই 1919-20 সালে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তা আমরা জেনেছি প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দিতে। প্রশ্ন হচ্ছে, স্টেলা ক্র্যামরিশ-এর বক্তব্যটা যে অসমাপ্ত রইল—হোক তা ও· সি· গাঙ্গুলী অথবা অধম লেখকের কল্পনায়—সেটা কী? '—মার ইটস্ হিউমার' অথবা 'মার ইটস্ সার্কাজম?' সম্ভবত দ্বিতীয়টা, আর সেজন্যই বাক্যটি অসমাপ্ত—শেষ হয়েছে ডট্-ডট্-ডট-এ!

শ্রীনিবেদিতা দত্ত রবিবাসরীয় *আনন্দবাজারে* (4 আগস্ট 1985) একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন *কার্টুনের সেকাল-একাল*। তাঁর মতে আদিমতম কার্টুন:

> খ্রীষ্টপূর্ব একহাজার সালে প্যাপিরাসে আঁকা একটি ক্যারিকেচার সংগৃহীত হয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। ভক্ষ্য হরিণ আর ভক্ষক সিংহ দাবা খেলছে। কে জানে এটাই হয়তো আদি শিল্পীর আঁকা পৃথিবীর প্রথম কার্টুন।

এটি আমি দেখিনি তো বটেই এর উল্লেখও অন্যত্র পাইনি। সে যা হোক লেখিকার মতে 1843 সালে প্রাচ্য-পত্রিকার 105 নং সংখ্যায় জন লীচের আঁকা হাস্যরসাত্মক স্কেচটি আধুনিক অর্থে প্রথম কার্টুন।

দুভাগ্যবশত এটিও দেখিনি।

কিন্তু ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে রসরচনাকে সার্থক করার চেষ্টা এই বাংলাসাহিত্যেই আমরা দীর্ঘ দিন ধরে দেখে আসছি। চঞ্চল সরকারের ছবি ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথকে ভাবা যেত না। যতীন সেন বা 'নারদ'হীন 'পরশুরাম'কে, শৈল চক্রবর্তীকে বাদ দিয়ে শিব্রামকে, কালিকিঙ্করহীন পরিমল গোস্বামী এবং চণ্ডী লাহিড়ীর কাঁচা-মিঠে কার্টুনের রসে জারিত না হলে *দেশে সুনন্দর জার্নাল* জমত না।

আজকের দিনে কার্টুন মূলত সংবাদপত্র-নির্ভর। এক-এক হৌসে এক-এক ধুরন্ধর! *টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ায়* হরবখ্ত হাজির লাক্স্মান। পি· সি· এল-এর খুড়োর মতো লাক্স্মানের একটি পেটোয়া চরিত্র বারে বারে হাজিরা দেওয়ায় পাঠকের বিশেষ পরিচিত: ধুতি, গলবন্ধ, চৌখুপি কোট, গোল চশমা, বিরলকেশ বৃদ্ধটিকে প্রায়ই দেখা যায় ইউ *সেউ ইট* স্তম্ভে হতভম্ব! সুধীর দার আছেন *হিন্দুস্থান টাইমস্*-এ। পালার নাম: *দিস্ ইজ ইট*। অভিনেতা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, শার্ট, প্যান্ট, চশমা পরা। *দ্য ইকনমিক টাইমস্* এবং *ঈভনিং নিউজ*-এ মারিও মিরান্ডার মানসপুত্র ফিরে ফিরে আসেন। শার্ট-প্যান্ট-টাই, চোখ দুটি নাটা-নাটা।। *ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস*-এর কার্টুনিস্ট আবু এখন অনেকগুলি পত্র-পত্রিকায় ছবি আঁকেন—ফ্রি লান্সার। *স্টেটসম্যানে* আছেন বিজয়ন। *আনন্দবাজার*-এ কুট্টি এবং চণ্ডী লাহিড়ী।

কার্টুনিস্টদের আর একটি প্রবণতা প্রায়ই লক্ষ করা যায়, যাকে বলা যায়: 'সেলফ লেগ পুলিং'। কার্টুনিস্ট যেন বলতে চান হাস্যরসের পরিবেশনে লেগপুলিং বা ঠ্যাঙ-টানা হচ্ছে খেলার একটা আঙ্গিক। ফুটবলে যেমন সাইড-পুশ, ক্রিকেটে যেমন বাম্পার, কুস্তিতে যেমন আক্ষরিক অর্থে ঠ্যাঙ ধরে পটকে দেওয়া। তাই রেমব্রান্ট যেমন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে 'সেল্ফ্-পোট্রেট' এঁকেছেন অনেক খ্যাতনামা কার্টুনিস্ট ও'সেল্ফ্ কার্টুন' এঁকেছেন।আমরা এখানে এ যুগের তিন তিনজন ধুরন্ধর-কার্টুনিস্ট-এর স্ব-ব্যঙ্গচিত্র অনুলিপি করে দেবার চেষ্টা করলাম: লাক্স্মান, পি· কে· কুট্টি এবং অহিভূষণ মালিক।

কার্টুনিস্টরা হয়তো সর্বত্র লিখিতভাবে স্বীকার করেননি যে, এগুলি তাঁদের সেল্‌ফ কার্টুন, তবু আমাদের তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। যেমন ধরুন চণ্ডী লাহিড়ীর কার্টুনের বই *Chandi Looks Around*-এর টাইটেল পেজ বা মলাট।

প্রায় সওয়া-শ' পৃষ্ঠার কার্টুনে-ঠাশা বই। বধ হয়েছেন অনেকানেক 'যুগ-যুগ-জিও' রাজনৈতিক নেতা এবং তাঁদের প্রকল্প। টাইটেল-পেজএর উপরে বইয়ের নাম, নিচে প্রকাশকের নাম কিন্তু মাঝখানে—যেখানে লেখকের নাম থাকার কথা—সেখানে কারও নাম ছাপা হয়নি। তার পরিবর্তে একটি ব্যঙ্গচিত্র।

শিল্পী 'পেরিসকোপ' বানানোর হাঙ্গামায় যাননি। ছিন্নমস্তা সেজেছেন। যেসব রাজা-মশাইদের রাজবেশ খুলে নাগাবাবা বানানো হয়েছে এরপর আর তাঁরা গোঁসা করেন কোন আক্কেলে? যার 'হাতে-মাথা-কাটবেন', সে তো নিজের হাতে নিজের মাথা কেটে বসে আছে। মলাটেও দেখছি মনুমেন্টের মাথায় দুরবীন হাতে যে বৃদ্ধটি বসে আছেন তাঁর সঙ্গে

ছিদ্রান্বেষী ছিন্নমস্তা চণ্ডী!

টি·ভি· তে 'চিচিং-ফাঁক' আসরে যিনি ছবি আঁকা শেখান সেই লাহিড়ীমশায়ের অদ্ভুত সাদৃশ্য। এরপর আর কোন আক্কেলে চণ্ডী লাহিড়ী অস্বীকার করবেন—এটি তাঁর 'স্ব-লেগপুলিং' নয়?

কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রে মডেল-এর শারীরিক বৈশিষ্ট্যকে অতিরঞ্জন করা হয়। নেহেরুজীর খদ্দরের টুপি, লোবন্ধ কালো কোট, বুক পকেটে গোলাপ; চার্চিলের চুরুট, স্ট্যালিনের পাইপ, ইন্দিরা গান্ধীর সিঁথির একপাশে সাদা চুল, মহাত্মাজীর মিকি-মাউস-কান ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অতিকথনে বিদ্যাসাগর মশায়ের 'কানাকে কানা বলিওনা' নীতিকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে না। যেহেতু এটা খেলার আইন। দৈহিক বিকৃতিকে 'আণ্ডারলাইন' করাটা তাই অসৌজন্যমূলক নয়। যে-খেলার যে-আইন। শুধু তাই নয়—কার্টুনজগতে কিছুটা আবার ইচ্ছাকৃত বিকৃতি করা হয়। যেমন ধরুন চণ্ডী লাহিড়ীর কার্টুনে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকবার প্রতিটি হাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠবাদে তিনটি বড় আঙুল। এটা 'হিউম্যান-অ্যানাটমি' মেনেই আঁকা! তবে নির্দেশটা *'গ্রেজ অ্যানাটমি'*তে পাবেন না। এ সূত্রের প্রবর্তক ওয়াল্ট ডিজনে—আধুনিক যুগে কার্টুন-জগতে যাঁর অসামান্য প্রভাব। মিকি মাউসের হাতে তিনি বারবার চারটে করে আঙুল এঁকেছেন।

শ্রীমতী নিবেদিতা দত্ত তাঁর প্রবন্ধে সংক্ষেপে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তার উদ্ধৃতি দিই,

> কার্টুন পত্রিকার ক্ষেত্রেও কলকাতা পথিকৃৎ। 1874 সালে শুধুমাত্র কার্টুনের জন্যই এই শহর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *হরবোলা* ভাঁড় আর *বসন্তক* নামে দুটি পত্রিকা। এরপর আবির্ভাব *মধ্যস্থ* ও *বিদূষক*-এর। *ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মাসিক বসুমতী, বিচিত্রা,* ইত্যাদি সেকালের বিখ্যাত পত্রিকাতেও কার্টুন প্রকাশিত হত। শঙ্কর পিল্লাই-এর *শঙ্করস্ উইকলি* এর পরের ঘটনা। প্রথম প্রদর্শনী মারফৎ ব্যঙ্গচিত্রকে সম্মান জানিয়েছে এই কলকাতাই। ১৯৬৬ এবং ৬৮ সালে দু'বার আকাদেমি অব ফাইন আর্টস্-এ ব্যঙ্গচিত্রের উপর প্রদর্শনী হয়। যা আগে ভারতের কোথাও হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কার্টুনের প্রথম প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮৪৩ সালে লণ্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার হল-এ।
>
> ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন বনফুল। কুমারেশ ঘোষ সম্পাদিত *যষ্টিমধুর* পাতায় তিনি একসময় ছবিসহ *সাচ্চা বাৎ* পরিবেশন করতেন।

অবশ্য চিত্র-সমালোচক সন্দীপ সরকারের মতে বনফুলের সে প্রচেষ্টায় "ফল ভাল হয়নি"—রেখার না লেখার, সন্দীপ সঠিক জানাননি—কিন্তু সে প্রসঙ্গে পরে আসব। তার পূর্বে এই ধারাবাহিকতার পর্যায়টা শেষ করা যাক:

বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকায় কার্টুন অথবা রসরচনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যঙ্গচিত্র এঁকে রেখা-লেখার মিলনকে সার্থক করেছেন আরও অনেকে: রেবতীভূষণ, ওমিও, সুকুমার

রায়চৌধুরী, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষ সিংহ, সতীশ সিংহ প্রভৃতি।

দা-ঠাকুরের *বিদূষক* পত্রিকার উত্তরসূরী হচ্ছে অধ্যাপক দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল সম্পাদিত *অচলপত্র*। শ্রীমতী নিবেদিতা দত্তের মতে

> শুধুমাত্র বাংলা কেন ভারতীয় কার্টুনের আলোচনাও দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল সম্পাদিত এই পত্রিকাটির আলোচনা ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পুরাণো ফাইলে চোখ বোলালে এখনও জীবন্ত হয়ে ওঠে সমসাময়িক সমাজের একটি জীবন্ত ছবি। চল্লিশের দশকের শেষ ভাগ থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে রঙ্গ-ব্যঙ্গের এই পত্রিকা। প্রথম থেকেই কার্টুন এই পত্রিকার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এইসব কার্টুনের শিল্পী ছিলেন সুশীল চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়গোপাল ভট্টাচার্য, রবীন ভট্টাচার্য, অমিয় চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী ইত্যাদিরা।

আমরা জানি, 'কার্টুন' এক বিশেষ জাতের চিত্র, প্রায়শই যার মূল উপজীব্য : হাস্যরস। কিন্তু হাসিরও তো রকমফের হয়। কী লেখায়, কী রেখায়! কখনো তা বিমল দিলখোলা হাসির উপাদান; কাউকে খোঁচা না দিয়ে। কখনো তা তীব্র শ্লেষ—সমাজের ক্ষমতাবানদের স্বরূপ উৎঘাটনের প্রচেষ্টা হাস্যরসের মোড়কে।

বৈকুণ্ঠের খাতা আর *মুক্তির উপায়* কি একই জাতের কৌতুক নাটিকা?

হাস্যরসের হদ্দমুদ্দ তো *আবোল তাবোল*-এ। সবই উদ্ভট-রসের কবিতা—মূল উদ্দেশ্য হাসানো। কিন্তু মাঝে মাঝে হাসতে গিয়ে কি বিষম খেতে হয় না? চোখে হঠাৎ জল ভরে আসে নাকি? যাকে চার্লি বলেছেন '...and perhaps a tear !'

ধরা যাক *কিম্ভূত, ট্যাশ্‌গরু, খিচুড়ি*। এখানে 'অদ্ভুত'রস-এর ভেয়ানে হাস্যরস সঞ্জীবিত। যা হয় না, তাই হচ্ছে। অদ্ভুতরস চিত্রকল্প, ফলে রেখা-লেখার যুগ্ম-যাদুকর এখানে সব্যসাচী। ট্যাশ্‌গরুর কবিতা অথবা ছবি কে যে কাকে টেক্কা মেরেছে বলা কঠিন। রেখা আর লেখা পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে অদ্ভুতরসটি নয়নগ্রাহ্য নয়; সেখানে জোর করে 'ইলাসট্রেশান' ঢুকিয়ে দিলেও তা কবিতার হাত ধরাধরি করতে পারবে না। যেমন ধরা যাক *শব্দকল্পদ্রুম*:

> "ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম দ্রাম, শুনে লাগে খট্‌কা—
> ফুল ফোটে? তাই বল। আমি ভাবি পট্‌কা!
> শাঁই শাঁই পন্ পন্ ভয়ে কান বন্ধ—
> ওই বুঝি ছুটে যায় সে-ফুলের গন্ধ?"

এখানে লেখায় হাস্যরস ধ্বনিনির্ভর এবং ভাষার মারপ্যাঁচে। 'রেখা' বোঝে এটা 'স্ট্যাগপার্টি'—সে চুপিসারে সরে দাঁড়ায়। একই অবস্থা অ্যাঁকাচোরা শহরে বদ্যিদের আলুভাতে খাওয়ার আপত্তির প্রসঙ্গে অথবা সীতানাথ বন্দ্যোর গাগনিক গন্ধবিচার। কিন্তু যেখানে কাব্যরস চিত্রকল্প সেখানেই সুকুমার কলম নিয়ে খুশি থাকতে পারেননি, তুলি তুলেছেন। যেমন, *বুড়ীর বাড়ি, বোম্বাগড়ের রাজা, বিদ্‌ঘুটে*।

কিন্তু হাসতে গিয়ে বিষম খাই কখন? বলি শুনুন: ক্ষান্তবুড়ির তিন দিদিশাশুড়ীর কাণ্ডকারখানা দেখে কালনায় এসে আমরা প্রাণখোলা হাসি হেসেছি। কিন্তু হাসতে গিয়ে থম্‌কে গেছি যখন হুগলি গেলুম! তিনটে শুয়োর, কিন্তু তাদের মাথায় টুপি নেই! 'অদ্ভুত রস' কি

এটা? 'অদ্ভুতরস'-এর অভাবটাই কৌতুক বলে আজ আমরা হাসি। ভুলে যাই, কবিতাটি যখন লেখা হয় তখন গগনঠাকুর ঐ জালিয়ানওয়ালাবাগের উপর কার্টুন আঁকছেন। পরাধীনতার মর্মান্তিক আত্মগ্লানিতেই কি কবির মনে হয়নি, 'শুয়োর' আর 'টুপি' বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত?

রেখা-লেখা উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পী মাঝে মাঝে হাস্যরস পরিবেশনের অছিলায় সমাজকে সচেতন করে তুলতে চান। নির্মল হাস্যরসের রঙ্গ (fun) আর কৌতুক (comic) তখন রূপান্তরিত হয় বিদ্রূপ (satire), শ্লেষাত্মক অতিকথনে (carricature) অথবা তীব্র শ্লেষ-এ (sarcasm)। ত্রৈলোক্যনাথের *লে লুল্লু* আমাদের হাসায়, কিন্তু 'নেই-আঁকুড়ে দাদা'র উপাখ্যানে হাসতে গিয়ে থমকে যেতে হয়। অন্তত লেখকের সমকালে পাঠক থমকে গিয়ে ভাবত বিধবার পক্ষে 'আঙটপাতায় ভাত খাওয়ার' কথা একাদশীতে চিন্তা করাও এতবড় পাপ? 'বরখ্' খাওয়ার অপরাধে ক্ষেতুর জাত গেছে কিনা সমাজপতিদের সেই বিচারসভায় প্রত্যক্ষদর্শীর এজাহারটা মনে পড়ে? সেটা কি হাস্যরসের পরিবেশন?

আবোল তাবোল-এর কথা হচ্ছিল। ওর একটি বিশেষ কবিতার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি—তার রেখা ও লেখা দুটোই: *একুশে আইন*! আজ আমরা পড়ি আর হাসি। শিল্পদ্রব্যটিকে তার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিচার করি না।

একুশে আইন কবিতাটি প্রকাশিত হয় *সন্দেশে*—ভাদ্র ১৩২৯; অর্থাৎ 1922 সালের সেপ্টেম্বরে। সম্ভবত এটির রচনাকাল জুলাই-আগস্ট 1922। সত্যজিতের জন্মসময়!

স্মরণ করা যেতে পারে যে, অসহযোগ আন্দোলনের নেতা মহাত্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ঐ বছর দশই মার্চ। ঐ বছর গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু মহাত্মাজীর বিচারের সঙ্গে পন্তিয়াস পীলেতের বিচার সভায় তুলনা করে বলেন, এই জাতীয় 'বেআইনি' আইনের সাহায্যেই ইতিহাসের শাসকদল চিরকাল শাসন-শোষণ চালিয়ে এসেছে! ঐ জুলাই-আগস্ট মাসেই সংবাদপত্রে প্রতিদিন প্রকাশিত হত গান্ধীজীর সওয়াল—ইংরেজ বিচারক ব্রুমফিল্ড-এর এজলাসে। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়,

> In the trial, the Mahatma who described himself as a farmer and weaver, made a lengthy statement describing how 'from a staunch loyalist and co-operator I have become an uncompromising disaffectionist and non-co-operator.' And he ended his statement with these words: 'The only course open to you, the Judge and the Assessors, is either to resign your posts and thus dissociate yourselves from evil if you feel that *the law you are called upon to administer is an evil* and that in reality I am innocent or to inflict on me the severest penalty if *you believe that the system and the law you are assisting to administer are good for the people of this country* and that my activity is therefore injurious to the public weal.[১৭]

গবেষক যদি খোঁজ নেন তাহলে হয়তো আবিষ্কার করবেন, সুকুমার ঐ কবিতাটি রচনা করেন সেই বিশেষ দিনে যেদিন বিচারক ব্রুমফিল্ডের ঐতিহাসিক রায় সংবাদপত্রে ছাপা হয়: অপরাধীর ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ড!

আজ কি কবিতাটি পাঠের সময় আমাদের মনে পড়ে 'একুশ' সংখ্যাটির কী তাৎপর্য? এর সঙ্গে উনিশ শ একুশ সালের অসহযোগ আন্দোলন সম্পৃক্ত? সেটুকু প্রণিধান করলেই বোঝা যায়, কেন শিরোনামার চিত্রে কোথাও নমনীয়তা নেই, সবকিছুই খোঁচা-খোঁচা। কবির স্মরণে ছিল পদ্য লেখার অপরাধে তাঁর নিজেরও কারাবাস হতে পারে—"যেসব লোকে পদ্য লেখে, তাদের ধরে খাঁচায় রেখে"··· সেই সব 'জ্বালা' মহাকালের হস্তক্ষেপে মুছে গেছে। এখন *একুশে আইন* একটি নির্ভেজাল হাসির কবিতা!

লেখক এবং চিত্রশিল্পী 'হাস্যরস'-নামক বস্তুটিকে নানা ভাবে ব্যবহার করেছেন যুগে যুগে। মাঝে মাঝে 'মিছরির ছুরি' হিসাবেও। কখনো বা দেখা গেছে বহুল ব্যবহারে হাস্যরসের আধারটি সমাজে সুপরিচিত। লেখার ক্ষেত্রে নামে, যেমন 'কমলাকান্ত চাটুজ্জে'। তাঁর প্রতিকৃতি আমরা দেখিনি, জানি না তাঁর খানদানি বদনখানি কেমন ছিল। কিন্তু তাঁর স্বভাবচরিত্র, আনুষঙ্গিক আমাদের নখদর্পণে: তাঁর পোষা বিড়াল, তাঁর লাঠি, আফিঙের কৌটা আর প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধের 'কেঁড়ে'!

তেমনি রেখার রাজ্যেও কেউ কেউ পৌনঃপুনিকতার প্রভাবে সুবিখ্যাত। তাঁরা 'স্বনামধন্য নন,স্বচিত্রধন্য'। যেমন 'পিসিএল' বা 'কাফী খাঁ'র খুড়ো। তাঁর পিতৃদত্ত নামটি জানি না। কিন্তু পিছন থেকে দেখলেও তাঁকে চিনব। তাঁর আকৃতি আমাদের নখদর্পণে: ঝোলা গোঁফ, লাঠি, চুল আঁচড়ানোর স্টাইল, এবং তাঁর গিন্নির হাতের খন্তি!

লেখা মাঝে মাঝে যুগান্তকারী ঘটনা ঘটায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজনীতি, রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তনে সাফল্য আনে। যেমন নিউটন-আইনস্টাইন, রুসো-ভলতেয়ার, মার্কস-এংগেলস-এর কলম। এখানে রেখার ভূমিকা গৌণ। তবু পিথাগোরাস থেকে আইনস্টাইন রেখার সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছেন সময়-সময়। চার্লস ডারউইন তো রীতিমতো কৃতজ্ঞ। 'লেখা'র সাহায্য ছাড়া শুধু 'রেখা' একা তেমন কিছু সচরাচর করতে পারে না। সারা দুনিয়ায় 'দাস ক্যাপিটাল' মহাগ্রন্থের নাম যত লোক জানে, তার চেয়ে 'মোনালিসা'-মহাচিত্রের কথা কম লোক জানে না। কিন্তু প্রথমটি মানবসভ্যতায় যে প্রভাবে বিস্তার করেছে, দ্বিতীয়টি তা করতে পারেনি। অপরপক্ষে প্রথমটি অনুবাদেও আদ্যন্ত পড়েছে যত মর-মানুষ তার লক্ষগুণ চিত্রপ্রেমিক 'মোনালিসা' চিত্রটি দেখেছে, অন্তত অনুলিপিতে।

তেমনি বলা যায়, 'মানবসভ্যতার ইতিহাস' লিখতে বসলে স্পেনের গৃহযুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয় পৃষ্ঠা লেখা হবে তার চেয়ে অনেক বেশী পৃষ্ঠা দাবী করে বসবে পিকাসোর 'গুয়ের্নিকা'—'বিশ্বশিল্পের ইতিহাস' গ্রন্থে।

একটি সত্য ঘটনা শোনাই, যেখানে একটি কার্টুনিস্ট লেখার সাহায্য ব্যতিরেকে একটি মহাদেশের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেছিলেন। 'গ্যিনেস বুক অব রেকর্ডস্'-এ এ বিষয়টি আলোচিত হয়নি। আমাদের ধারণা যে ব্যঙ্গচিত্রটির কথা বলছি তা একটা বিশ্ব রেকর্ড ধরে আছে: দৈর্ঘ্যে সেটি দীর্ঘতম। তার আকার লম্বায় চল্লিশ সেন্টিমিটার, চওড়ায় চার সে·মি·।

কার্টুনটা ছাপা হয়েছিল মার্কিন মুলুকের সেন্ট লুই শহরের খানদানি সংবাদপত্র

পোস্ট-ডেসপ্যাচ-এ। তারিখটা, শুক্রবার বিশে মে, উনিশ শ সাতাশ।

বিশ্বযুদ্ধ অনেকদিন শেষ হয়েছে। ক্ষতচিহ্নগুলি মিলিয়ে গেছে। ত্রিশের দশকের মন্দার বাজার তখনো দেখা দেয়নি। সারা সভ্য দুনিয়ার হাতে তখন দেদার ডলার-স্টার্লিং-ডয়েশমার্ক-ইয়েন! দুনিয়াভর ধনবানের দল মেতে আছে প্রাচুর্য আর বিলাস-ব্যসনে: মদ, মেয়েমানুষ, রেস আর জুয়া। 'জ্যাজ' তখন আঁতুর ঘরে, 'বিকিনি প্যান্ট' বাজারে সবে উঁকি দিয়েছে, নির্জন সাগরবেলায় 'টপ-লেস সানবাথ' একটা দুঃসাহসিক খেলা! সভ্য পৃথিবী সারাদিন হাই তোলে, অপরাহ্ণে উগ্র প্রসাধন করে, সন্ধ্যায় জ্যাজ নাচে, রাত্রিকে 'সিডিউস' করে এবং পরদিনের সকালটা কোথা দিয়ে কেটে যায় টের পায় না 'হ্যাং-ওভারে'। সংবাদপত্রে নানান জাতের নতুন-নতুন বিশ্বরেকর্ডের খবর ছাপা হচ্ছে: কোন প্রেমিকযুগল দীর্ঘতম সময়কাল চুম্বন করেছে, কোন তরুণ স্কাইস্ক্রেপারের কার্নিশে দাঁড়িয়ে এক-চুমুকে ভড্‌কার ম্যাগনাম বোতল নিঃশেষ করেছে, কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণী শিল্পীর স্টুডিওতে ন্যুড মডেল হতে স্বীকৃত হয়েছে।

সেই রঙ্গমঞ্চে এসে আবির্ভূত হল পঁচিশ বছরের এক দুঃসাহসী যুবক: চার্লস অগস্টাস লিন্ডবার্গ। সত্যিকারের নায়ক—তরুণ, দুঃসাহসিক, সুদর্শন, যুগের হুজুগে যে-মানুষ কালিমালিপ্ত নয়। সে ঘোষণা করেছে একা একটা এরোপ্লেন নিয়ে অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেবে! আবার বলি—সময়টা 1927; যখন গ্রাউন্ড-কন্ট্রোল বলে কিছু ছিল না। রেডিও-টেলিফোনে প্লেন থেকে কথা বলা যেত না। চোখে দেখে বুঝে নিতে হত অল্টিচ্যুড, কম্পাস নজর করে সমঝে নিতে হত গতিমুখ।

ওর এই বেপরোয়া বীর্যে অধিকাংশ সংবাদপত্র ওকে তিরস্কার করেছে। নিউ-ইয়র্কের 'ডেইলী মিরার' পত্রিকার হেডলাইন নিউজ হচ্ছে:

THE FLYING FOOL WILL HOP TODAY

[উড়ন্ত বজরঙ্গবলী আজ 'জয়-রাম' বলে লাফ মারবেন!]

সাড়ে-তেত্রিশ ঘণ্টা একা প্লেন চালিয়ে লিণ্ডি পাড়ি দিয়েছিলেন অতলান্তিক। নিউইয়র্ক থেকে পারী। সে-কথা ইতিপূর্বেই বিস্তারিত লিখেছি *লিণ্ডবার্গ* বইতে। এখানে ঐ কার্টুনটির চালচিত্র হিসাবে শুধু কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করব। কারণ সাফল্য লাভ করার পূর্বে মাত্র চারজন সেই দুঃসাহসী বৈমানিকের উদ্দেশ্যে টুপি খুলেছিল। এক: ফ্রি-প্রেস্ এর একজন অজ্ঞাতনামা সাংবাদিক। দুই: একটি দশ বছরের মেয়ে, অ্যালিস। তিন: প্রাক্তন হেভিওয়েট চাম্পিয়ান বক্সার জো হামফ্রিজ। চার: *পোস্ট ডেস্‌প্যাচ* সংবাদপত্রের সেরা কার্টুনিস্ট ড্যানিয়েল· এফ· প্যাট্রিক।

একে একে বলি:

বিশে মে উনিশ শ সাতাশ তারিখটা ছিল শুক্রবার। পূর্বরাত্রে লিন্ডির মা ঈভেঞ্জেলিন—তাঁর ঐ একটিই পুত্র—সারারাত ঘুমাতে পারেননি। চোখ দুটি যতবার বুঁজেছেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছে আদিগন্তবিস্তৃত অতলান্তিক মহাসমুদ্র! তার-উপর এক ক্লান্ত বিহঙ্গ, যার বিশ্বাস, 'আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন'! একজন বৈমানিক, যে প্লেন চালাতে চালাতেই অঙ্ক কষছে, আহার করছে, প্লেনের ডানায় বরফ জমে গেলে হাত বাড়িয়ে সাফ করছে। নক্ষত্র আর কম্পাস যার

পথ-প্রদর্শক। যে নিজেই পাইলট, কো-পাইলট, ন্যাভিগেটর, কেবিন-বয়!

সকাল হতেই ঝন্‌ঝন্‌ করে বেজে উঠল টেলিফোন। দৌড়ে এসে যন্ত্রটা কাঁপা-কাঁপা হাতে তুলে ধরে বললেন, মিসেস্‌ লিন্ডবার্গ।

: সুপ্রভাত ম্যাডাম। ফ্রি-প্রেস থেকে বলছি। আপনার বাড়িতে রেডিও আছে? কারণ মার্কিন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রতি ঘণ্টায় একটি করে নিউজ-বুলেটিন প্রকাশ করা হবে। কোন খবর থাক না থাক।

: ও ধন্যবাদ! না আমার বাড়িতে রেডিও নেই। আমাকে প্রতি ঘণ্টায় টেলিফোন করতে হবে না। তবে কোন খবর পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ আমাকে টেলিফোন জানাবেন।

: নিশ্চয় জানাব ম্যাডাম্‌।

: আর একটা কথা! মানে, ইয়ে ··· খবর যদি ··· অর্থাৎ যে কোন রকম সংবাদই ··· কী ভাবে বলব?

: ইয়েস মাদার! বুঝেছি: নিশ্চিন্ত থাকুন। তাঁর সাফল্যলাভের সংবাদই জানাব আমি।

এবার আর 'ম্যাডাম' বলেনি। মাতৃ-সম্বোধন করেছে। লিন্ডি সাফল্যলাভ করার আগেই 'ম্যাডাম' ঈভেঞ্জেলিন ল্যান্ডলজ লিন্ডবার্গ হয়ে গেলেন: 'মাদার'!

তৈরী হয়ে স্কুলে রওনা দেবেন, এসে হাজির হল একদল সাংবাদিক। ঐ 'ফ্রি-প্রেস' থেকেই। ওরা নাছোড়বান্দা। এই মুহূর্তে 'মাদার'কে কিছু বলতে হবেই। লিন্ডির মা যা বলেছিলেন, তার অনুবাদ "আগামীকাল শনিবার আমার ছুটি। হয় সেই ছুটির দিনটি হবে আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের, অথবা বেদনার! ···আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত এই খবরই পাব যে, আমার ছেলে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েনি, এই দীর্ঘ পথটা পাড়ি দিয়ে পারীতে পৌঁচেছে।"

স্কুলে পৌঁছে টীচার্স-রুমে আর ঢুকলেন না। মানুষজনকে যেন এড়িয়ে চলছেন। সোজা নিজের ক্লাসে চলে গেলেন। দশ-বারো বছর বয়সের বাচ্চাদের ক্লাস। বোর্ডে একটি অঙ্ক লিখে দিয়ে চুপচাপ এসে বসলেন নিজের চেয়ারে। ছেলেমেয়েরা নীরবে আঁক কষছে। হঠাৎ নজর হল—থার্ড বেঞ্চিতে একটি মেয়ে—অ্যালিস, মাথা নিচু করে গল্পের বই পড়ছে। খাতা খোলেনি।

ঈভাঞ্জেলিন গর্জে ওঠেন, অ্যালিস! কী করছ তুমি? গেট আপ!

উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু মুখ তুলল না। ওকে হাতে-নাতে ধরতে এগিয়ে এলেন। কিন্তু না, ওর দু-হাঁটুর উপর কোন গল্পের বই তো খোলা নেই। চিবুকটা তুলে ধরতেই অবাক: অ্যালিসের দুই টম্যাটো-গালে জলের দুটি ধারা!

: একী! কাঁদছ কেন? কী হয়েছে?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অ্যালিস বললে, Please dissolve the class M'am! Let's all go to the prayer hall and pray for him [আজ ছুটি দিয়ে দিন। চলুন সবাই চার্চে যাই আর তাঁর মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা করি। সব্বাই।]

তৃতীয় জন: জো হাম্‌ফ্রে। প্রাক্তন হেভিওয়েট চাম্পিয়ান বক্সার। বহু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অন্তে

বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত যোদ্ধা। এখন সে রেফারি। দর্শকদের আনন্দ দিতে গিয়েই তার নাকটা আজ থ্যাবড়া, চোয়ালটা বাঁকা। ঐ বিশে মে, শুক্রবার, নিউইয়র্কের 'ইয়াঙ্কি স্টেডিয়ামে' হচ্ছে হেভিওয়েট বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপ-এর ফাইনাল লড়াই—জ্যাক সার্লে বনাম টম ম্যালোনী। রেফরি প্রাক্তন চাম্পিয়ান জো হামফ্রে। চল্লিশ হাজার দর্শকে ইন্ডোর স্টেডিয়াম গম্‌গম্‌ করছে। ব্ল্যাকেও টিকিট মেলা ভার। সংলগ্ন বার-এ হুইস্কি আব বীয়ারের বন্যা। ঘণ্টা বাজলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে দু-বগলে ধরে রিঙ-এর কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়ালো দৈত্যাকৃতি প্রায়-নিরক্ষর জো হামফ্রে। দুদলের সমর্থকদল একযোগে চিৎকার করে ওঠে : কিল হিম জ্যাক ! ফিনিশ হিম টম !

দানবাকৃতি জো হাম্‌ফ্রে দু-হাত আকাশপানে তুলে জনতাকে শান্ত হতে বললেন, চীৎকার করে ওঠেন, Ladees & Genteelmen !

শান্ত হল জনতা। প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ান যুদ্ধারম্ভ-ঘোষণার পূর্বে দর্শকদের কিছু বলতে চায়।

হ্যাঁ, তাই চায়। জনতাকে আনন্দ দিতে গিয়ে যার নাকটা ভাঙা, মুখে ফুটি-ফাটা আলপনা, সে কিছু বলতে চায়। 'এ পীস অব স্টেক'-এর লেখক জ্যাক লন্ডন ছাড়া যাকে আজ কেউ পাত্তা দেয় না, সেই অর্ধশিক্ষিত প্রাক্তন-যোদ্ধা চিৎকার করে বলল, "ভদ্দরমৈলা এবং বাবু-মশাইরা ! আপনারা এয়েচেন জ্যাক আর টমের রক্ত দেখতি ! তা দ্যাখবেন বৈকি ! ট্যাহা তো বড় কম খরচ করেননি। কিন্তু মানুষের রক্ত দ্যাখার আগে হুই উপর পানে টুক্ তাইকে দ্যাখবেন, বাবুমশায় আর মা-লক্ষ্মীরা ?"

হাজার হাজার ক্যাণ্ডেল-পাওয়ার আলো ছড়াচ্ছে যে ছাদ তা ভেদ করে ওর তর্জনী যেন নীরন্ধ্র অন্ধকারে ঢাকা নৈশাকাশের দিকে ইঙ্গিত করল : Think 'bout that boy up there tonight ! Boozed or sober, stand up on your legs for a minute ! Perhaps that mad guy up there needs your prayer this very moment. [ঐ ঘুটঘুটে আঁধারেঢাকা আকাশে সেই পাগলটার কথা একবার ভেবে দেখুন। 'মাল' কতটা টেনেছেন ? ঠ্যাঙ্-জোড়া পারবে মিনিটখানেক ঐ গতরের ভার বইতে ? তাইলে উঠে ডাঁড়ান ! কে-জানে ঐ ডাকা-বুকোটা হয়তো চাইছে, ঠিক এখনই, খোদাতালার দরবারে আপনাদের মোনাজাত]।

তৎক্ষণাৎ সকলের মনে পড়ে গেল সকালবেলাকার সেই ঘটনাটা ! খবরের কাগজের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত আটকলাম ব্যাপী একটি কার্টুন ! ছবির মাঝামাঝি ষোলো ইঞ্চি লম্বা একটা সরল রেখা—আকাশ আর সমুদ্রের সীমানা। উপরের আধখানা নিকষ কালো—মেঘে ঢাকা অমারাত্রি, নিচের আধখানায় অতলান্তিক মৃত্যুর অসংখ্য হাতছানি। ছবির বাঁ-দিকে অ্যাত্তটুকুন স্ট্যাচু অব লিবার্টি, ডান-দিকে অ্যাত্তটুকুন আইফেল টাওয়ার ! লিন্ডির দুঃসাহসিকতায়—দুটোই হয়ে গেছে পুঁচকে ! আর মাঝামাঝি আকাশের মাঝখানে একটা সাদা ফুটকি ! একটা বাইপ্লেনের আভাস।

লিন্ডবার্গের জীবনীকার মসলের ভাষায়

> সেরাত্রে যে-মুহূর্তে কুয়াশা ঢাকা মহাসমুদ্রের দিকে যাত্রা করল বৈমানিক, সেই মুহূর্ত থেকেই কিছু মানুষের চোখে ও হয়ে গেছে মানবসভ্যতার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। পণ্ডিতের দল অঙ্ক কষে যতই বলেন, মূর্খটার মৃত্যু অবধারিত ততই ঐ মানুষগুলো মনে মনে মাথা নাড়ে। তাদের চোখে লিন্ডি সেরাত্রে নিজের প্রাণ বাঁচাতে আকাশ পাড়ি দিচ্ছিল না—সে মানবজাতির ভবিষ্যৎকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওর প্লেন-এ। একা ! ও যদি মারা যায়, তাহলে—হ্যাঁ, ওরা দীর্ঘশ্বাস ফেলবে, আর মনে মনে বলবে বড় বেশি

আশা করেছিলাম, এমনটা বাস্তবে কখনো হয় না। কিন্তু ও যদি উপনীত হয় ওর শেষ তীর্থে? তাহলে ওর উপর দেবত্ব আরোপ করাটাও বোধহয় বাড়াবাড়ি হবে না। মস্‌লে এ-কথা লিখেছেন লিন্ডবার্গ সাফল্যলাভ করার অনেক পরে। কিন্তু অ্যালিস কেঁদেছিল, জো হামফ্রে খিস্তি ঝেড়েছিল সেই রাতেই। তেমনি ড্যানিয়েল প্যাট্রিক ঐ কার্টুনখানি রাত জেগে এঁকেছিলেন যখন লিন্ডির প্লেন অতলান্তিকের উপরে।

এ-থেকে আর একটা প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে। 'Cartoon'-এর বাঙলা পরিভাষাটা ঠিক হয়নি। 'ব্যঙ্গচিত্র' নয়, ওটা হওয়া উচিত 'ব্যঙ্গ্যচিত্র'। তফাৎটা কী? 'ব্যঙ্গ' অর্থে বিদ্রূপ কটূক্তি,

আইনস্টাইনের প্রয়াণে হেরব্লকের ব্যঙ্গ্যচিত্র

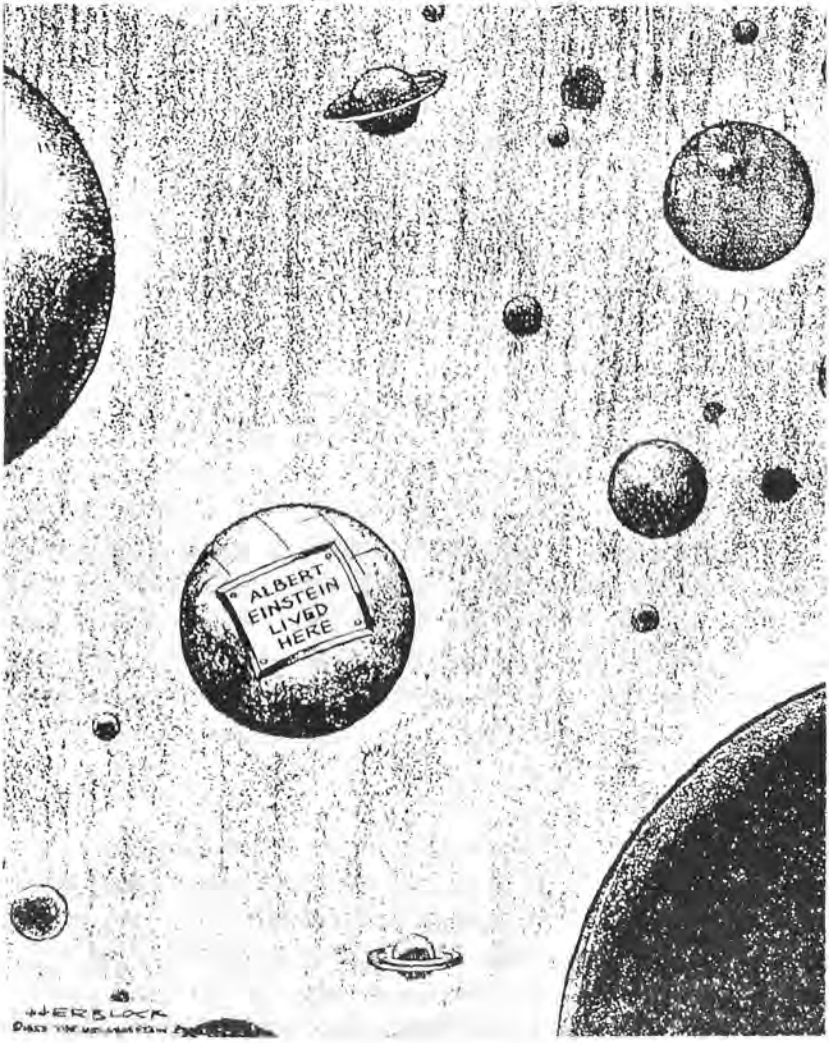

ডেভিড লো-র আঁকা আইনস্টাইনের ব্যঙ্গচিত্র

উপহাস। কিন্তু 'ব্যঙ্গ'—যে অর্থে শব্দটা ব্যবহার করেছেন শিল্পাচার্য তাঁর বাগেশ্বরী বক্তৃতায়—তার অর্থ 'বিশেষ নিগূঢ় ব্যঞ্জনায় আবৃত কোন ইঙ্গিত।' লেখার জগতে যেমন 'ব্যাজস্তুতি', রেখার জগতে তেমন 'ব্যঙ্গ'। ব্যাজস্তুতি দু-জাতের—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি অথবা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা। 'ব্যঙ্গ' তা নয়, সেটা এক তরফা; অথচ 'ব্যঙ্গ' দু-তরফা।

একমাথা কুচকুচে চুল বিউটিপার্লারে ফেলে রেখে মড্-নাতনি যখন 'বয়েজকাট' করে বাড়ি ফেরে তখন ঠাম্মা বলেন, 'আহা! কী সুন্দরীই লাগছে!' সেটা ব্যাজস্তুতি। স্তুতিচ্ছলে নিন্দা। আবার ঈশ্বরী যখন পাটনীকে স্বামীর পরিচয় দিতে বলেন, 'অতিবড় বৃদ্ধ স্বামী সিদ্ধিতে নিপুণ কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন'—তখন তাও ব্যাজস্তুতি। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতবর্ষের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বোধকরি লক্ষাধিক কার্টুন ছবি ছাপা হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর। তার প্রায় সবগুলিই ঐ ঈশ্বরী পাটনীকে বলা ঈশ্বরীর ব্যাজস্তুতি। যদিও আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজীর কান-জোড়া প্রায় মিকি-মাউস-মাপের! ঠাম্মার মতো বলতে ইচ্ছে করত, 'কী সুন্দরই লাগছে!'

প্রফেসর আইনস্টাইনের মৃত্যুসংবাদ যেদিন ঘোষিত হল সেদিন প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট হেরব্লক যে অর্ঘ্যে প্রয়াত বৈজ্ঞানিককে প্রণাম জানান তার চেয়ে বড় সম্মান তাঁকে কে দিতে পেরেছে?

বিজ্ঞানের জগতে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আলবার্ট আইনস্টাইনের যে খ্যাতি, ব্যঙ্গ্যচিত্র-জগতে ডেভিড লোর খ্যাতি প্রায় সেই রকম। তিনি কী জাতের ধ্রুপদী কার্টুন আঁকতেন তার একটি নমুনা দেখাই। এটি 1929-এ আঁকা:

দেখেছেন? ভাল করে? বুঝিয়ে বলুন দেখি এই ধ্রুপদী কার্টুনে শিল্পীর কী ব্যঙ্গ্য?

প্রথম কথা: ছায়াটা দেহ ছেড়ে দূরে সরে গেল কী করে? বিজ্ঞানসম্মত একটাই ব্যাখ্যা: মানুষটা মাটিতে নেই, আছে শূন্যে। না হলে আইন-মোতাবেক ছায়া তার মালিকের ঠ্যাঙজোড়া আঁকড়ে পড়ে থাকার কথা। সুতরাং বোঝা গেল, শিল্পীর প্রথম বক্তব্য—আইনস্টাইন পৃথিবীতে বর্তমান বটে কিন্তু পার্থিব মালিন্য তাঁকে স্পর্শ করে না, চিন্তা-জগতে তিনি পরিচিত পৃথিবীর বাইরে।

কিন্তু ছায়াটা অমন বেঁকে গেল কী করে?

বাঁকেনি? তাহলে আমার যেটা সমস্যা মনে হচ্ছে সেটা বুঝিয়ে দিন দিকিনি?

বৈজ্ঞানিকের দেহে যেভাবে আলোছায়ার খেলা দেখানো হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে সূর্য রশ্মি ক-সূচক তীরচিহ্ন পথে আসছে! মানেন তো? সে-ক্ষেত্রে, যদি ধরে নিই যে, আইনস্টাইন শূন্যে নেই, তাহলে তাঁর চরণাশ্রিত ছায়াটা সংলগ্নচিত্রের আকৃতির হবে। নিশ্চয় মেনে নিচ্ছেন? কিন্তু ছায়ার আকৃতি তো সে-রকম নয়! কেন? আসুন, হেতুটা প্রণিধানের চেষ্টা করা যাক।

আলোকপাতের হিসাব-মোতাবেক চরণাশ্রিত ছায়া

প্রথমেই অঙ্ক কষে দেখতে হবে ডেভিড লো আইনস্টাইনকে জমি থেকে কতটা শূন্যে তুলেছেন। কী করে বুঝবেন? বলি শুনুন:

একুশে আইন কবিতার ব্যঙ্গ্যটা প্রণিধান করতে আমরা 'একুশ' সংখ্যাটাকে নিয়ে 'এরিথমেটিক্যালি' অগ্রসর হইনি। সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম 'হিস্টরিক্যালি'। এবার লো-র কার্টুনের ব্যঙ্গ্যটা বুঝতে হলে 'জিওগ্র্যাফিক্যালি' অগ্রসর হওয়া চলবে না, আইনস্টাইন ভূপৃষ্ঠ থেকে কতটা উঁচুতে আছেন তা সমঝে নিতে হবে 'জিওমোট্রক্যালি'।

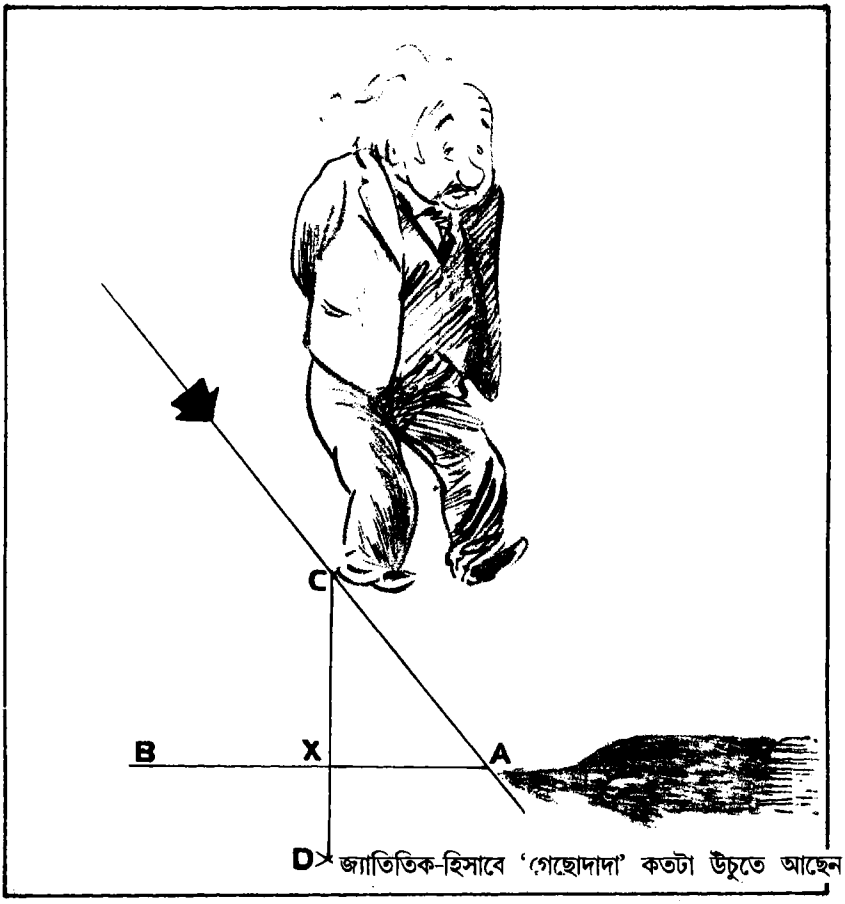

জ্যাতিতিক-হিসাবে 'গেছোদাদা' কতটা উঁচুতে আছেন?

প্রথমে ডান-জুতোর ছায়া বরাবর একটি সরলরেখা আঁকুন (A B) যা ভূমিরেখার (abscissa) সঙ্গে সমান্তরাল। এই AB সরলরেখার উপর আইনস্টাইনের জুতার হীল (C) থেকে একটি লম্ব আঁকুন (C D)। দুটি রেখা X বিন্দুতে ছেদ করল। অঙ্কের হিসাবে আইনস্টাইন ভূপৃষ্ঠ থেকে CX উচ্চতায় গুটি গুটি হেঁটে আসছেন। অপিচ, সূর্যরশ্মি, CA পথে আসছে। লো যে 'আলোছায়ার খেলা' (তাঁর জ্ঞানমতে chiaroscuro) দেখিয়েছেন তার সঙ্গে আমাদের অঙ্কের ফলাফল মিলে যাচ্ছে বলে বুঝতে পারছি—এ পর্যন্ত ভুল হয়নি কিছু।

কিন্তু দেহের ছায়াপাত যদি লো-র চিত্রে প্রদর্শিতরূপে মাটিতে পড়ে তাহলে আমাদের ধরে নিতে হবে সূর্যরশ্মি খ-চিহ্নিত পথে এসেছে। সেক্ষেত্রে দেহে ও-ভাবে আলো-ছায়ার খেলা দেখানো চলে না।

এমনটা কী করে হচ্ছে? আঁকার ভুল? ডেভিড লো-র? অসম্ভব! তাহলে? একটাই ব্যাখ্যা। ধ্রুপদী কার্টুনিস্ট ঐ আলোছায়ার খেলায় একটা বিরাট তত্ত্বকথা শুনিয়েছেন:

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!···
আসল ব্যাপার জানবে যদি আমার কথা শোনো
বলছি যা তা সত্যি কথা, সন্দেহ নাই কোনো।
কেউ যবে তার রয় না কাছে, দেখতে নাহি পায়,
গাছের ছায়া ছট্‌ফটিয়ে এদিক ওদিক চায়।

কে বলেছেন, বলুন তো? ···না, ভুল হল! সুকুমার রায় নন, প্রফেসর আলবার্ট আইনস্টাইন! এই শতাব্দীর প্রথম দশকে! শুনুন বুঝিয়ে বলি: আইনস্টাইন বললেন, আলোকরশ্মি সরলরেখায় চলার পথে যদি হঠাৎ কোনও বিরাট 'ভর'-এর (mass) আওতায় এসে পড়ে, তাহলে তা বেঁকে যায়।

ডেভিড লো তার একটি সরস সম্প্রসারিত করোলারি যুক্ত করলেন—শুধু বিরাট 'ম্যাস' নয়, বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হলেও সূর্যরশ্মি "ছটফটিয়ে এদিক-ওদিক চায়!"

ব্যাপারটা বোঝা গেল না, কেমন তো? তা কী করে বুঝবেন? স্ট্যাগপার্টিতে এ তত্ত্ব ভেদ করা যাবে না। 'রেখা দেবী'কে ডাকতে হবে সাহায্য করতে।

আইনস্টাইন বললেন, আলোর 'ভর' আছে। তাই আলোকতরঙ্গও মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। বললেন, কোন নক্ষত্রের আলোক মহাকাশ পাড়ি দেবার পথে যদি অন্য কোনও নক্ষত্রের (যেমন আমাদের সূর্য) কাছ ঘেঁষে যায়, তখন তা সামান্য বেঁকে যায়। কতটা? ঐ নক্ষত্রের 'ভর' যতটা, সেই অনুপাতে। আরও বললেন, আমাদের সূর্যের যা 'ভর' তাতে সূর্যের কাছাকাছি সিধে-পথে-ছোটা আলোকরশ্মি 1.75 সেকেন্ড (এখানে সেকেন্ড সময়ের মাপ নয়, কৌণিক মাপ। অর্থাৎ এক ডিগ্রি কোণের ষাট ভাগের একভাগ৹যে 'মিনিট', তার ষাট ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এক 'সেকেন্ড'। সোজা কথায়, এক সমকোণের 3,24,000 ভাগের এক ভাগ হচ্ছে 'কৌণিক মাপ এক সেকেন্ড') বেঁকে যাবে। কিন্তু এটা পরীক্ষা করে দেখা তো অসম্ভব। কারণ সূর্যের অত কাছাকাছি কোন নক্ষত্রকে তো চোখেই দেখা যাবে না! এ-যেন সেই জাতের রসিকতা, "—চোখ বুঁজলে—আহা! তোমার মুখখানি ঠিক বাঁদরের মতো দেখায়। আমরা সবাই তাই দেখি। বিশ্বাস না হয় চোখ বুঁজে আয়নায় নিজের মুখখানা দেখ'সে!"

কিন্তু তা কেন? পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় তো আকাশে তারা ফোটে। তেমন-তেমন পূর্ণগ্রাস হলে সূর্যের কাছ-ঘেঁষা নক্ষত্রকেও দেখতে পাওয়া যাবে। তার আলোকরশ্মি যদি সূর্যের কাছ ঘেঁষে আসার সময় বেঁকে যায় তাহলে সে তথ্যটা পৃথিবী থেকে বোঝা যাবে, অন্যান্য নক্ষত্রের আপেক্ষিক দূরত্ব মেপে। আইনস্টাইন এই তত্ত্বটা জানানোর পর হিসাব মতো জানা গেল, অমন জাতের পূর্ণগ্রাস পৃথিবীর দুটি স্থান থেকে দেখা যাবে উনত্রিশে মে 1919 খ্রীষ্টাব্দে। দুই দল জ্যোতির্বিজ্ঞানী সরেজমিনে তত্ত্বটা পরীক্ষা করতে রওনা হলেন। একদল গেলেন ব্রেজিলে, অপর দল নিউগিনি।

ওঁদের পরীক্ষাকার্যটা বুঝিয়ে বলতে আমাকে 'রেখা'র শরণ নিতে হচ্ছে। এখানে পর পর দুটি ছবি এঁকেছি। নিচের ছবিতে দেখছি, সূর্যগ্রহণের অনেক আগে। দূরবীনে A-চিহ্নিত

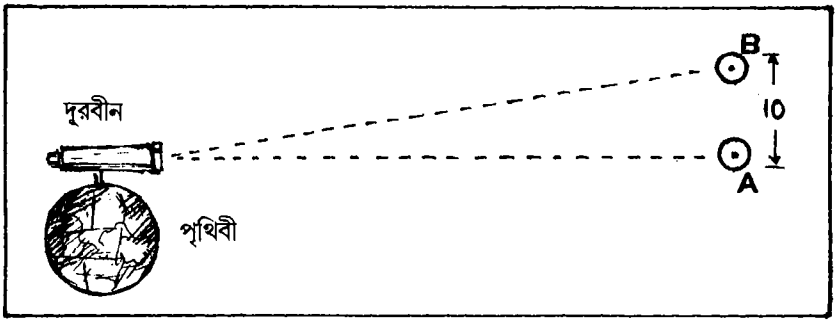

নক্ষত্রটির কৌণিক মাপ মেপে রাখা হল B নক্ষত্রের আপেক্ষিকে। মনে করি সেটা দশ সেকেণ্ড। অর্থাৎ $< ACB = 10$ সেকেন্ড।

পরপৃষ্ঠায় ছবিতে দেখা যাচ্ছে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের অবস্থা। দূরবীন আর সূর্যের মাঝখানে অমাবস্যার চন্দ্র এমনভাবে উপস্থিত যাতে সূর্য পুরোপুরি ঢেকে গেছে। সূর্যের প্রান্তদেশ (S) ছুঁয়ে A-নক্ষত্রের যে আলোকরশ্মি প্রায়-স্পর্শক (tangent) হিসাবে আসছিল তা বেঁকে এসে দূরবীনে (C) প্রবেশ করছে; কিন্তু চোখ যেহেতু তা টের পাবে না তাই A নক্ষত্রকে দেখবে নাক-বরাবর A′ অবস্থানে।

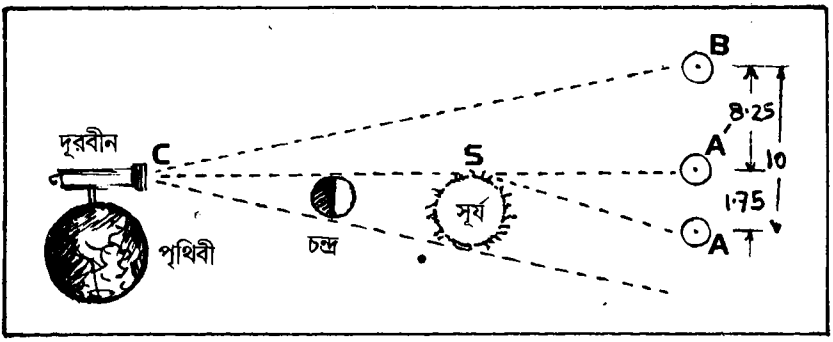

এখন মেপে যদি দেখা যায় $< A'CB = 8.25$ সেকেন্ড তাহলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, $< ACA' = 1.25$ সেকেণ্ড।

দুজন বৈজ্ঞানিক যে মাপ পেয়েছিলেন তার গড় 1.79 ;

আইনস্টাইনের অঙ্ক অনুযায়ী তা ছিল, আগেই বলেছি, 1.75

অর্থাৎ আমরা প্রমাণ করলাম, ঐ ধ্রুপদী ব্যঙ্গচিত্রে ডেভিড লো তাঁর কার্টুনে কী-ভাবে মহাবিজ্ঞানীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করেছেন। শুধু ভাষায় পারিনি, রেখা-লেখার যৌথ আবেদনে ব্যাপারটা বোঝানো গেছে।

শ্রীমতী নিবেদিতা দত্ত *আনন্দবাজারে* তাঁর ঐ সুলিখিত প্রবন্ধে 'কার্টুন'-এর সব দিক নিয়েই আলোচনা করেছেন, শুধু বাদ গেছে তার ধ্রুপদী রূপটা, শ্রদ্ধার অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যঙ্গ্যসত্তা। শ্রীমতী দত্ত লিখেছেন,

> আজকের দিনে কার্টুন বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝে থাকি রেখাচিত্র দিয়ে একটি সমসাময়িক ঘটনাকে ব্যঙ্গময় করে তোলাকে। অনুষঙ্গ হিসাবে ছবিটির ক্যাপশান থাকতে পারে, আবার নাও পারে। কিন্তু মূল উপাদান হিসাবে থাকবে হাস্যরস। কোন কার্টুনিস্ট বিষয় হিসাবে বেছে নেন রাজনীতিকে, কারও বিদ্রূপের লক্ষ্য হয় সমাজের নানারকম অসঙ্গতি, অব্যবস্থা। কারও ব্যঙ্গচিত্র শুধুই নির্মল হাস্যরসের ঝরণা।

অত্যন্ত সত্য কথা। কিন্তু আইনের ভাষায় যাকে বলে 'হোলট্রুথ', তা নয়। শতকরা হয় তো পঁচানব্বই ভাগ কার্টুনের মূল উপাদান হিসাবে থাকে হাস্যরস—তা আগেই বলেছি—হতে পারে রঙ্গ (fun) আর কৌতুক (comic), অর্থাৎ নির্মল হাস্যরস ; কখনো বা বিদ্রূপ (satire), ক্লেদোৎঘাটক অতিকথন (caricature), অথবা তীব্র শ্লেষ (sarcasm)। কিন্তু বাকি ঐ শতকরা পাঁচ ভাগ কার্টুনের উৎসমুখে হাস্যরসের বাষ্পমাত্র নেই। ড্যানিয়েল প্যাট্রিকের কার্টুনে যেমন শুধুই ছিল 'ধিক্কার'। হেরব্লকের কার্টুনে যেমন দেখছি 'একটি সমসাময়িক ঘটনাকে ব্যঙ্গময় করে' তোলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই। তার আবেদন 'যাবৎ চন্দ্রার্কমেদিনী' কালের প্রণাম। ডেভিড লো-র কার্টুনের পশ্চাদপটে যেমন এক দুরূহ তত্ত্বের মোড়কে শ্রদ্ধার্ঘ্য!

কার্টুন প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক—রেখা ও লেখার যুগলবন্দী গানের কথায়:

রচনা চিত্রণ বা অলঙ্করণের কাজের ধারাটিও প্রাচীন এবং আজও অব্যাহত। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার মশাই এঁকেছেন নিজের লেখা *ঠাকুরমার ঝুলি*-র ছবিগুলি। উপেন্দ্রকিশোর

'সন্দেশ'-এর প্রথম সূর্য। বস্তুত তিনিই হচ্ছেন 'হাফটোন' পদ্ধতিতে ছবি ছাপার পথিকৃৎ। সে সময় পাশ্চাত্যের 'হাফটোন' ছিল গবেষণার পর্যায়ে।

রেখা-লেখার আর এক সম্রাট, সুকুমার রায়। ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেক্‌নোলজি শিখতে তিনি বিলেত যান। ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অফ টেক্‌নোলজির বিশেষ ছাত্ররূপে পিতার আবিষ্কৃত হাফটোন পদ্ধতি প্রদর্শন করে তাঁর কার্যকারিতার প্রমাণ করেন। 1913 খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রিন্টিং প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রথম ভারতীয় হিসাবে F. R. P. S. উপাধি লাভ করেন। মাত্র ছত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর প্রয়াণ না হলে রেখা ও লেখার জগতে হয়ত বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটত। ধৌলির অশোক-শিলালেখের মতো তাঁর ছবি ও চিত্র বাংলা শিশুসাহিত্যে চিরস্থায়ী।

যতীন সেনের ছবি ছাড়া কি গিরীন্দ্রশেখরের অমন ছড়াটা আমাদের মন কাড়ত ?—"কালো বউ কালো কোলো, জলে ঢেউ সাম্‌লে চোলো।" উপেন্দ্র ও সুকুমারের পরে *সন্দেশে* এসেছিলেন সুবিনয়, সুখলতা, স্নেহলতা, পুণ্যলতা। *সহজপাঠকে* সচিত্র করলেন নন্দলাল। জ্ঞানদানন্দিনীর *'সাতভাইচম্পা'*কে গগনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম এডিশান *'জীবনস্মৃতি'*কেও সচিত্র করেছিলেন গগন ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সচিত্র করেছেন: *সে*। অবনীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের *'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ'* ও *'ভারতশিল্পে মূর্তি'* প্রভৃতি টেক্‌নিকাল বইতে তুলি ধরেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের বাংলা *'চিত্রাঙ্গদা'* (1892) ছাড়াও ইংরাজি *'ক্রিসেন্ট মুন'* (1913) অলঙ্কৃত করেন এবং আনন্দ কুমারস্বামী, হ্যাভেল, পার্সি ব্রাউনের একাধিক গ্রন্থ সচিত্র করে তোলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (1931) 'দ্য গোল্ডেন বুক অব টেগোর'-এর ছবিগুলিও অবনীন্দ্রের আঁকা।

রবীন্দ্রযুগে প্রবেশের আগে আর একটি কথা বলতে ভুলেছি। চিত্রশিল্পের দুটি—না, দুটি নয়, তিনটি ধারা প্রাক-রবীন্দ্রযুগে সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। প্রথমত 'বটতলা'; দ্বিতীয়ত 'কালীঘাটের পট' এবং তৃতীয়ত—বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের যমপট, রামপট, বিষ্ণুপট প্রভৃতি।

বটতলায় ছাপা কাঠের ব্লক সে-আমলের সাহিত্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলা সচিত্র গ্রন্থের সূত্রপাত 1816 সালে। কলকাতার ফেরিস কোম্পানির প্রেসে ছাপা *'অন্নদামঙ্গল'* তাতে ছয়টি ছবি ছিল। 'বটতলা' শব্দটির একটা বিকৃত যোগরূঢ় ব্যঞ্জনা ইদানীং গৃহীত হয়েছে—যেন সবই *'হরিদাসের গুপ্তকথা'*। তাই ঐ বটতলা বঙ্গসাহিত্যকে আদিযুগে যে কীভাবে সাহায্য করেছে তা আমরা সচরাচর খেয়াল করি না। সুকুমার সেন মশায়ের কৃপায় তা আমরা সম্প্রতি নতুন করে জেনেছি।[১৮]

কালীঘাটের পটের সঙ্গে সাহিত্যের অবশ্য প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না; কিন্তু সে-কালীন বাবু-কালচারের যে রূপ সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিফলিত, সেটা উপলব্ধি করতে কালীঘাটের পট আমাদের প্রভূত সাহায্য করে। আজকের দিনে স্কাইস্ক্রেপারের অধিবাসী মার্কিন কিশোর যেমন ছবি দেখে আন্দাজ করে *টম সয়ার* অথবা *হাকফিন*-এর জল-জঙ্গলের দুনিয়াটাকে।

বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া অঞ্চলের ঐ সব যমপট, রামপট ইত্যাদিও সাহিত্যসেবা করেছে। স্ক্রোলের আকারে আঁকা ছবি—গোটানো রোল একটু একটু করে খুলে কথক গান গেয়ে শোনাত, সঙ্গীরা দোহার ধরত—অশিক্ষিত গ্রাম্যশ্রোতা ও দর্শক অনাবিল আনন্দ পেত। এগুলি দু-তিন শতাব্দীর পুরাতন ধারা।

এভাবে পদাবলী কীর্তনও গীত হয়েছে। পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষ করে সচিত্র পুথি জন্ম

নিয়েছে জয়দেবের ক্ষেত্রে। বাংলা দেশের চেয়েও উন্নততরমানের জয়দেবের পুঁথি পাওয়া যায় উড়িষ্যা রাজ্যে।

সচিত্র রচনা, অলঙ্করণ ও প্রচ্ছদশিল্পের ঐ ধারাটি বাংলা সাহিত্যে আজও অম্লান। আমাদের কৈশোরে যাঁরা আমাদের মনোহরণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে—ফণিভূষণ গুপ্ত, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, আশু বন্দোপাধ্যায়, মুনীন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতির নাম। আজও যাঁরা আমাদের মধ্যে আছেন সেই সর্বশ্রী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, সমর দে, অন্নদা মুন্সী (সম্প্রতি লোকান্তরিত), শৈল চক্রবর্তী। তাঁদের পরে ইদানীং যাঁরা বাণীপ্রতিমার শ্রীঅঙ্গে সলমা-চুমকি বসিয়েছেন বা বসাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে মনে পড়ছে এই কয়টি নাম : সর্বশ্রী খালেদ চৌধুরী, রণেন আয়ান দত্ত, মাখন দত্তগুপ্ত, সুধীর মৈত্র, সমীর সরকার, ও· সি· গাঙ্গুলি, সুবোধ দাশগুপ্ত, সুব্রত গাঙ্গুলী, সুনীল শীল, সুব্রত চৌধুরী, গৌতম বসু, অলক ধর, দেবাশিস্ দেব, অরূপ রায়, বিমল দাস, মদন সরকার প্রভৃতি। কেউ কেউ নিজের রচনা নিজেই অলঙ্করণ করেছেন বা করছেন। যেমন কমল মজুমদার, পরিতোষ সেন, পূর্ণেন্দু পত্রী, হিমানীশ গোস্বামী, নারায়ণ দেবনাথ, ময়ূখ চৌধুরী, চিত্ত সিংহ, নিতাই ঘোষ, গৌতম রায় এবং এক-একটি বিরল ক্ষেত্রে নাট্যকার বাদল সরকার ও এ-কালের রসসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। এঁদের পূর্বযুগে যাঁরা ছিলেন মূলত চিত্রশিল্পী তাঁদের অনেকেও সচিত্র সাহিত্য উপহার দিয়েছেন আমাদের—অসিত হালদার, মুকুল দে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এখনো দিচ্ছেন ইন্দ্র দুগার(সম্প্রতি লোকান্তরিত), চিন্তামণি কর,—এই তো সেদিন গোপাল ঘোষ। ইদানীংকালে চিত্রশিল্পের জগতে যাঁরা নূতন দিগন্তের দিশারী—গণেশ পাইন, বিকাশ ভট্টাচার্য, সুনীল দাস, গণেশ হালুই, শ্যামল দত্ত রায়, শুভাপ্রসন্ন, অনিলবরণ সাহা, ইত্যাদি ক্বচিৎ কখনো অলঙ্করণের ভূমিকা নিলেও তাঁরা মূলত শিল্পী—সাহিত্য-সম্পৃক্ত নয়, সমান্তরালে ললিতকলাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। কেউ বা দক্ষতা দেখিয়েছেন ছোটদের জন্য জীবজন্তুর ছবি আঁকায়। যেমন, কালিকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার, ধ্রুব রায়, মাখন দত্তগুপ্ত। কত নাম করব ? রঘুনাথ গোস্বামী, গণেশ বসু, অমিয় ভট্টাচার্য, সূর্য রায়, সত্য চক্রবর্তী।

ইদানীংকালে প্রচ্ছদ, সচিত্রকরণ ও গ্রন্থ অলঙ্করণের ক্ষেত্রে দিলীপ গুপ্ত এবং তাঁর সিগনেট প্রেসের কথা রেখা-লেখার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ গ্রন্থসজ্জায় সে আমলে 'সিগনেট প্রেস' ছিল একটি স্বর্ণখনি। অনবধানতায় যদি কোনো উল্লেখ্য নাম বাদ দিয়ে থাকি—

ঐ দেখুন! কী সর্বনাশ! একালের তালিকায় যে নামটি সবার আগে লেখার কথা—সেই রেখা-লেখার যুগ্ম-যাদুকরটির নামই বাদ গেছে: শ্রীসত্যজিৎ রায়! বিশ্বশিশুর মানসপটে মিকি-মাউস, ডোনাল্ড-ডাক, বা চার্লি চ্যাপলিনের ছবি যেমন শাশ্বত, তেমনি বাঙালি বাচ্চা চোখ বুজলে দেখতে পায়—প্রফেসর শঙ্কু, ফেলুদা অথবা পাগলা জগাই-এর ছবি। শেষেরটি যুগলবন্দি। রেখা ও লেখায় ভিন্ন চিত্রকর-সাহিত্যিকের আশীর্বাদধন্য। পিতাপুত্রের।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লিখতে বাধ্য হচ্ছি—ভারতবর্ষের 'সেই ট্র্যাডিশান' মেনে আমরা আজও একই জাতের ভুল করে চলেছি। কুতবমিনারের বনিয়াদ কে 'ডিজাইন' করেছিলেন, বুলন্দ্-দরওয়াজার পরিকল্পনাকারের নাম কী, তাজমহল যাঁর ধ্যানের দৃষ্টিতে সর্বপ্রথম ধরা দিয়েছিল সেই উস্তাদোঁ-কি উস্তাদ্ 'অ্যানন্' কোন্-উপেক্ষিত হতভাগ্য, তা আমরা জানি না।

ঠিক তেমনিভাবে বঙ্গসরস্বতীর এইসব কুমোর ও মালাকরদের যথোচিত সম্মান-মর্যাদা আমরা আজও দিই না। গ্রন্থের এডিশান (P.T.S না-) হলে লেখক নতুন করে সম্মান-দক্ষিণা পান; প্রুফ-রীডার, কম্পোজিটার, মায় দপ্তরি পর্যন্ত নূতন করে উপার্জন করে। কিন্তু ইলাস্ট্রেটার? বাঃ! সেই 'নেসেসারি ঈভ্‌ল্'-এর পাওনাগণ্ডা তো প্রথম এডিশানের সময়েই 'তামাম শুদ্' হয়ে গেছে! হয়তো এই কারণেই শুনেছি—সঠিক জানি না—শেষ জীবনে যতীন সেন মশাই অর্থকৃচ্ছ্রতায় কষ্ট পেয়েছেন। রাজশেখর বসুর গ্রন্থ 'গড্ডলিকা'-স্রোতে এডিশানের পর এডিশান হয়েছে—বঙ্গ-রঙ্গ-সাহিত্য যুগে যুগে প্রোজ্জ্বল হয়েছে—শুধু 'ইলাস্ট্রেটারের' ললাটে পড়েছে 'কজ্জ্বলী'র চিহ্ন—চিত্রকরের বরাতে সবই 'হনুমানের স্বপ্ন', সবই 'ধুস্তুরী মায়া।'

শুনেছি, কলকাতা-শহরে একটিমাত্র প্রকাশন সংস্থা: 'শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ' ইলাস্ট্রেটারদের রয়্যালটি দিয়ে থাকেন; অর্থাৎ বিক্রয়লব্ধ অর্থের এক নির্দিষ্ট শতাংশ। এডিশান হলে চিত্রকর পুনরায় লাভবান হন। অন্য কোনো প্রকাশন সংস্থা যদি অনুরূপভাবে ইলাস্ট্রেটারকে সম্মানদক্ষিণা দিয়ে থাকেন, তবে তা আমার অজানা। আশা করব, সে-ক্ষেত্রে এ বিষয়ে প্রতিবাদপত্র পাব। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব। বলাবাহুল্য অত্যন্ত খুশি হব তাতে।

একজন প্রখ্যাত ইলাস্ট্রেটার—নাম করলে আপনারা সবাই তাঁকে একডাকে চিনবেন—আমাকে একবার একটি ব্যক্তিগত পত্রে লিখেছিলেন

"কোন শিল্পী তাঁর লেখার বক্তব্যকে ছবির মারফৎ আরও বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন বা লেখাটি পড়তে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—একথা লিখিতভাবে স্বীকার করলে লেখকের গুরুত্ব হ্রাস পাবে এমন একটা ভয় লেখকের মনের গভীরে কাজ করে। সেজন্য আজ পর্যন্ত কোনো লেখক তাঁর illustrator-এর কথা আলোচনা করেননি। যাঁরা অলঙ্করণ করেন, তাঁরাও একরকম হীনমন্যতায় ভোগেন। পত্রিকা-সম্পাদক লেখকের কাছে গল্প চান যথোচিত বিনীত ভঙ্গিতে, 'অ্যাডভান্সড্-চেক' হাতে নিয়ে। কিন্তু illustrator-এর সঙ্গে বাড়ির চাকরের মতো ব্যবহার করেন। যেসব শিল্পী নামী ad-agency-র উচ্চপদে আসীন কেবল তাঁরাই সম্পাদকের কাছে খাতির পান। কারণটা দুর্বোধ্য নয়।"

ঐ প্রথিতযশা ইলাস্ট্রেটারের সঙ্গে একমত হতে বাধা দেখি না। তবু মনে হয়—এটা শুধু 'চরম' সত্য, 'পরম' সত্য নয়! কারণ বিপরীত ঘটনারও নজির আছে। আমি জানি, শিল্পী চণ্ডী লাহিড়ী প্রাগ্-আনন্দবাজার যুগে, খুব কাঁচা-বয়সে একবার রাজশেখর বসুর একটি গল্প 'যষ্টিমধু' পত্রিকার জন্য অলঙ্করণ করেছিলেন। চণ্ডীবাবু আমাকে জানিয়েছিলেন, "রাজশেখর সেদিনের সেই অর্বাচীন শিল্পীকে উপেক্ষা না করে একটি স্বতঃপ্রণোদিত প্রশংসাপত্র পাঠান।"[১৯]

রচনাকালে কথা-সাহিত্যিক এবং পাঠের সময় পাঠক-পাঠিকা অনিবার্যভাবে একটি মানসচিত্র আঁকতে বাধ্য হন—বর্ণিত ঘটনা ও চরিত্রগুলির কাল্পনিক আলেখ্য। ইলাস্ট্রেটরের আঁকা ছবিতে কখনো তাঁরা মনে মনে ধাক্কা খান কখনো বা একটা নূতন দিগন্তের সন্ধান পান আবার কখনো বা দুটি ছবি ইউক্লিডের উপরিপাতী ত্রিভুজদ্বয়ের মতো খাঁজে-খাঁজে মিলে যায়। শেষোক্তের উদাহরণ: গণ্ডেরিরাম বাট্‌পাড়িয়া, লালিমা পাল (পুং) অথবা খল্বিদং স্বামী। কুঠারধারী পরশুরাম কিম্বা বীণাবাদক নারদ তাদের একই রূপে দেখেছিলেন নিশ্চয়; কারণ তাদের আর কোনোভাবে ভাবা যায় না। আমার 'রূপমঞ্জরী' উপন্যাসে (এখনও প্রকাশিত

হয়নি) শ্রী সুধীর মৈত্র আমাকে যে স্কেচগুলি এঁকে দিয়েছেন তাতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। লেখকের কল্পনা এবং চিত্রশিল্পীর কল্পনায় কোনও পার্থক্য নেই!

ইলাসট্রেটার সচরাচর রচনার কোন একটি পংক্তির চিত্ররূপ আঁকেন। ত্রৈলোক্যনাথের পরিপূরক চঞ্চলকুমার থেকে 'পরশুরামে'র সহযোগী 'নারদ' পর্যন্ত এভাবেই 'ডুয়েটগান' বা 'যুগলবন্দী' গেয়ে গেছেন। সবাই কিন্তু সে রীতি মানেন না। একই রাগ-সঙ্গীতে স্বকীয় বিবাদী-স্বরের ব্যবহারে তাঁরা রকমফের করেন। যেমন ধরুন, এই কেতাবের প্রথম রচনাটির ব্যঙ্গচিত্র "দিল্ তড়পনা য়্যে রাত-অন্ধি?" লেখক বলেননি যে, রাস্তায় তাঁকে টলতে দেখে সর্দারজী ঘনিয়ে এসে জানতে চেয়েছিল, "আপনি টলছেন কেন? বুক ধড়ফড় করছে, না রাত কানা?" অথবা 'ইন্টেন্সিভ কেয়ার য়ুনিটে' silence ফলকটার বর্ণনার সুযোগ নিয়ে যেভাবে লেখকের লেগপুলিং করা হয়েছে 'বিশাখে, না না ও ললিতে'—তা কার্টুনিস্ট-এর কল্পনা; লেখকের নয়। কিন্তু 'রস'-টা একই, ফলে এ সম্প্রসারণ একই ছন্দে। মূল লক্ষ্য হাস্যরস!

নূতন দিগন্তের প্রসঙ্গে 'ইলাস্ট্রেটার' শব্দটাকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করে বলতে পারি —'*সত্যকাম*'-এ নায়িকাকে যখন কুমার-বাহাদুরের কক্ষে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন যে চিত্রটি এঁকেছিলেন পরিচালক হৃষিকেশ মুখার্জি তা কথাসাহিত্যিকের কল্পনাকে ছাপিয়ে গেছিল। অপরপক্ষে *নাগচম্পায়* শুধু মানসিক ধাক্কা নয় ধমকও খেয়েছেন লেখক। আমার ধারণা ছিল, পি. কে. বাসু প্রৌঢ় ও কনফার্মড ব্যাচিলার। *যদি জানতেম* ছায়াছবির প্রিমিয়ার শোতে সস্ত্রীক আমন্ত্রণ হয়েছিল। পর্দায় পি· কে· বাসু-রূপী যুবক উত্তমকুমার যখন প্রবেশ করলেন তখন বেশ একটা ধাক্কা খেলুম। হঠাৎ নজর হল অকৃতদার বাসু-সাহেব হুইলচেয়ারে করে এক ভদ্রমহিলাকে ঠেলতে ঠেলতে চলেছেন। মহিলাটিকে সনাক্ত করতে না পেরে পার্শ্ববর্তিনীকে প্রশ্ন করি: "ঐ পঙ্গু মহিলাটি কে?"

পার্শ্ববর্তিনী আমাকে ধমক দিয়েছিলেন, "সিনেমা দেখছ না ঘুমোচ্ছ? রুমা গুহঠাকুরতা তো বাসু-সাহেবের বউ!"

যতদূর মনে আছে, আমি শুধু বলেছিলুম: 'যাচ্চলে!'

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়, এমনকি মুদ্রণ শিল্পের জন্যও সরকারি-বেসরকারি বার্ষিক পুরস্কারের নানান ব্যবস্থা আছে। এঁদের জন্য নেই. কেন? এইসব কুমোর ও মালাকরদের জন্য? পূজা-সংখ্যার শ্রেষ্ঠ ইলাস্ট্রেটার, গতবছরের শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট অথবা প্রকাশিত গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদশিল্পীকে কেন বাৎসরিক সম্মান জানানো হয় না? সরকার না আসুন, কোনো বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠী বা প্রকাশন-সংস্থা কি এগিয়ে আসতে পারেন না? টাকার তোড়া না হয় নাই দিলেন—ধুতি-চাদর? নিদেন একগুচ্ছ ফুলের তোড়া? যাতে 'মাথার উপরে বাড়ি-পড়ো-পড়ো' ভাঙা-ঘরে ফিরে গিয়ে সেই তোড়াটাই শিল্পী তুলে দিতে পারেন কোনো এক প্রিয়জনের শাঁখা-সর্বস্ব হাতে!

রাজনৈতিক জগতে এসেছে 'পোলারাইজেশন।' এম· এল· এ হতে চান? হয় 'ডান', নয় 'বাম' কোনো একটি দলে নাম লেখান। নির্দল প্রার্থীরা ও-পাড়ায় আজ আর পাত্তা পান না। সাহিত্যের বাজারেও আজ তাই। সে বাজার পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত। তা-বড়ো তা-বড়ো কোনো পত্রিকা গোষ্ঠীর দুয়ারে মাথা না মুড়োলে নির্দল সাহিত্যসেবী আজ কল্‌কে পান না। তবু মাঝে মাঝে বিরল ব্যতিক্রমও হয়। কলমের জোর থাকলে, স্বকীয়তা, মনের জোর এবং

মোটামুটি আর্থিক সঙ্গতি থাকলে কথা-সাহিত্যিক একা-হাতে লড়াই করে পাঠকের মনোহরণ করেছেন—এমন ঘটনা বিরল হলেও অসম্ভব নয়। বাংলাভাষায় অসংখ্য লিট্‌ল ম্যাগাজিন আছে। সেখানেও তাঁর স্ফূরণ হতে পারে। হয়ত সেখান থেকেই তিনি কোনো প্রকাশকের মন কাড়েন। তারপর বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর মদৎ ছাড়াই, এমনকি সমালোচনায় তাঁকে ভূতলশায়ী করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তিনি ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রসাদধন্য লেখকের মতো হাউই-এর বেগে তাঁর উন্নতি হয় না; হয় শরতের কিউমিউলাস্ মেঘের মতো স্তূপে-স্তূপে, স্তবকে-স্তবকে, দীর্ঘ সময় নিয়ে। প্রকাশক তাঁর নামে বিজ্ঞাপন দেয়, ক্যাটালগে নাম ছাপে। নামটা পরিচিত হয়। পত্রিকাগোষ্ঠীর 'বেস্ট-সেলার'-লিস্টে নাম না থাকলেও তাঁর বইয়ের দ্রুত এডিশান হতে থাকে।

সদ্যপ্রয়াত আশুদা— আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চিত্রশিল্পীর পক্ষে কিন্তু এমনটা হবার সম্ভাবনা নেই। শহরে 'এগ্‌জিবিশন-হল' মুষ্টিমেয়। ভাড়া বেশি। এতদিন শুধু ভরসা ছিল—গোলদিঘি আর যাদুঘরের রেলিং। ইদানীং অ্যাকাডেমি এবং সরকারি 'শিশিরমঞ্চ' হওয়ার তবু কিছুটা সুরাহা হয়েছে; কিন্তু কীভাবে জানব কার প্রদর্শনী কখন হচ্ছে? প্রচার করবে কে? কার স্বার্থে? কার অর্থে?

দর্শক-সাধারণের সঙ্গে চিত্রশিল্পীকে চিনিয়ে দিতে পারেন শুধুমাত্র বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত আর্ট-ক্রিটিক বা শিল্প-সমালোচকবৃন্দ অথবা 'দূরদর্শন'। যেভাবে টি· ভি· ইদানীংকালে দর্শকদের পরিচিত করিয়ে দিচ্ছেন লিট্‌ল্-থিয়েটার গ্রুপের সঙ্গে। দূরদর্শন এখনও এ কাজে এগিয়ে আসেনি। বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর অনেক সমালোচক সে কাজে দক্ষতা দেখিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন। প্রদর্শিত চিত্রাবলীর গুণাগুণ বিচার করে রসপিপাসু দর্শকদলকে যেমন শিল্পবোধে সাহায্য করেছেন, তেমনি বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন শৈলীর আর্টিস্টকে উৎসাহ দিয়েছেন, পরিচিত করেছেন, এবং নৈর্ব্যক্তিক শিল্পসমজদারের গাম্ভীর্যে, অথচ সস্নেহে, শিল্পীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—তাঁদের অভাব, ম্যানারিজ্‌ম্ বা ভুলত্রুটির দিকে। এ-কালের সার্থকনামা নিরপেক্ষ চিত্র-সমালোচকদের মধ্যে সর্বজনশ্রদ্ধেয় কয়েকটি নাম: সর্বশ্রী কমল মজুমদার, অরণি ব্যানার্জি, সমীর দত্ত, প্রণবরঞ্জন রায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, S. B., রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, অহিভূষণ মালিক, ইন্দ্র দুগার, দ্বিজেন্দ্র মৈত্র প্রভৃতি।

কিন্তু কোনো কোনো শিল্প সমালোচক—সৌভাগ্য এই যে, সংখ্যায় তাঁরা কম—বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে ছবি দেখেন ও বিচার করেন। শিল্পের ক্ষেত্রও যে সাহিত্যের মতো দিগন্তবিস্তৃত এবং ভিন্ন মেজাজের, এ বোধ তাঁদের নেই। 'আমি ক্যাক্‌টাস ভালবাসি, তাই তোমার বাগানের ঐ গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা বা মরশুমি ফুল আমার বরদাস্ত হয় না!' —এই ব্যক্তিগত মানসিকতাও দূষণীয় নয়, যদি না কোনো বহুল-প্রচারিত পত্রিকায় আমি সে-কথা ঘোষণা করে সাধারণ দর্শককে বিভ্রান্ত করি। দু-একটি উদাহরণ দিই—

ইত্যাদি প্রকাশনীর শিল্প-বিভাগের প্রধান শ্রীনিতাই ঘোষ একবার একটি একক-প্রদর্শনী করেন। ছুটিতে তিনি পাহাড়ি-অঞ্চলে বেড়াতে গেছিলেন—মনের খেয়ালে সেখানকার কয়েকটি নিসর্গ-চিত্র আঁকেন। জলরঙে, ওয়াশ পদ্ধতিতে। 'দেশ'-পত্রিকার নিয়মিত সমালোচক শ্রী সন্দীপ সরকার তাতে আপত্তি জানালেন—প্রফেশনাল-আর্টিস্টের নাকি একক-প্রদর্শনী করা অনুচিত। ছবির গুণাগুণ নিয়ে মুক্তশূলী (free-lancer-এর বাংলা কী?)

যা-ইচ্ছে লিখতে পারেন ; কিন্তু প্রফেশনাল আর্টিস্ট মনের খেয়ালে ছবি আঁকলে বা পাঁচজনকে ডেকে তা দেখালে কেন তাঁকে শূলবিদ্ধ করা হবে, এটা বোঝা গেল না!

আর একটি উদাহরণ। সরকারি চারু বিদ্যালয়ের একজন অবসরপ্রাপ্ত অশীতিপর অধ্যাপক কৃষ্ণলাল দাস, সম্প্রতি শিশির মঞ্চে একটি একক প্রদর্শনী করেছিলেন। গত পাঁচ-সাত বছর ধরে ক্ষীণদৃষ্টি শিল্পী প্রায় দেড়শতটি রামায়ণের পট এঁকেছেন। উদ্দেশ্য—যারা রামায়ণ পড়তে পারে না, সেইসব নিরক্ষর অন্তেবাসী গ্রামীণ দর্শকদের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর মাধ্যমে ছবি দেখিয়ে রামায়ণের গল্প শোনানো। যেভাবে এককালে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে রামপট-যমপট-এর সচিত্র কাহিনী দেখানো ও গান গেয়ে শোনানো হত। জীবন-সায়াহ্নে শিল্পীর এই প্রচেষ্টায় তাঁর বহু শিষ্য, গুণমুগ্ধ এবং শিল্পবিশারদেরা (তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ফাদিকার, ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, সর্বশ্রী নারায়ণ চৌধুরী, ইন্দ্র দুগার, দ্বিজেন মৈত্র প্রভৃতি) প্রদর্শনীর উদ্বোধনী সভায় অধ্যাপক দাসকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন। নিরক্ষর গ্রামবাসীদের প্রতি এই পরিণত শিল্পীর আনন্দদানের প্রচেষ্টায়, একটি অবলুপ্তপ্রায় লোক-সংস্কৃতির ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করলেন। এই মুক্তশূলী সমালোচক, শ্রী সন্দীপ সরকার, 'দেশ' পত্রিকায় সে প্রচেষ্টার জন্য কোনো উৎসাহব্যঞ্জক বাক্য উচ্চারণ করলেন না। তাঁর সমালোচনা ছিল তীব্র ব্যঙ্গ এবং শ্লেষে ভরা। আমাদের সন্দেহ জাগল, শিল্পীকে সকলে বারেবারে 'অধ্যাপক' দাস বলায় ভুল করেছেন কি না ; কারণ সমালোচক জানালেন, "এককালে তিনি সরকারী চারুকারু বিদ্যালয়ে (তখনো মহাবিদ্যালয় হয়নি)-তে শিক্ষকতা করতেন।" উপসংহারে বলা হল,

> ভারতীয় মাত্র রস পাবেন। কারণ তাঁদের রক্তের মধ্যে রাম না জন্মাতেই রামায়ণ। সবসময়ে তা যদি আলেখ্য দর্শনের রস না হয় তাতেই বা কি যায় আসে! একজনকে দেখলাম, তিনি প্রতিটি পট দর্শন করে, চোখে জল নিয়ে নমস্কার করছেন করজোড়ে। কেষ্টবাবু ছবি এঁকে এমন সার্থকতা কামনা করেছিলেন। তিনি সিদ্ধকাম। যাঁর যে রকম সুকৃতি তাঁর সেই রকম সিদ্ধি। এক অশীতিপর বৃদ্ধ তার বেশি তো কিছু যাজ্ঞা করেন না।[২০]

কেমন করে জানলেন সমালোচক? আমাদের তো ধারণা হয়েছিল, অশীতিপর বৃদ্ধের আরও সামান্য কিছু যাজ্ঞা ছিল—অর্ধেকবয়সী '*দেশ*' সমালোচকের কাছে।একবিন্দু ভদ্রতা, একফোঁটা সৌজন্যবোধ। আঁতেলের চোখে আলেখ্য-দর্শনের নান্দনিক রস আর আনপড় ঈশ্বরবিশ্বাসী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভক্তিপূত আনন্দরস যে পৃথক বস্তু—ললিতকলায় দুটিই যে বরণীয়—এই প্রাথমিক শিল্পজ্ঞানটুকু পর্যন্ত নেই সমালোচকের!

গত বছর জানুয়ারিতে পারী-প্রবাসী শ্রীসম্বিত সেনগুপ্তের একটি একক প্রদর্শনী হল আকাদেমিতে। বিদেশে তিনি 'গ্রাফিক ডিজাইনার' হিসাবে সুবিখ্যাত। কলকাতার শিল্পপ্রেমিক তার কিছু নমুনা দেখল। কিন্তু কজন? অপরপক্ষে '*দেশ*'-পত্রিকার অগণিত পাঠক ঐ সমালোচকের কাছে পেল কিছু চটুল রসিকতা। সমালোচক তাঁর সমালোচনায় জানালেন একটি তথ্য : শংকরের একটি উপন্যাসকে চিত্ররূপ দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে, যার নায়িকা এক ফরাসী সুন্দরী আর নায়ক কবি সুব্রত রুদ্র !! সম্বিত সেনগুপ্তের ছবির সঙ্গে লেখক শংকর, কবি সুব্রত এবং ফরাসী সুন্দরীর কী সম্পর্ক তা অবশ্য মুক্তশূলী বলেননি। ভাষার চাপল্যে এবং রূপকের প্রাবল্যে হারিয়ে গেল প্রদর্শিত শিল্পবস্তুর পরিচয়, তার গুণাগুণ। রূপক-প্রেমিক সমালোচক

শুধু জানালেন প্রদর্শনীতে ছিল,

> কফি থেকে বিয়ার, সুপ থেকে ফ্রোজেন মিট। দেখলেই কেমন ক্ষুধাতৃষ্ণা বাড়তে থাকে। গার্গাতুয়ার মতো রাক্ষুসে ক্ষুধাতৃষ্ণা। কবিতার বই, নারীদেহের আশ্লেষ, নির্জনতা, পেয়ালা সবের (sic) ছবি দেখিয়ে বাংলা মতে আকাদেমির ফিস্ (sic) রোল আর চা খাওয়াচ্ছিলেন। আমরা ধন্য ধন্য এবং সাধু সাধু বলতে বলতে বাড়ি ফিরলাম।[২১]

দুর্ভাগ্য শিল্পীর! বহুদিন প্রবাসবাসের ফলে, এবং বিদেশে প্রদর্শনী করতে অভ্যস্ত হওয়ায় তাঁর হয়তো জানা ছিল না যে, কলকাতায় শিল্প-সমালোচক প্রদর্শনীতে আসেন শুধু দেখতে—কে কোথায় চোখের জলে ভেসে করজোড়ে নমস্কার করছে, কে কী খাচ্ছে! হয়তো সে জন্যই *দেশ*-সমালোচককে আকাদেমির ফিশ্ রোল—বিয়ার দূর-অস্ত—সহযোগে আপ্যায়ন করতে ভুলেছেন!

এই জাতের আত্মম্ভরী সমালোচকের পণ্ডিতম্মন্যতাই প্রলুব্ধ করে চ্যাটারটনকে—আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে; 'ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিনে' ঘোষিত হয় তরুণ কীটস্-এর মৃত্যুদণ্ড; জাঁ ভ্যাঁ মীগেরেকে করে তোলে প্রতিহিংসা-পরায়ণ। এদের প্রতিবন্ধকতা ডিঙিয়ে শিল্পীদের পক্ষে প্রতিষ্ঠা পাওয়া অনেক কঠিন, অন্তেবাসী জোট-নিরপক্ষ কোনো কথাসাহিত্যিকের চেয়ে।

বিষয়টা নিয়ে একবার আলোচনা হয়েছিল কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ীর সঙ্গে।

আমি বলেছিলাম, এখানেই 'লেখা'র অবৈধ সুযোগ, হ্যান্ডিক্যাপ—অনায়াসে সে 'রেখা'র সমালোচনা করতে পারে। করেও। নানান আর্ট-গ্যালারিতে যেসব ছবি প্রদর্শিত হয় পত্রপত্রিকার কলা-সমালোচকদল তার বাপান্ত করতে পারেন। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পায় না। অর্থাৎ কলা-সমালোচক কোনও ভুলত্রুটি করলে কার্টুনিস্ট তার পাল্টা সমালোচনা করতে পারেন না।

চণ্ডীবাবু বললেন, তা কেন? If Pen be mightier than Sword then Brush is mightier than Pen!

হেসে বলি, শুনতে ভালোই লাগলো, কিন্তু কথাটা প্রমাণ করতে পারেন?

—আলবাৎ!

—কী ভাবে? করুন!

—মুখে মুখে কেমন করে করব? এ সওয়ালের জবাব তো তুলির মুখে দেবার।

তাই দিয়েছিলেন চণ্ডীবাবু। ডাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর জবাব। কার্টুনে। পণ্ডিতম্মন্য কলাসমালোচকদের নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছেন কার্টুনিস্ট। তাঁর কার্টুনের ক্যাপশান: "কাগজের আর্ট-ক্রিটিকরা তোমার ছবির মর্ম বুঝবে তো"?

এবং সৌভাগ্য আমাদের। 'আল্‌তামিরা' চিত্রসমালোচকদের ছিল না 'কলকাত্তাইয়া' শিল্পসমালোচকের মতো 'গার্গাতুয়াপ্রতিম' রাক্ষুসে ক্ষুধাতৃষ্ণা। তাই আল্‌তামেরা গুহার ছবিগুলি আজও টিকে আছে। সে-আমলের দর্শক নিশ্চয়ই ক্ষুধাতৃষ্ণার তাড়নায় ধন্য ধন্য এবং সাধু সাধু বলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেনি। তারা ছবিই দেখত এবং দেখাত! বিয়ার তখনও পয়দা হয়নি।

পাত্র: আদিমতম শিল্পী; পাত্রী: তার মানসী; স্থান: আলতামেরা গুহা; কাল: বিশ্বকোষ দেখে নেবেন!

কাগজের আর্ট-ক্রিটিকরা তোমার ছবির মর্ম বুঝবে তো?

নিজের কথা কিছুটা বলি এবার:

দু-নৌকায় পা দিয়ে চলার প্রচেষ্টাটা প্রায় শৈশবকাল থেকে। লেখা আর রেখা আমার চোখে সেকালে নায়ক-নায়িকা ছিল না। দুজনেই আমার খেলার সাথী, বাল্যবান্ধবী। দুয়োরানী কেউ নয়, দুজনেই সুয়োরানী। তবে রেখার সঙ্গে মহব্বতের ইনকারটা পহিলে। সে বহুযুগ আগেকার কথা। দাদাজী তখনো 'অচ্ছুৎকন্যা'র সঙ্গে মহব্বতে মাতোয়ারা হননি। সব শিশুরই তাই হয়। অক্ষর-পরিচয়ের আগে ছবির সঙ্গে মিতালী।

শৈশবে-বাল্যে ছবি আঁকার হাতেখড়ি বাবার কাছে। বিচিত্র মানুষ ছিলেন তিনি। শিবপুরের এঞ্জিনিয়ার, বি·ই· পাশ করেন গত শতাব্দীর শেষাশেষি—রি-ইনফোর্সড কংক্রিট তখনো প্যারাম্বুলেটারে চেপে এঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে বেঈ-বেঈ যায়! রঙ-তুলি নিয়ে তাঁকে কখনো ছবি আঁকতে দেখিনি, তবে মনের ভাবপ্রকাশ করতে প্রায়ই কাগজে আঁকিবুকি টানতেন। তাঁর বাঁধা লব্জ্ ছিল: "ড্রইং ইজ দি য়ুনিভার্সাল ল্যাঙ্গোয়েজ অব এঞ্জিনিয়ার্স।"

তাই সবরকম প্রশ্নের জবাবই তিনি দিতেন চিত্রের মাধ্যমে—তা সে কোন পথনির্দেশই হ'ক অথবা হিটলার এবার কোন দেশ আক্রমণ করবে। তাঁর কাছেই শিখি 'পারস্পেকটিভ' কাকে বলে, 'ভ্যানিশিং পয়েন্টস্' এক-জোড়া কেন, অথবা পিঁপড়ে কেন 'ওয়র্মস্-আই ভিয়ু'-তে পণ্ডিতমশায়ের টিকিটা দেখতে পায় না।

ভর্তি হলাম গোলদীঘির ধারে হিন্দু স্কুলে। হপ্তায় একদিন ড্রইং ক্লাস। ড্রইং-স্যারের নামটা মনে নেই—ত্রিশের দশক—এতদিনে, একশ বছর পরমায়ু না হলে, তিনি নিশ্চয় স্বর্গে

গেছেন—ভারী ভালমানুষ। অমায়িক আত্মভোলা শিল্পী। ড্রইং-এ ফেল্লু মারলে ক্লাস প্রমোশন আটকায় না; ড্রইং-এর নম্বর টোটালে যোগ করাও হত না। ফলে সেটা ছিল এলেবেলে ক্লাস—'দুধভাত'! অধিকাংশের কাছে। তারা কাটাকুটি খেলত অথবা গোষ্ঠ-পাল, ব্র্যাডম্যান বা দেবিকারাণীর প্রতিভা মূল্যায়নে সময় কাটাতো। আমরা গুটি তিন-চার ছাত্র স্যারের কাছে ছবি-আঁকা শিখতাম।

মুশ্‌কিল হল এই যে, স্যার কী-জানি কী-করে আমার মধ্যে এক হবু-শিল্পীকে আবিষ্কার করে বসলেন। ফলে আমি ড্রইংখাতায় যা আঁকি উনি তা নিখুঁত করতে সবসময় বদ্ধপরিকর! এত 'ইরেজার' চালান যে, আমার-আঁকা মূল রেখাচিত্রটির গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। পরিবর্তে আবির্ভূত হয় সংশোধিত নতুন ছবি—স্যারের আঁকা! বাড়িতে সবাই আমার ড্রইংখাতা দেখে তারিফ করে, আর লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাই!

এই সময় একটা মটোর অ্যাকসিডেন্টে বাবা মারাত্মকভাবে আহত হন। প্রাণে বেঁচে যান বটে; কিন্তু কলকাতা ত্যাগ করে শেষ জীবন পশ্চিমের এক স্বাস্থ্যকর স্থানে অতিবাহিত করার সঙ্কল্প নিয়ে চিরতরে কলকাতা ছেড়ে ডিহিরী-অন-শোনে চলে যান।

মেজদি তখন থাকতেন আসানসোলে। জামাইবাবু ডাক্তার। সন্তানাদি তখনো হয়নি। আমি তাঁর সংসারে আশ্রয় নিলাম। ভর্তি হলাম আসানসোল ই· আই· আর স্কুলে। ক্লাস নাইনে।

সেখানে ড্রইং শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী রাধাচরণ বাগচী। অচিরেই তাঁর স্নেহধন্য হয়ে উঠি। তাঁর কাছে 'ওয়াশ' আর 'টেম্পারা' শিখেছি, জলরঙে। ক্লাসে নয়, বাড়িতে, ছুটির দিনে। ততদিনে কবিতা-গল্পও লিখছি সকালসন্ধ্যা।

স্যার তখন আঁকছেন মুগলশৈলীতে একটি দিলতোড় তসবির: 'নূরজাহাঁ আর জাহাঙ্গীরের কাশ্মীর যাত্রা'। বড় ছবি। ওয়াশ-এ। পাঁচ-সাতটা হাতি-ঘোড়া ছাড়া প্রায় শতখানেক পদাতিক—খোজাবাহিনী আর মুগল হারেম। এক ঝাঁক সুন্দরী—সব্বাই দুধে-আলতা! যেন সার বেঁধে কাননবালা—লীলা দেশাই—চন্দ্রাবতী—দেবিকারাণী—চিৎনীস!

মাঝখানে কমলহীরে: নূরজাহাঁ—জগতের আলো!

দেখে দেখে আর আশ মেটে না। রাতে ঘুমের মধ্যেও ফিরে আসে: নূরজাহাঁ! চল্লিশের দশকে কোন এক বছরে সেটি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় জলরঙ বিভাগে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল।

গুরুর উৎসাহে তাঁর চেলাও তখন জলরঙে আঁকছে একটা মনগড়া ছবি: 'অন্নপ্রাশন'!

গুটি-আষ্টেক চরিত্র। গ্রামের বাড়ির উঠোন। মামার কোলে খোকন-সোনা। মাথায় টোপর, টোবলা গাল। আর তাকে ঘিরে খোকনের বাবা-মা-দাদু-দিদা, মাসি-পিসি। ঐ সুন্দরী ছোট পিসিটি আমারই সমবয়সী—পনের-ষোলো। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি নূরজাহাঁর হুবহু নকলে। মুখখানি—বহু চেষ্টা করেও অমনটি হল না—তবে গায়ের রঙ অ্যাক্কেরে যাকে বলে 'দুধে-আলতা'। নূরজাহাঁ—বরাবর! চাইনীজ হোয়াইট, ক্রিমসন লেক আর ভার্মিলিয়নের নীট মিক্সচার!

বাগচী-স্যার ছবিখানি দেখলেন। কাছে থেকে, দূরে ধরে, ডানে হেলে, বাঁয়ে বেঁকে। শেষে বললেন, এ মেয়েটা কে রে, নারান? গেনিপিসি?

খোকাসোনার 'পিসি' ঠিকই, কিন্তু 'গেনি' কেন? কত মিষ্টি নামে ওকে স্বপ্নের মধ্যে ডাকি, স্যার কি ওর নাম 'জ্ঞানদা' দিতে চান নাকি? জানতে চাই: গেনিপিসি কে স্যার?

—সে কি রে? শরৎবাবুর *অরক্ষণীয়া* পড়িসনি? "গেনি পিতি থঙ থেজেচে!'

আমি নেই!

বাগচী-স্যার তাঁর তুলিটা চাইনীজ ইংক, 'বান্ট-সিয়েনা', 'সিপিয়া', না 'গাম্বোগ' কোন বাটিতে কবার চুবিয়ে নিলেন লক্ষ্য করিনি—একটি মোক্ষম পোঁচে আমার নায়িকা হয়ে গেল হাকুচ কালো!

দাঁতে দাঁত চেপে বলি, অ্যাতো কালো?

বাগচী-স্যার আমার মুখের উপর এক-জোড়া স্বপ্নালু চোখের দৃষ্টি মেলে বললেন, ছিঃ! পাড়ার লোকে বলে বলুক—কথাটা তুইও বল্‌লি, নারান? তুই না শিল্পী? বলবি: কৃষ্ণকলি!

কৃষ্ণকলি? তাহলে নূরজাহাঁকে ধরে আমিও যদি একটা রক্ষাকালীর বাচ্চা বানিয়ে দিই তাহলে স্যারের অবস্থা কেমন হয়? যখন উনি ঘরে থাকবেন না?

কিন্তু তা তো আর সম্ভবপর নয়। আমি মনের দুঃখ ভুলতে এমন একটি বিষয়বস্তু বেছে নিই যাতে স্যার 'রিপীট-শো' করতে না পারেন। আমার পরের ছবিখানি ছিল: 'যমুনাপুলিনে শ্রীরাধিকা'।

এবারেও স্যার ছবিখানি যত্ন নিয়ে দেখলেন। ডানে বেঁকে, বাঁয়ে হেলে। এবার আর উনি আপত্তি করতে পারেন না রাধিকার গাত্রবর্ণ বিষয়ে। গম্ভীর হয়ে বললেন, তোর মেজদির সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে একবার।

মফঃস্বল শহর। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অনেক নিবিড়। বাগচী-স্যার আমাদের বাড়িতে আসতেন। মেজদিদির সাথে ওঁর আলাপ আছে। আমি জানতে চাই, কেন স্যার?

—তাঁকে একটা হুঁসিয়ারি শুনিয়ে আসতে হবে। দু-দশ বছর পরে যখন ভাই-বৌ আনতে পাত্রী দেখতে যাবেন, তখন খেয়াল রাখা চাই: গায়ের রঙটা হতে হবে স্রেফ 'দুধে-আলতা'।

রাধামোহন বাগচী-স্যারের ঐ এক দোষ আঁকেন দুর্দান্ত, শেখান যত্ন নিয়ে, কিন্তু কথাগুলো গা-জ্বালানি!

পিতৃদেবের ঐ কথাটা যে কী নিদারুণ সত্য তা বুঝেছি বড় হয়ে—বারে বারে: 'চিত্রের ভাষা বিশ্বজনীন!'

চোখ থাকলেই ছবি দেখা যায়। শিল্পীর বক্তব্য বোঝা যায়। কিন্তু চোখ থাকলেই লেখকের বক্তব্য বোঝা যায় না। চাই ভাষাজ্ঞান।

একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি:

ঘটনাটি ঘটেছিল জার্মানিতে। কোন্ শহর তা মনে নেই। আমরা চার বন্ধুতে পায়ে হেঁটে গোটা শহরটা ঘুরব স্থির করেছি। চারজনের পকেটেই বিদেশীমুদ্রা বাড়ন্ত। স্থির হয়েছে মধ্যাহ্ন-আহার সারা হবে রুটি-মাখন, পটাটো চীপ্‌স্ আর বীয়রে। বীয়র ওখানে জলের চেয়ে সস্তা—মানে মিনার্‌ল্-ওয়াটার। চারবন্ধু ঢুকে পড়ি একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরস্-এ। জিনিসপত্র থরে থরে সাজানো। যা মন চায় উঠিয়ে নাও। তাই নেওয়া গেল। রুটি-মাখন-বীয়র আর আলুভাজা। সুবীর বল্‌লে গোটা-চারেক সেদ্ধ ডিম নিয়ে নিলে হত!

অসীম বলে, ডিম নিশ্চয় পাওয়া যাবে; কিন্তু সিদ্ধ-ডিম এখানে কোথায় পাব?

সুবীর জানালো, তাও নাকি এসব জায়গায় পাওয়া যায়। হট-কেস-এ রাখা থাকে।

এরপর আমাদের যৌথ প্রচেষ্টা শুরু হল। তন্নতন্ন করে খুঁজেও ডিমের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল

না। দোকানের তক্‌মা-আঁটা একটি সুন্দরী এসে অঙ্গভঙ্গি করে জানতে চায়, আমরা কী খুঁজছি। আমাদের আপ্রাণ চেষ্টায়—'এগ্, ডিম, অণ্ড, আণ্ডায়'—কাজ হল না। মেয়েটি আমাদের 'হাত-ঘুরু-ঘুরু-নাড়ু-দেব' মুদ্রায় আঁতি-পাতি খুঁজে অনেক কিছু দেখালো—আলু, টমেটো, আপেল, বেরি, ন্যাপথালিন, টেনিস বল, মায় ইলেক্‌ট্রিক বাল্ব!

আমি ততক্ষণ মনে-মনে বাগচী-স্যারকে স্মরণ করে আমার স্কেচ-খাতায় এঁকে ফেলেছি একটি স্কেচ।

সেটা মেলে ধরি ওর নাকের ডগায়।

মুহূর্তেই সমঝে নিল মেয়েটি। এক গাল হেসে এনে দিল সিদ্ধ ডিম।

আর একবার। এই তো সেদিন। চুরাশি সালে।

আমি তখন ডেরা-ডাণ্ডা গেড়েছি ওয়ালনাট ক্রীক-এ, সানফ্রান্সিস্কোর শহরতলীতে। বড়কন্যা বুলবুলের বাড়িতে। লস্ অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের ঠিক পরে একটা ব্যাপার হল। সান্‌ফ্রান্সিস্কো চিড়িয়াখানায় মাত্র সতের দিনের মেয়াদে এলেন এক জোড়া 'জায়েন্ট পাণ্ডা'।

বিচিত্র না-মানুষ। স্তন্যপায়ী। অনেকটা 'টেডিবেয়ার'-এর মতো দেখতে। দুনিয়ার দুর্লভতম জীবদের অন্যতম। মহাচীনের এক বিশেষ অরণ্যে এদের দেখতে পাওয়া যায়। জীববিজ্ঞানীদের হিসাবে সারা পৃথিবীতে জীবিত জায়েন্ট-পাণ্ডার সংখ্যা হাজারের কম। চীনের বাইরে সারা পৃথিবীতে আছে সতেরটি (1984-এ প্রকাশিত তথ্য)। এর বাজারদর নেই—কারণ সতেরটিই চীন-সরকারের দান। 'ওয়াইল্ডলাইফ এডুকেশন লিমিটেড'-এর পত্রিকার ডক্টর স্ক্যালার বলছেন "It is absolutely impossible for anyone to buy a giant panda for *any* amount of money. Even if you offered to pay millions of dollars, the Chinese would not sell one to you."

সে যাই হোক, লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক উপলক্ষ্যে চীন-সরকার এক জোড়া জায়েন্ট পাণ্ডাকে মাসখানেকের জন্য ঐ শহরের চিড়িয়াখানায় পাঠালেন। অলিম্পিক শেষে চীনা-প্রতিযোগীরা যখন দেশে ফিরে যাচ্ছে তখন মার্কিন সরকার চীনকে অনুরোধ করলেন পাণ্ডা-জোড়ার প্রত্যাবর্তন মাস দুয়েক পিছিয়ে দিতে। যাতে আমেরিকার আরও চারটি শহরের চিড়িয়াখানায় তাদের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়—নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, সানফ্রান্সিস্কো আর ডেট্রয়েট। চীন সরকার রাজী হলেন। মাত্র সতের দিনের মেয়াদে দুই ভি· আই· পি এলেন ফ্রিস্কো-জুতে!

তার মাসখানেক আগে থেকেই খবরের কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে বিজ্ঞপ্তি, জায়েন্ট পান্ডার বিষয়ে নানান ছবি ও প্রবন্ধ। অমিত—আমার জামাই—এক রবিবার সকালে আমাদের নিয়ে গেল। উরে ব্বাবা। গাড়ি পার্ক করতে হল চিড়িয়াখানা থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে। শোনা গেল ভোর রাত থেকে লোকে লাইন দিয়েছে। অনেক মেহন্নত করে চিড়িয়াখানায় ঢোকা গেল—বিশেষ অতিথির জন্য যে কিউ-সরীসৃপ তার দৈর্ঘ্য দেখে বুঝতে পারি সন্ধ্যার পূর্বে, অর্থাৎ চিড়িয়াখানা বন্ধ হবার আগে ঐ বিশেষ খাঁচার ভিতর ঢোকাই যাবে না। অমিতও শিবপুরের বি· ই·। কিউ-সরীসৃপের দৈর্ঘ্য ও গতর-নাড়ানো গতিবেগের কী সব হিসাব কষ্‌ল পকেট ক্যালকুলেটারে। তারপর বলল, না, আমরা যদি সারাটা দিন লাইনে খাড়া থাকি তবে গেট বন্ধ হবার আধঘণ্টা আগেই ভিতরে ঢুকতে পারব।

আমি তাতে রাজী হতে পারি না। সারাটি দিন কিউ-এর ঠ্যাঙ জোড়া আঁকড়ে পড়ে থাকব কেন? অ্যালফাবেটে Q-ছাড়া আরও তো পঁচিশটা অক্ষর! এই চিড়িয়াখানায় এমন অনেক-অনেক না-মানুষ আছে যাদের আমি চর্মচক্ষে এই সওয়া-তিনকুড়ি বছরের জীবনে দেখিনি। আছে: পোলার বেয়ার, গ্রিজ্‌লি বেয়ার, কোডিয়াক, বৃহত্তম রোডেন্ট ক্যাপিবারা, আর্টিক ফক্স, ওরাংওটাং, স্পাইডার মাংকি, লিংক্স, পেঙ্গুইন, রাস্কেল—থুড়ি, 'রাস্কেল' ওর নাম নয়, জন্তুটার নাম: রাকুন। এদের কাউকেই দেখিনি। সুতরাং সেদিন জায়েন্ট পান্ডা দেখার আশা জলাঞ্জলি দিয়ে এইসব অদেখা না-মানুষদের শিকার করা গেল। অমিত করল তার ক্যামেরায়, আমি আমার স্কেচ বুকে।

ফেরার পথে বলি, এ জন্যই মার্কিন মুলুককে বলা হয় 'অ্যান্টিপোডস্'দের দেশ, সবই উল্টো এদের!

রিন্টি জানতে চায় 'অ্যান্টিপোডস্' কাকে বলে।

বলি, 'শির-পা' মানুষ। ভারতবর্ষের মানুষ যেদিকে পা-করে হাঁটে এদেশের মানুষ হাঁটে তার উল্টো দিকে পা করে। রিন্টি বলে, আই ডোন্ট ফলো!

ওর মা বলে, সেটা বুঝিয়ে দিতে গেলে কাগজ পেনসিল লাগবে। বাড়ি ফিরে বুঝিয়ে দেব। আমাকে বলে, হঠাৎ এদেশের বিপরীত-বুদ্ধি কী দেখলে? কলকাতার চিড়িয়াখানায় এক জোড়া জায়েন্ট পান্ডা দিন পনেরর জন্য অতিথি হলে এরকম ভিড় হত না বলতে চাও?

আমি বলি, কী বলছিস্? এ যে আমার নিজে চোখে দেখা। এখানে দেখলাম, এক জোড়া জায়েন্ট পান্ডার পিছনে লেগেছে কয়েক হাজার দর্শনার্থী; আর ভারতে কাশী, পুরী, বদ্রীনাথ যে-কোন মন্দিরে যাস্ দেখবি এক জোড়া দর্শনার্থীর পিছনে জুটেছে কয়েক হাজার ভীমকায় জায়েন্ট পাণ্ডা!

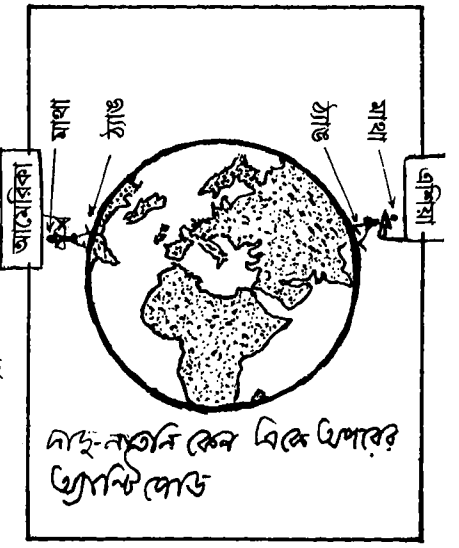

তাঁদের দেখা পেলাম তিন-দিন পর। মঙ্গলে-উষা-বুধে-পা—ওয়ালনাট ক্রীক থেকে মেট্রোরেলে রওনা দিয়েছি ভোর-ভোর। চিড়িয়াখানার গেট-এ এসে যখন পৌঁছানো গেল তখন বেলা দশটা। কিন্তু তার পূর্বেই কয়েক শো লোক লাইনে সামিল। আমিও দাঁড়িয়ে পড়ি। আমার সামনে কোনও মেয়ে-স্কুলের জনা-বিশেক ছাত্রী আর তাদের দিদিমণি। আন্দাজ হল ঘণ্টা দুই-এর মধ্যেই পান্ডা-খাঁচায় পৌঁছে যাব। লাইনে শুঁতোশুতি, ঠেলাঠেলি নেই। কর্তৃপক্ষ তক্‌মা-আঁকা তদারকির ব্যবস্থা করেছেন। না-করলেও ক্ষতি ছিল না। কলকাতায় রোদ্যাঁ ভাস্কর্যের প্রবেশদ্বারেও এমন শান্তশিষ্ট ভিড় জমতে দেখেছি, যদিও সে কিউ অনেক ছোট। তবে ভোরবেলা বাড়ি থেকে রওনা হয়েছি, এতক্ষণে একটু ইউরিনালে যাওয়া দরকার। লাইনে আমার সামনে মেয়ে-স্কুলের দিদিমণি, তাঁকে বলে আমি টয়লেটের দিকে যাই। ফিরে এসে একটা খেয়াল চাপল। লাইনে পুনঃসামিল না হয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কিউ-সরীসৃপের স্কেচ আঁকতে থাকি আমার খাতায়। একটা স্মৃতিচিহ্ন। যা আশঙ্কা করেছিলাম—একটু পরেই দু-একজনের নজর পড়ল। একটি মেয়ে সাহস করে এগিয়ে এসে দেখতে চাইল। দেখালাম। তারপর অনেকেই এল। দেখল। আলাপ হয়ে গেল। আমি 'শিরপা – দেশের মানুষ—ক্যালকাটার—একথা শুনে ওরা উৎসাহিত হল। নিজেদের মধ্যে কী-সব শলা-পরামর্শ করে এগিয়ে গেল তক্‌মাধারীর কাছে, মানে তদারককারী গার্ডের কাছে। লোকটা ঘনিয়ে এসে বললে, 'ইয়েস, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু, হানি?'

বলতেই হবে। গার্ড চল্লিশের কোটায়। আর স্কুলের ছাত্রীরা নবোদ্ভিন্নযৌবনা। তখন বুঝতে পারিনি, পরে বুঝেছি, ছাত্রীরা আমার হয়ে সুপারিশ করেছিল—গ্র্যান্ড-পা আসলে শির-পা! অ্যান্টিপোডা—ক্যালকাটার মানুষ! সারাটা পৃথিবী বেষ্টন করে একশ আশি ডিগ্রি এসেছে। থাকবে হয়তো দু-চার দিন। লাইনের আর সবাই মার্কিন। গ্র্যান্ড-পাকে স্পেশাল-ফেবার দেখানো উচিত।

আমার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই আমার পাতানো নাতনির দল এটা করেছে। গার্ড এগিয়ে এল। বললে, হাঈ! তুমি ক্যালকাটা থেকে আসছ? তোমার স্কেচখাতাখানা একবার দেখতে পারি?

আপত্তি কী? খাতাখানা হস্তান্তরিত করি। উল্টে-পাল্টে দেখল। বনফুল, আশাপূর্ণা, জরাসন্ধ কাউকেই চিনতে পারল না—আমার আঁকার দোষে নয়, নামগুলি ছবির তলায় বঙ্গভাষায় লেখা ছিল—যেহেতু 'লেখা' একশ আশি-ডিগ্রি পাক মারতে পারেনি। কিন্তু দর্শনমাত্র চিনতে পারল শেষ দিকের কখানি পাতায় রোব্বারে-আঁকা পেঙ্গুইন, ক্যানবারা, পোলার বেয়ারদের।

জানতে চাইল, লাস্ট সান্ডের তারিখ দেখছি?

—হ্যাঁ, সেদিন এসেছিলাম। পান্ডা দেখার সুযোগ হয়নি বলে আজ সকাল-সকাল এসেছি!

গার্ড বললে, লুক হিয়ার স্যার, এই স্কুলের মেয়েরা আমার কাছে অ্যাপীল করেছে তোমাকে স্পেশাল ফেবার দেখাতে। যেহেতু তুমি অনেক দূর থেকে আসছ; বাট···

আমি বাধা দিয়ে বলি, ওয়েল, আমি তো কোনও স্পেশাল ফেবার চাইনি?

—তা চাওনি। কিন্তু মেয়েরা যা বলছে তার পিছনেও যুক্তি আছে। আমি আইন না ভেঙেও তোমাকে সামান্য সাহায্য করতে পারি। আর তাই আমি করব, একটি শর্তে। তুমি লাইন থেকে বেরিয়ে এস। দু-ঘণ্টা ধরে এ চিড়িয়াখানায় যথেচ্ছ ভ্রমণ করতে পার। দু-ঘণ্টা পরে লাইনে

ফিরে এস, মানে যে-সময় তোমার গেট-এ পৌঁছানোর কথা। তখন এই মেয়েদের দলের সঙ্গে তোমাকে আমি ভিতরে ঢুকিয়ে দেব।

ভয়ে ভয়ে বলি, কিন্তু শর্তটা কী?

—এই দু-ঘণ্টায় তুমি যে স্কেচগুলি আঁকবে তা আমাকে দেখাতে হবে!

চণ্ডী লাহিড়ী কিছু ভুল বলেননি: The painter's brush is mightier than either the pen or the poniard!

হ্যাঁ, আমার স্কেচখাতায় বনফুল, আশাপূর্ণা, জরাসন্ধ, সুনীতি চাটুজ্জে, তেনজিং নোরকের স্কেচ আছে। অধিকাংশই অটোগ্রাফড্। সাহস করে এতদিন আপনাদের সামনে পেশ করতে পারিনি। সাবধানতা যতটুকু নেবার যথারীতি নিয়েছি; অর্থাৎ অটোগ্রাফ যেখানে সংগ্রহ করতে

পারিনি সেখানে নিজেই 'মডেল'-এর নামটি লিখে দিয়েছি—যাতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্কেচ দেখে আপনারা না বলেন, 'রবিঠাকুরের ছবিটা চেনা যাচ্ছে না!' তবু এতদিন তা প্রকাশ করিনি। কারণ কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছিল: "এর ফল ভাল হবে না।" সেই ভয়ে।

এক সময় কার্টুনও খুব এঁকেছি। দীপ্তেন সান্যাল আমার চেয়ে বয়সে দু-তিন বছরের

বড়—কিন্তু বন্ধুস্থানীয়। তার *অচলপত্রে* এককালে 'লেখা-রেখা' দু-তরফাই যোগান দিয়েছি। কোনটাই স্বনামে নয়। তখন সরকারী চাকরীতে সদ্য ঢুকেছি, স্বনামে লেখার অনুমতি পাইনি। 'বিকর্ণ' ছদ্মনামও গ্রহণ করা হয়নি। *অচলপত্রে* একটি বিশেষ বিভাগ ছিল—'তিনটে-ছটা-নটা'। সদ্যমুক্ত বাংলা চলচ্চিত্রের সে এক যূপকাষ্ঠ। কামারের খাঁড়াখানা কখন কোন বারিন্দিরের হাতে ঝলসে উঠ্‌ত তা টের পাওয়া যেত না।

দু-একটি রসরচনা অথবা কার্টুনে 'বাস্তুঘুঘু' এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলাম। এ নামটি দীপ্তেনই দিয়েছিল আমাকে। বলেছিল, "তুমি বাপু বাস্তুকার' নও। একটি বাস্তুঘুঘু'!"

তারপর একেবারে হঠাৎই রাজনৈতিক কার্টুন আঁকা ছেড়ে দিই। বস্তুত সব জাতের কার্টুনই। তার পিছনে আছে ছোট্ট একটি ইতিহাস:

পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে। কোন একটি পূজা-সংখ্যায় 'বিকর্ণ' ছদ্মনামে শিল্পীর একটি ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়—'ফুলপেজ'। পাঁচ-সাতটা ছোট ছোট কার্টুন—মূল শিরোনাম: 'রবীন্দ্রসাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রয়োগ।'

কপি নেই। পত্রিকার নামটাও মনে নেই। হয় *অচলপত্র* অথবা *পশ্চিমবঙ্গ*। একটি কার্টুন ছিল: "ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী, অন্ন যেতেছে লুটিয়া" (পশ্চিমবঙ্গ থেকে কয়লা একই দামে সর্বত্র যখন রপ্তানি শুরুর প্রস্তাব হয়) একটি ছিল: তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে (তাতে নেহেরুজীর ছবি ছিল এটুকু মনে আছে)। তৃতীয় একটি: "ব্যাধির চেয়ে আধিই হল বড়" (অপারেশন টেবিলে শীর্ণা বঙ্গজননী, সার্জেন স্বয়ং বিধানচন্দ্র)।

ব্যাণ্ডো-সাহেব—তাঁকে যদি চেনেন তাহলে আর পরিচয় দিই কেন? না চেনেন তো বলি আমার শুভানুধ্যায়ী পিতৃপ্রতিম এক তদানীন্তন সরকারী স্তম্ভ—আমাকে আড়ালে ঢেকে ধমক দেন। তারপর থেকে আমি তো না-ই, মায় বিকর্ণও দীর্ঘদিন আর রাজনৈতিক কার্টুন আঁকেনি।

তারপর চাকরি-জীবনের শেষাশেষি একবার আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। মুক্তির আনন্দে। *চীন-ভারত লংমার্চ* বইটি লেখার পরে। শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাঁধের উপর থেকে এমার্জেন্সি-নামক সিন্ধুবাদ যেদিন নেমে গেল। বলাবাহুল্য ততদিনে চীফ-এঞ্জিনিয়ার ব্যাণ্ডো-সাহেব অবসর নিয়েছেন। তিনদশক পরে একই ক্যাপশান-নির্ভর একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকে ফেলি: 'রবীন্দ্রকাব্যের সাম্প্রতিক প্রয়োগ'!

সবই বদলে গেছে—বিধানচন্দ্রের পরিবর্তে এসেছেন ইন্দিরাজী, তাই বাঙলা-মায়ের বদলে এসেছেন ভারতমাতা, যুবক শিল্পীও রিটায়ার মেন্টের দ্বারদেশে। যা বদল'য়নি তা ক্যাপশন তথা রসঃ 'ভারতবর্ষের সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে।'

তবে লেখায় যখনই হালে পানি পাইনি অসঙ্কোচে হাজির হয়েছি রেখার দ্বারে। *নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা*-য় কাহিনীর খাতিরে একটা 'ডুডেকাহেড্রন'-কে আমদানি করতে হয়েছিল। ভাষার মাধ্যমে সেটাকে ধরতে চাইলাম—"ডুয়ো-ডেকাহেড্রন হচ্ছে এমন একটি সুষম সমঘনক যার দ্বাদশটি সম-আয়তনের তল, প্রত্যেকটিই সমবাহুর পঞ্চভুজ।" পড়ে, নিজেই কিছু বুঝতে পারি না। কলমটা খাপবন্ধ করে 'ক্রো-কুইল'টার শরণ নিতে হল ফলে। 'দণ্ডকশবরীর' মুরিয়া আদিবাসীদের লৌকিক দেবতা—আঙ্গোপেন, কুরুংতুল্লা, ঝুলা মাঈ; ওদের ব্যবহৃত অলঙ্কার—গুণ্ডা, কারিণ, বাণ্ডাল, গুডা; অথবা বাদ্যযন্ত্র—গোগা ঢোল, ধুশীর, পারাং, মান্দ্রি, পিটার্কো প্রভৃতিকে বর্ণনা করার চেয়ে এঁকে দেখানো সহজ। লেখক-পাঠক উভয় তরফেই। তাই যখনই প্রয়োজন বোধ করেছি তখনই লেখার সঙ্গে রেখার আশ্রয় নিয়েছি।

রবীন্দ্রকাব্যের সাম্প্রতিক

'জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।'

'কাদের কণ্ঠে গগনমন্থে নিবিড় নিশীথ টুটে'

'হোথা বারবার বাদশজা'-দীর
তন্দ্রা মেতেছে ছুটে।'

প্রয়োগ

৩

'ব্যাধির চেয়ে আধিই হল বড়!'

'ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী অন্ন যেতেছে লুটিয়া!'

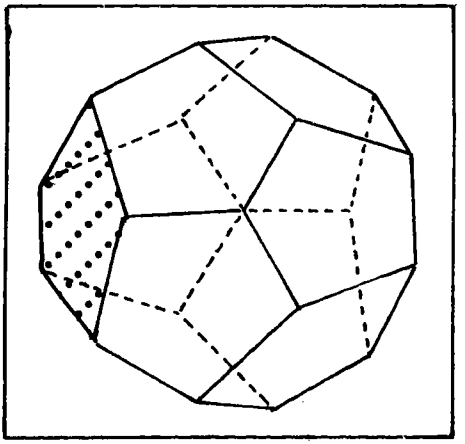

ডুডেকাহেড্রন

চিত্রকর হিসাবে নিজের সীমিত ক্ষমতার জন্য কোনো সঙ্কোচবোধ করিনি। এদিক থেকে আমাকে ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক-লেখক জর্জ গ্যামো। তাঁর 'One, Two, Three...Infinity' বিজ্ঞানশিক্ষার্থীর অবশ্যপাঠ্য। লক্ষ লক্ষ নয়, 'মিলিয়ানের' গুণিতকে সে বইয়ের বিক্রি। প্রকাশক কিন্তু কোনো পেশাদার শিল্পীকে দিয়ে ছবি আঁকাননি; পাণ্ডুলিপির সঙ্গে গ্যামো যে স্কেচ এঁকেছিলেন তা থেকেই ব্লক বানিয়েছিলেন। কারণ সেখানে আলেখ্য নন্দন-তত্ত্বের রস পরিবেশনের জন্য পরিবেশিত নয়, বিষয়বস্তুটাকে বুঝতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সন্নিবেশিত।

শিল্প-সম্বন্ধীয় গ্রন্থেও স্কেচ এঁকেছি—বিষয়বস্তুটাকে যখন কোনো চিত্রকল্পের মাধ্যমে বোঝানো সহজ হবে মনে হয়েছে। বিশেষ, যেখানে ভাষা হালে পানি পায় না। যেমন ধরুন *কলিঙ্গের দেব-দেউলে* বলতে চেয়েছিলাম—উড়িষ্যার বড়-দেউল বা বিমানের পাশাপাশি জমমোহনটি যেন বরকনে। 'ঝাম্পান' সিংহটি যেন নববধূর প্রসারিত হাত—দুজনে যেন কুশণ্ডিকায় যৌথভাবে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছে। মনে হল, লেখায় এ বক্তব্যটা যতটা পরিষ্কার হবে তার চেয়ে অনেক সহজে বোঝানো যাবে রেখার আশ্রয় নিলে—তা সে যতই কাঁচাহাতের আঁকা হ'ক।

আমার *অপরূপা-অজন্তা* গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ পড়ে আচার্য সুনীতিকুমার আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠান। পরামর্শ দেন, দ্বিতীয় সংস্করণে আমি যেন আর কয়েকটি অধুনা-লুপ্ত অনবদ্য প্রাচীর-চিত্রের রৈখিক অনুলিপি করে দিই। বস্তুত সেইসব দুর্লভ চিত্র সরবরাহ করে

তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন। এইসব কারণে আমার কেমন যেন একটা ধারণা হয়েছিল—নিজের রচনা সচিত্র করা আমার পক্ষে কোনো পাপ কাজ নয়। অন্তত এজন্য আমাকে কেউ শাসাবে না: 'এর ফল ভাল হবে না কিন্তু।'

সম্প্রতি তেমনই একটি ঘটনা ঘটেছে।

আমার লেখা একটি শিল্প-সম্বন্ধীয় বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল *আনন্দবাজারে*। সমালোচকের মতে এ-গ্রন্থে কোথায় কোথায় দোষত্রুটি ঘটেছে তা সবিস্তারে জানিয়েছেন সমালোচক, শ্রী সন্দীপ সরকার। সে প্রসঙ্গ আমি আদৌ উত্থাপন করব না। কারণ লেখকের কাছে সমালোচক হচ্ছেন সীজারের পত্নী; তাঁর 'সতীত্ব' সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা সৌজন্যে বারণ। কিন্তু আমার বর্তমান নিবন্ধের সঙ্গে ওঁর উপসংহারটি প্রাসঙ্গিক বলে এটুকু উদ্ধৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছি। সন্দীপবাবু সমালোচনার উপসংহারটি টেনেছেন এইভাবে,

> নারায়ণ সান্যালের আর একটি দুর্বলতা চিত্রকর হিসাবে নিজেকে জাহির করা। সুন্দর মিথুনমূর্তি তাঁর হাতে পড়ে এমনই আড়ষ্ট ভঙ্গি ধরেছে যে, তাতে গ্রন্থের মূল্য কমেছে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর হিসাবে সাফল্য তারাশংকর, বনফুল থেকে নারায়ণ সান্যাল পর্যন্ত নানা সামর্থ্যের লেখককে শিল্পকলায় অনুপ্রাণিত করেছে; কিন্তু ফল তেমন ভাল হয়নি।

যে গ্রন্থটির সমালোচনা শ্রীসরকার করেছিলেন তার নামোল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, তবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সেটি আমি ইংরেজি ভাষায় লিখেছিলাম। 'নাভানা', 1984-এ সেটি প্রকাশ করেন। তার ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম

> I owe an apology to my readers for the pen-and-ink sketches. I am fully conscious of my limitations as an artist; yet I preferred to incorporate my sketches in lieu of photo-blocks, to reduce the cost. My sketches may please be considered indicatory to trace good photographic reproductions in standard works, if not the originals on the temple façades.

নারায়ণ সান্যাল লেখক হিসাবে ব্যর্থ হবার পর এতদিনে চিত্রকর হিসাবে নিজেকে জাহির করে প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশী—এ-কথা যদি গ্রন্থের ঐ ভূমিকা পড়ে *আনন্দবাজারের* পুস্তক-সমালোচনা-বিভাগের সমালোচকের মনে হয়ে থাকে তবে তিনি তা হাজার বার লিখতে পারেন; কিন্তু তারাশঙ্কর-বনফুলও কি কথাসাহিত্যিক হিসাবে পাত্তা না পেয়ে বুড়ো বয়সে রবিঠাকুরটি সাজতে চেয়েছিলেন? ওঁরা তো নিজেদের গ্রন্থে কোনো অলঙ্করণ করেননি। হয়ত তাঁদের গুণগ্রাহীরা পরিণতবয়স্ক কথাসাহিত্যিকের শেষবয়সের খেয়ালখুশিগুলি সাজিয়ে ঘরোয়া প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। তাতে কার পাকা 'ফলে' পোকা ধরেছে? সন্দীপবাবুর? কোন্ সুবাদে? সাহিত্যিক আপন খেয়ালে ছবি আঁকতে পারবেন না এটা শিবঠাকুরের দেশের কোন্ আইন? দেবীপ্রসাদ, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিৎ, কমল মজুমদার, পূর্ণেন্দু পত্রী, পরিতোষ সেনেরা কি তাহলে অন্যায় করেছেন? সেক্ষেত্রে তো সুনীল গাঙ্গুলীর 'বুধসন্ধ্যা'-য় অভিনয় করার 'ফল' খারাপ হবে অভিনয় শিল্পের; বুদ্ধদেব গুহ আসরে গান ধরলে ফল খারাপ হবে সঙ্গীতকলার। এবং তাহলে ছবিটা আঁকবে কে? প্রফেশনাল আর্টিস্ট নয়, অশীতিপর শিল্পশিক্ষক নয়, পরিণতবয়স্ক কথাসাহিত্যিকেরা খেয়ালখুশিতেও নয়—তাহলে কে? শুধু গার্গাতুয়ার মতো ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর বিশেষ সমালোচকের প্রসাদধন্য বিশেষ একদল বশংবদ?

একবার মার্কিন মুলুকের জ্ঞানীগুণী পণ্ডিতেরা আইনস্টাইনের একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। উদ্বোধনী অর্কেস্ট্রা বাজাতে এলেন এক বিশ্ববিশ্রুত বেহালাবাদক। সঙ্গীতজগতের বাইরে তিনি নাকি তিনটি বস্তুকে সনাক্ত করতে পারতেন—নিজের গাড়ি, নিজের স্ত্রী এবং নিজের পুড্‌ল্‌।

বক্তিমে-টক্তিমে মিটে গেলে আইনস্টাইন হঠাৎ উদ্যোক্তাদের বলে বসলেন, আপনাদের যদি সময় থাকে তাহলে আমি সবাইকে একটু বেহালা বাজিয়ে শোনাতে চাই।

সবাই তো উৎসাহে লাফিয়ে ওঠে। আঁক-কষার ফাঁকে ফাঁকে উনি যে মাঝে মাঝে সখ করে বেহালা বাজাতেন এ-কথা কে না জানে? আইনস্টাইন উঠে এলেন মঞ্চে। মিনিট-দশেক মনের আনন্দে বেহালা বাজিয়ে যখন থামলেন তখন প্রেক্ষাগৃহ ফেটে পড়ছে করতালি-ধ্বনিতে। আর বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ-বিজ্ঞানীটি বারে বারে মাজা ভেঙে 'কার্টসি-বাও' করছেন।

কাহিনীর 'ক্লাইম্যাক্স' তার একটু পরে।

যখন বিশ্ববিশ্রুত বেহালা-বাদককে বিদায় জানান হল। তিনি অনুষ্ঠান সভাপতির কর্ণমূলে গোপনে নিবেদন করলেন —ওঁর নামটা আমি এর আগেও শুনেছি আমার স্ত্রীর মুখে···ঐ যে কী যেন নাম? হ্যাঁ···আইনস্টাইন। কিন্তু এ-কথাও বলব মশাই, আপনারা অহেতুক ঐ ভদ্রলোককে মাথায় তুলে নাচানাচি করছেন। এরকম একটা বেধড়ক্কা সম্বর্ধনা আয়োজনের আগে বেহালা-বাজানো ব্যাপারটি যারা বোঝে তাদের মতামত নেওয়া উচিত ছিল আপনাদের। এর 'ফল' কখনো ভাল হয় না, বুঝেছেন? ওঁর চেয়ে আমার অনেক শিষ্যও ভাল বেহালা বাজাতে পারে।'

সন্দীপ সরকার যদি বলতে চেয়ে থাকেন—তারাশংকর অথবা বনফুলকে নিয়ে আমরা এতদিন অহেতুক নাচানাচি করেছি, ছবি-আঁকা-টাকা যারা বোঝে তাদের মতামত নেওয়া উচিত ছিল আমাদের, এর 'ফল' কখনো ভালো হয় না, কারণ তারাশঙ্কর, বনফুলের চেয়ে সন্দীপবাবুর বংশবদ অনেক শিল্পী আরো ভালো ছবি আঁকতে পারেন—তাহলে অবশ্য আমাদের কিছু বলার নেই।

রেখা আর লেখার উৎস যে এক এবং অভিন্ন, এই তত্ত্বটা আপনাদের বুঝিয়ে দেবার আপ্রাণ চেষ্টায় এতগুলো পাতা লিখে গেছি। বুঝিয়ে বলতে চেয়েছি—"বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে

অর্থাৎ কি না লাগ্‌ছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে—গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কী-করে, রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।" তা সত্ত্বেও যদি না বুঝে থাকেন তাহলে দোষ আমার ভাগ্যের, অথবা হাতযশের ; কিম্বা "বুঝতে হলে" ইয়ে'লাগে, বলেছিলাম তখুনি।"

কিন্তু লেখার মাধ্যমে যে তত্ত্বকথাটা অধম লেখক এত চেষ্টাতেও বোঝাতে পারেনি চণ্ডী লাহিড়ী 'প্রাঞ্জল' রেখাচিত্রে কি সেটা শিরোনামায় 'প্রাণ জল' করে মুহূর্তে বোঝাতে পারেননি দোয়াত উলটে ?

॥ তথ্যসূত্র ও নির্দেশিকা ॥

(১) Naturalis Historia, Vol. XXXV, P.2, 11

(২) *'চীন-ভারত লঙমার্চ'*, নারায়ণ সান্যাল, নবপত্র প্রকাশন, চতুর্থ মুদ্রণ, পৃঃ 95

(৩) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

(৪) *'Guinness Book of Records'*

(৫) 'একটি উজ্জ্বল প্রদর্শনী', প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, *দেশ*, 31.3.84. পৃঃ 77.

(৬) 'উইলিয়াম ব্লেক : ছবিতে কবিতা' ; শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ *'শতভিষা'* ॥ রজত জয়ন্তী বর্ষ 1976

(৭) শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর লেখককে লেখা ব্যক্তিগত চিঠি

(৮) *'The Last Two Million Years'*, The Reader's Digest, P 151

(৯) *'History of World Art'*, 'Miniature & Illustration '

(১০) *'Ibid'* Jean Porcher, Vol X, P 124

(১১) *'পালযুগের চিত্রকলা'*, সরসী কুমার সরস্বতী, আনন্দ পাবলিশার্স

(১২) *'যুগে যুগে ভারতশিল্প'*, শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, 1970 পৃঃ 100

(১৩) ঐ· পৃঃ 91

(১৪) *'History of World Art'*, Cartoon

(১৫) *'লুথার, চৈতন্যদেব ও কার্টুনের পাঁচশ বছর'*, শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী

(১৬) *'স্বাধীনতা আন্দোলনে কার্টুন'*, শ্রীকমল সরকার, ঐ পৃঃ 34

(১৭) *The Indian Struggle , Subhas Chandra Bose*

(১৮) *'বটতলার ছাপা ও ছবি'*, শ্রীসুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৪

(১৯) শ্রীচণ্ডী লাহিড়ীর ব্যক্তিগত পত্র, লেখককে

(২০) *দেশ*, ৬·৪·১৯৮৪, 'রামায়ণী কথা' শ্রীসন্দীপ সরকার, পৃঃ 79

(২১) *দেশ*, ৩১·৩·১৯৮৪, 'মসিয়ুর 'সম্বিত স্তম্ভিত', শ্রীসন্দীপ সরকার, পৃঃ 77

কথাসাহিত্যে ঐতিহাসিক রস

আমাদের অলঙ্কারে নয়টি মূলরসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি মিশ্ররস আছে অলঙ্কারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই। সেই সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে 'ঐতিহাসিক রস' নাম দেওয়া যাইতে পারে।[১]

রবীন্দ্রনাথের মতে ঐ 'ঐতিহাসিক রস' থেকেই 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর জন্ম। আমরা বলি, তা তো বটেই; কিন্তু 'ঐতিহাসিক রস'-এর প্রভাবে সাহিত্যের নানারকম ভাবে বংশবৃদ্ধি ঘটে থাকে, রবীন্দ্রশাস্ত্রে 'তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই।' স্বাভাবিক হেতুতে। রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধটির নাম ছিল 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'; আলোচ্য বিষয়ের চৌহদ্দিতেই তিনি আলোচনা সীমাবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন; ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভাই-ভাতিজা-সন্তানাদি আছে কি না, থাকলে তাদের কী নাম, এসব প্রসঙ্গ ছিল বাহুল্য। আমাদের অবস্থা তা নয়। আমরা এখানে সামগ্রিকভাবে সাহিত্যে ইতিহাসের প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করতে বসেছি। তাই সব কিছুই আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।

এখানে যদি আপনারা প্রতি-প্রশ্ন তোলেন—'ইতিহাস' বা 'সাহিত্যের' কোন সংজ্ঞায় আমরা আলোচনা সীমাবদ্ধ করতে চাই, তাহলে আমি নাচার। গুণীজন মাত্রেই জানেন যে, 'ইতিহ+আস' এই ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসটির পূর্বকালে অর্থ ছিল—পূর্ব বৃত্তান্ত, লোকপরম্পরাগত কথা। তার ভিতর পৌরাণিক উপকথা, লোকগাথা, কাল্পনিক কাহিনী ইত্যাদির অবাধ যাতায়াত। এখন ইতিহাস বলতে আমরা তা বুঝি না। বুঝি—বাস্তবে যা ঘটেছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই 'ঘটা' ক্রিয়াপদটির কর্তার কর্তৃত্ব নিয়েও সম্প্রতি মতভেদ দেখা দিয়েছে। 'কেমব্রিজ মডার্ন হিস্ট্রি' সম্পাদনা করতে গিয়ে 1896-সালের 'মডার্ন'-সম্পাদক লর্ড অ্যাকটন যা বলেছিলেন তাতে 'ঘটা' ক্রিয়াপদের কর্তাটা হয় 'হাল্লার রাজা', নয় 'শুণ্ডীর রাজা'। ষাট বছর পরে স্যার জর্জ ক্লার্ক তার প্রতিবাদ করলেন নতুন সম্পাদনাকালে—তাঁর মতে ঐ 'ঘটা' ক্রিয়াপদের কর্তা হতে পারে 'উলুখাগড়া'ও। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যটি তুলে ধরে ই· এইচ· কার্ বললেন, "The clash between Lord Acton and Sir Clarke is a reflection on a change in our total outlook on society over the interval between these two pronouncements." মোটকথা, 'ইতিহাস' শব্দটির বর্তমানে যে প্রচলিত সংজ্ঞা তাই আমরা মেনে চলেছি—পুরাণ, লোকগাথা, মহাকাব্য ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে।

সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা। তবে এই মওকায় বলে রাখি, আলোচনা সংক্ষেপ করতে সাহিত্যের কয়েকটি স্বীকৃত শাখা: কাব্য, গীতিকবিতা, নাটক, গীতিনাট্য, যাত্রার পালাগান, গান ইত্যাদিকে আমরা আলোচনার বাইরে রেখেছি।

সকলেই জানেন 'ইতিহাস'-এর এক 'ফার্স্ট-কাজিন' আছে: 'ভূগোল'। সেও সাহিত্যের এক 'সূট্যার'। মাঝে মাঝে ফষ্টিনষ্টি করতে আসে। তার ফলে যে মিশ্র-রস পয়দা হয় অলঙ্কারশাস্ত্রে তারও নামকরণের চেষ্টা হয়নি। মহাজনগতস্য পন্থায় আমরা তাকে 'ভৌগোলিক রস' নাম দিতে পারি। স্বীকার্য, এটিও আমাদের আলোচ্য বিষয়সীমার বাহিরে। কিন্তু দুটি কারণে ভূগোলের পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে দিয়ে কাজে হাত দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রথম হেতু: মিশ্র প্রতিক্রিয়ায় ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা আছে; দ্বিতীয় হেতু: 'ভূগোল'কে বাদ দিয়ে 'ইতিহাস'কে চিন্তা করা যায় না। প্রতিটি ইতিহাস ভূগোল-নির্ভর। এমনকি 'বিশ্ব-ইতিহাস' সূর্যের এই তৃতীয় গ্রহের চৌহদ্দিতে সীমিত।

তাহলে মোদ্দা কী দাঁড়ালো?

আমাদের ত্রৈরাশিকের অঙ্কে তিন-তিনটি 'ভেরিয়েব্‌ল্' বা পরিবর্তনশীল উপাদান। তন্মধ্যে দুটির 'মান' নির্ণেয়: 'ইতিহাস' ও 'সাহিত্য'। একটি আছে ভূষিমাল—ভেজাল: ভূগোল। ইতিহাসের সঙ্গে মিশে যৌগিক পদার্থ হিসাবে যেটুকু ভূগোল আছে তাকে তাড়ানো যাবে না। বাকিটাকে তাড়াতে হবে। বীজগণিত বলে, এক্ষেত্রে বজ্রগুণন পদ্ধতিই হচ্ছে 'হবির্বিনা হরির্যাতি···' শ্লোকের আখেরি প্রয়োগ: 'ধনঞ্জয়'-ব্যবস্থা। তাই করব আমরা। অর্থাৎ ভূগোল কীভাবে ইতিহাস ও সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করে সে-কথা সংক্ষেপে আলোচনা করে ভূগোলকে আমরা প্রবন্ধের বাইরে রাখব।

প্রথমেই আমাদের সমস্যাটার একটা 'চিত্রকল্প' পেশ করা গেল।

অর্থাৎ মিশ্রণের কায়দায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তিনটি উল্লেখযোগ্য শাখা কী-ভাবে পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। তাতে কী-জাতের মিশ্ররস পয়দা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে নমুনা হিসাবে দু-একটি নামের ইঙ্গিত রাখা গেছে। সুধীজন ঐ ইঙ্গিত দেখেই সমঝে নেবেন। নামগুলি কখনো খাড়া হরফে—কর্তার পরিচয়ে; কখনো বা *বাঁকা হরফে*—ইংরেজি অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে বলে metonymy — 'The Maker for his Works' অর্থাৎ তাঁর কর্মের।

বজ্রগুণন পদ্ধতিতে সর্বপ্রথমে ভূগোলকে উচ্ছেদ করা যাক:

(1) ভ্রমণেতিহাস [ইতিহাস + ভূগোল]:

সাহিত্য উপেক্ষিত। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এ জাতীয় গ্রন্থের মূল্য অপরিসীম। পরিব্রাজকের দিনপঞ্জিকা সমকালীন ইতিহাস সম্বন্ধে ভবিষ্যৎকালকে অবহিত করে। সাহিত্যগুণ আবশ্যিক নয়, হয়তো আদৌ অনুপস্থিত। তবু এ জাতীয় রচনা কালজয়ী। ভ্রমণকারী স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনকালে যা প্রত্যক্ষ করেছেন তাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ভ্রমণকারীর দৃষ্টিভঙ্গি নৈর্বক্তিক না হলে বা ঐতিহাসিকের প্রত্যাশিত অনুসন্ধিৎসা না থাকলে ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাস হয়তো উপেক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, ফা-হিয়েন যখন ভারতে আসেন তখন গুপ্তযুগের সূর্য মধ্যগগনে। মগধ-রাজধানী পাটলীপুত্রে তিনি রাত্রিবাস করেছেন। রাজা বা রাজবাড়ির উল্লেখ নেই। গুপ্তসম্রাট বা গুপ্তসংস্কৃতি তাঁর রচনায় উপেক্ষিত। সমকালীন অসীম প্রতিভাধর যাঁদের কেউ কেউ তখন ঐ শহরে উপস্থিত ছিলেন বলে অনুমান করা চলে—অমরসিংহ, ক্ষপণক, বরাহ-মিহির, কালিদাস, আর্যভট্ট, শূদ্রক—তাঁরা কেউ নেই ঐ ভ্রমণকাহিনীতে। অথচ সমকালীন ভারতবাসীর জীবনযাত্রার নানান চিত্র নিপুণ তুলিতে আঁকা! রাজগৃহের চিত্রকূট পর্বতচূড়ায় এক বিনিদ্র রাত্রির আশ্চর্য বর্ণনাও!

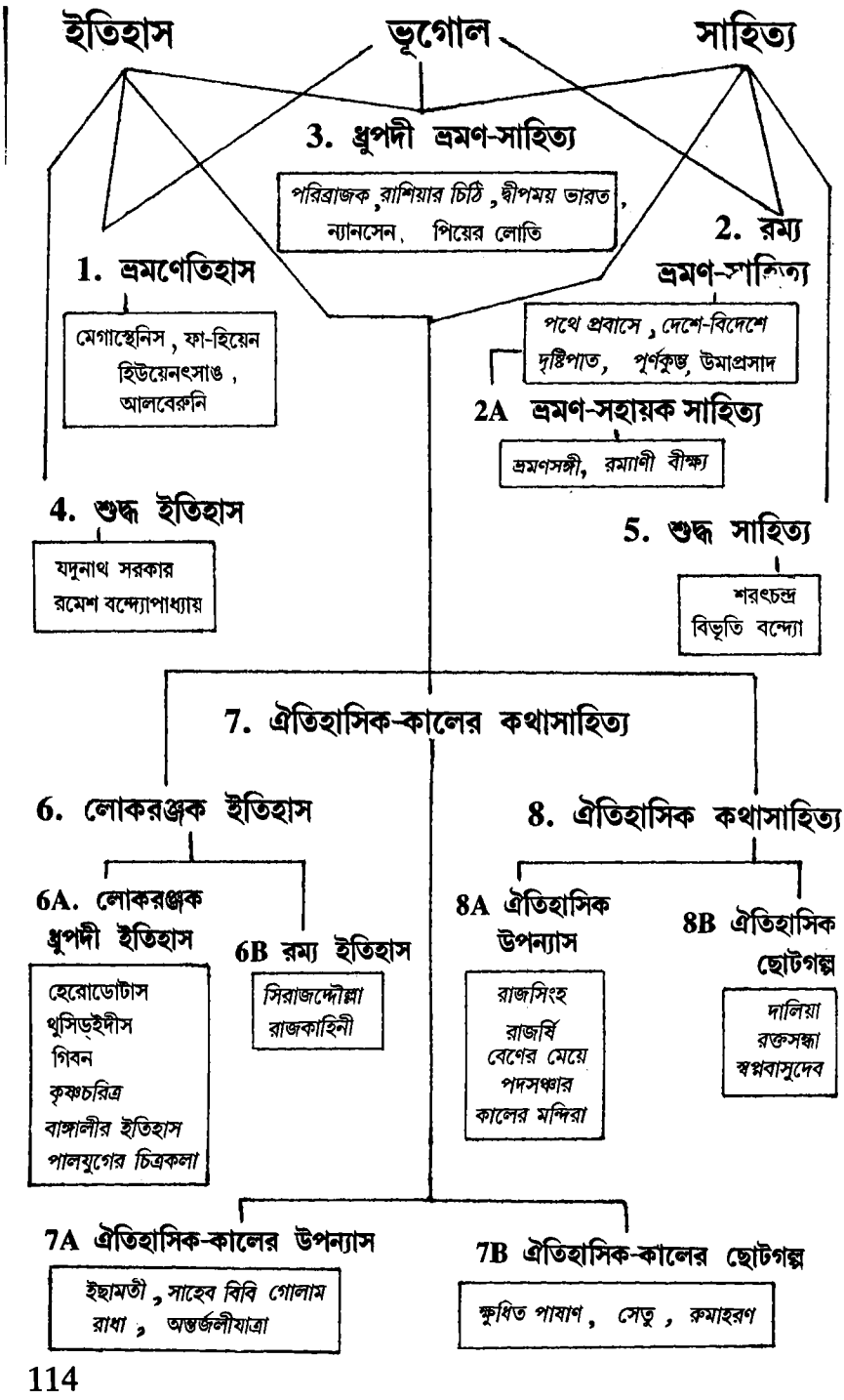
ইতিহাস
ভূগোল
সাহিত্য
3. ধ্রুপদী ভ্রমণ-সাহিত্য
পরিব্রাজক, রাশিয়ার চিঠি, দ্বীপময় ভারত, ন্যানসেন, পিয়ের লোতি
1. ভ্রমণেতিহাস
মেগাস্থেনিস, ফা-হিয়েন হিউয়েনৎসাঙ, আলবেরুনি
2. রম্য ভ্রমণ-সাহিত্য
পথে প্রবাসে, দেশে-বিদেশে দৃষ্টিপাত, পূর্ণকুম্ভ, উমাপ্রসাদ
2A ভ্রমণ-সহায়ক সাহিত্য
ভ্রমণসঙ্গী, রম্যাণী বীক্ষ্য
4. শুদ্ধ ইতিহাস
যদুনাথ সরকার রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
5. শুদ্ধ সাহিত্য
শরৎচন্দ্র বিভূতি বন্দ্যো
7. ঐতিহাসিক-কালের কথাসাহিত্য
6. লোকরঞ্জক ইতিহাস
6A. লোকরঞ্জক ধ্রুপদী ইতিহাস
হেরোডোটাস থুসিড্‌ইদীস গিবন কৃষ্ণচরিত্র বাঙ্গালীর ইতিহাস পালযুগের চিত্রকলা
6B রম্য ইতিহাস
সিরাজদ্দৌল্লা রাজকাহিনী
8. ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য
8A ঐতিহাসিক উপন্যাস
রাজসিংহ রাজর্ষি বেণের মেয়ে পদসঞ্চার কালের মন্দিরা
8B ঐতিহাসিক ছোটগল্প
দালিয়া রক্তসন্ধ্যা স্বপ্নবাসুদেব
7A ঐতিহাসিক-কালের উপন্যাস
ইছামতী, সাহেব বিবি গোলাম রাধা, অন্তর্জলীযাত্রা
7B ঐতিহাসিক-কালের ছোটগল্প
ক্ষুধিত পাষাণ, সেতু, রুমাহরণ

(2) রম্য ভ্রমণ সাহিত্য [ভূগোল+সাহিত্য] :

এবারে ইতিহাস উপেক্ষিত। ভ্রমণকারী স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়ার পথে পথচল্‌তি যে বর্ণনা দিচ্ছেন তার মূল লক্ষ্য পাঠকের মনোরঞ্জন। কখনো চরিত্রচিত্রণে, কখনো ঘটনা সংস্থাপনে, কখনো বা নিছক পরিবেশন-পরিপাট্যের প্রসাদগুণে। আবশ্যিক গুণ ভাষার রম্যতা। যে ভূখণ্ডের উপর দিয়ে পরিক্রমা সে-দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চেতনার কথা, সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের বিবরণ যে থাকতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এক্ষেত্রেও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বা মানসিকতা রচনাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে। *দেশে-বিদেশে* ভ্রমণকাহিনীতে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রসঙ্গ কাহিনীর প্রয়োজনে এসে উপস্থিত। কিন্তু বিপ্লবী নেতা বা প্রতিবিপ্লবী রাষ্ট্রনায়কেরা লেখকের কাছে পাত্তা পেলেন না। দু-দলকে হটিয়ে রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে সগৌরবে অধিষ্ঠিত রইল খিদমদগার আবদুর রহমান। *পূর্ণকুম্ভে* লেখিকা দুচোখ ভরে যা দেখেছেন তা ছাপিয়ে উঠ্‌ছে বারে বারে যা তিনি দেখছেন দুচোখ বন্ধ করে। *দৃষ্টিপাত*-এ ভূগোল কোথায়? 'বিজ্ঞান আমাদের দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ' বলে লেখক হুস করে পৌঁছে গেলেন দিল্লীর এয়ারপোর্টে। বাদবাকি ঐ রাজধানীর উচ্চকোটি সমাজের নানান-জাতির ককটেইল। ভাষার প্রসাদগুণে তা কালজয়ী। রঞ্জনের *শীতে উপেক্ষিতা* প্রসঙ্গেও ঐ এককথা। এ-জাতীয় 'রম্য-ভ্রমণ-সাহিত্যের' মূল্য যাচাই করতে হলে স্মরণ করতে হবে গুরুবাক্য :

> "পাখি যেমন প্রতিদিন
> খড়কুটো কুড়িয়ে এনে বাসা বাঁধে,
> তেমনি সেই জগতের উপকরণ সামান্য,
> চলতি-মুহূর্তের খসে-পড়া
> উড়ে-আসা সঞ্চয় দিয়ে গাঁথা,
> তার মূল্য তার রচনায়, নয় তার বস্তুতে।"[২]

এই ধারার আর একটি উপধারা সাহিত্যে বর্তমান, যাকে 'ভ্রমণসহায়ক সাহিত্য' বলা যেতে পারে। মূল উদ্দেশ্য ভ্রমণকারীকে সাহায্য করা। এগুলি নানান জাতের। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে কোন কোন জমিদার এ-জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, ভবিষ্যৎ যাত্রীদের সুবিধার্থে। হয়তো মুদ্রিত আকারে অভিজ্ঞতাটা স্থায়ী করার বাসনাও ছিল। সাহিত্য-গুণ তাতে থাক না থাক পরবর্তী ভ্রমণকারীদের তা প্রভূত সাহায্য করেছে। 1940 সালে পূর্ব রেল অল্প দামে দুই খণ্ডে *বাঙলায় ভ্রমণ* প্রকাশ করেন। তা অনবদ্য প্রকাশনা। এই ধারার অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হচ্ছে ও হয়েছে। *ভ্রমণসঙ্গী* বর্তমানে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় গাইড বুক।

কোন কোন সাহিত্যিক এর সঙ্গে ইতিহাস এবং কল্পিত নায়ক-নায়িকার প্রেমকাহিনী যুক্ত করে গাইড-বইয়ের মূল উদ্দেশ্যটা গোপন করেছেন। এই শাখায় সবচেয়ে জনপ্রিয় সুবোধ চক্রবর্তীর *রম্যাণী বীক্ষ্য* সিরিজ।

কল্পিত নায়ক-নায়িকা আমদানী না করে, ভ্রমণ সাহিত্য ক্রমাগত রচনা করে চলেছেন শঙ্কু মহারাজ।

আর একজন আশ্চর্য সাহিত্যিক আছেন এ-পাড়ায়, যাঁর ভ্রমণ-সাহিত্য একাই একটি ধারা। তিনি কল্পিত নায়ক-নায়িকা আমদানী করেন না। গেজেটিয়ার ঘেঁটে প্রাচীন ইতিহাস

পরিবেশনের বাসনা যাঁর আদৌ নেই। চোখ বুঁজে তিনি কিছু দেখেন বলে তো টের পাইনি। অবন পটুয়াও না কি তা দেখতে পেতেন না। দু-চোখ ভরে যা দেখেন তাই সহজ সরল ভাষায় পরিবেশন করেন। সজ্ঞান ভাষার মারপ্যাঁচও তাঁর রচনায় নজরে পড়ে না। তবু পাঠক-পাঠিকা বুঁদ হয়ে তাই পড়ে। নিশ্চয় বুঝেছেন কার কথা বলছি: ভ্রমণ-প্রেমিক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

(3) ধ্রুপদী ভ্রমণ-সাহিত্য [ইতিহাস+ভূগোল+সাহিত্য+সংস্কৃতি]:

খেয়া নৌকার মাঝি যখন ভাটিয়ালী গান ধরে তখন পারানির যাত্রী আপত্তি করে না, যতক্ষণ সে দাঁড়-জোড়া টানে, অথবা লগিটা ঠেলে। তাই *রাশিয়ার চিঠিতে* রুবি যখন ভাষার মাধুর্যে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন তখন আমরা সেটা গ্রহণ করি consumer's surplus হিসাবে। যাকে বলে 'আনমোল ফাউ'। কারণ পারানি যাত্রীদের মূল লক্ষ্য নদীর ঐ অচেনা ওপারটা। সেখানে তখন নাকি সাম্যবাদের কী-একটা আজব পরীক্ষা হচ্ছিল! *রবীন্দ্র-সংগমে দ্বীপময়-ভারত*-গ্রন্থে সাহিত্যগুণের চেয়ে আমাদের অধিক কৌতূহল দু-তরফা। প্রথমত সুনীতিকুমারের মূল্যায়নে বালী-যবদ্বীপ-কম্বোজ অঞ্চলের স্থাপত্য-ভাস্কর্য-ইতিহাস; দ্বিতীয়ত লেখকের জনৈক সহযাত্রীর প্রতিক্রিয়া। অনুরূপভাবে *পরিব্রাজক* অথবা *প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে* স্বামীজী ভারতআত্মার মুক্তিপথের দিশারী হিসাবে কী বলছেন তাই জানবার কৌতূহলই প্রবল, শুধু সুখপাঠ্য রম্যতাগুণ নয়।

দুজন বিদেশীকে নমুনা হিসাবে দাখিল করেছি বিশ্বসাহিত্য থেকে। ন্যানসেন (1861-1930) বিশ্বশান্তির জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন (1922)। ভূপর্যটক যদি ধ্রুপদীসাহিত্য রচনার জন্য তা পেতেন, তা হলেও অবাক হবার কিছু ছিল না। তাঁর উত্তরতম (1897) ভ্রমণ কাহিনীর শৈত্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া উষ্ণতা *সাইবেরিয়ার ভিতর দিয়ে*। প্রতি দেশের ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যার অপূর্ব সমন্বয়! অনুরূপভাবে পিয়ের লোতি (লুই মারী জুলিয়েন ভীয়ো, 1850-1923) কলমের মাধ্যমে তাহিতি দ্বীপের যে ছবি এঁকেছেন তার সঙ্গে শুধু তুলনা চলে পল গোগ্যাঁর তুলিতে আঁকা ছবির। মুজতবা আলী সাহেবের ভাষায় "লোতির কথা বিশেষ করে বললুম কারণ তাঁর মত অজানা অচিন দেশের আবহাওয়া শুদ্ধমাত্র শব্দের জোরে গড়ে তোলার মত অসাধারণ ক্ষমতা অন্য কোনো লেখকের রচনায় চোখে পড়ে না।"

ভূগোলকে এখানেই বিদায় দিচ্ছি। শুধু এ পর্যায় শেষ করার আগে বলি, ভূগোলের বদলে 'বিজ্ঞান' যদি আলোচ্য ভেজাল হত, তাহলে আমাদের টা-টা জানাতে হত ডারউইন বা ওয়ালেস-এর ভ্রমণকালীন রচনাকে; কল্প-বিজ্ঞান হলে জুল ভের্ন থেকে আর্থার সি· ক্লার্কের অনেক মানস ভ্রমণকে। কল্পবিজ্ঞানী-কথাসাহিত্যিকদের রচনায় 'ইতি + হ + আস'র বদলে মিশেছে 'ইতি + হতে পারে + আশ'!

(4) শুদ্ধ ইতিহাস:

ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। হরপ্রসাদ, দীনেশরঞ্জন, রামদাস সেন, রাখালদাস, নগেন্দ্রনাথ বসু, স্যার যদুনাথ, অক্ষয়কুমার, রমাপ্রসাদ চন্দ, নীহাররঞ্জন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুশোভন সরকার প্রভৃতির বিশুদ্ধ ইতিহাসের কথা বলতে চাইছি। এখানে সাহিত্যগুণ আবশ্যিক নয়। তবে কারও কারও রচনা নিজগুণেই সরস।

(5) শুদ্ধ সাহিত্য

অনুরূপভাবে ইতিহাসের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত শুদ্ধ সাহিত্য প্রচুর। আমরা নমুনা হিসাবে শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের কথা বলেছি। প্রথমোক্তের *নারীর মূল্য* শুদ্ধ সাহিত্য নয়। তেমনি বিভূতিভূষণের *স্বপ্ন বাসুদেব*-এ 'ইতিহাসের তাল' আর *চাঁদের পাহাড়*-এ 'ভূগোলের গোল' 'তালগোল' পাকিয়েছে।

(6) লোকরঞ্জন ইতিহাস [ইতিহাস+সাহিত্য]

একনিষ্ঠ ইতিহাসবেত্তা প্রণিধান করলেন যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিহাস-চেতনা জাগ্রত করতে না পারলে ঐতিহাসিক গবেষণা সম্ভব না। পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন, ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন ও সম্পদগুলিকে সুরক্ষার প্রয়োজনেও জনমানসকে ইতিহাসের দিকে আকর্ষণ করতে হবে। তৃতীয়ত ইতিহাসের শিক্ষায় বর্তমান সমাজকে যদি নতুন করে গড়তে হয়, ইতিহাস চর্চার যা মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহলেও ইতিহাসকে লোকরঞ্জন করে তুলতে হবে। এই মানসিকতা থেকেই এই ধারাটির উৎপত্তি।

আমরা একে দ্বিধারায় বিভক্ত করেছি: **ধ্রুপদী** ও **রম্য**।

(6A) লোকরঞ্জক ধ্রুপদী-ইতিহাস : এক হিসাবে বলা যায়, এই আদিম প্রেরণাতেই মানুষ মন্ত্রোচ্চারণের পর্বতশিখর অতিক্রমণে উন্নীত হয়েছিল মহাকাব্যের মালভূমিতে। রাজা-রাজড়ার 'ইতিহাস' রচনার মাধ্যমে সমাজসেবার স্বপ্ন দেখেছিলেন গিলগামেশ, বাল্মীকি, বেদব্যাস বা হোমার। কিন্তু আজকের সংজ্ঞায় তা 'মহাকাব্য' হতে পারে, 'ইতিহাস' নয়। 'রামের অয়ন' সূর্যবংশের 'ইতিহাস' নয়। যেমন কৌরবদের ইতিহাস নয় *মহাভারত*। ধ্রুপদী-ইতিহাসের আদিসূরী বোধকরি হেরোডোটাস (আঃ 485-425 খ্রী· পূ)। মহাপণ্ডিত সিসেরো (106-43 খ্রী· পূ) যাঁকে বলেছিলেন 'ইতিহাসের জনক'। পর্যটকের ভূমিকায় জন্মভূমি এশিয়া মাইনরের এক গ্রীক কলোনি থেকে রওনা হয়ে ঈজিয়ান সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ, গ্রীস, ম্যাসিডোনিয়া, থ্রেস, এমন কি পারস্য, টায়ার, মিশর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। চলার পথে ক্রমাগত মাল-মশলা সংগ্রহ করে যান। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, পৌরাণিক, পুরাতাত্ত্বিক, লোকায়ত গাথা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে থাকেন। এর পর তিনি রচনা করেন তাঁর ধ্রুপদী ইতিহাস। শুরু করেন লীডিয়ারাজ ধনকুবের ক্রীসাস (Croesus, রাজত্ব 560-546 খ্রী· পূ)-এর পারস্য-বিজয় থেকে। ক্রমে উপনীত হন পারস্য, ব্যাবিলোন এবং মিশরীয় রাজন্যবর্গের প্রসঙ্গে। খাঁটি ইতিহাস, কিন্তু শুনেছি তা নাকি সুখপাঠ্য। মেজাজেই পার্থক্য হিউয়েন ৎসাঙ বা আলবেরুণীর সঙ্গে।

ঠিক তাঁর পরেই আবির্ভূত হলেন থুসিড়ইদীজ্ (Thucydides, আঃ 460-আঃ 400 খ্রী· পূ·)। ষাট বছর বেঁচেছিলেন। কিন্তু এই গ্রীক ঐতিহাসিকের কল্যাণেই আমরা জেনেছি নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে 'পেলোপোন্নেসিয়ান' যুদ্ধের প্রকৃত বিবরণ। বিশ বছর বয়সে সাতটি রণতরীর নৌসেনাপতি হিসাবে যুদ্ধযাত্রা করেন; পরাজিত হবার অপরাধে বিশ্বাসঘাতকরূপে চিহ্নিত হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাগার থেকে পলায়ন করেন। পরবর্তী জীবনের চারটি দশক আত্মগোপন করে রচনা করে যান অমূল্য ইতিহাস। থুসিড়ইদীজ্ নাকি ঐতিহাসিক হিসাবে একদিক থেকে অনন্য—প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করেই

তাঁর নিজস্ব মতামত দাখিল করতেন। পেরিক্লস্‌কে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। গ্রীক সভ্যতার আসন্ন পতন সম্বন্ধে অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। শুধু তাই নয়—সে পতনের হেতুগুলিও নাকি নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু সে-সব তো বহু-বহুযুগ আগেকার কথা। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভায় মেগাস্থেনীজ (আঃ 300 খ্রী· পূ) যে নোট রেখেছিলেন তা ইতিহাসের উপাদান বটে, 'ইতিহাস' নয়। অন্তত যেটুকু আমরা হাতে পেয়েছি। ভারতে প্রকৃত 'ইতিহাস' কোনদিনই রচিত হয়নি। রাজার ফরমায়েস মোতাবেক কিছু কিছু পুঁথি লিখিত হয়েছে বটে—যেমন কাশ্মীররাজের নির্দেশে কল্‌হন, বিল্‌হন—তাকে 'ইতিহাস' বলা চলে না। ইদানীং কালে গ্রীক ধ্রুপদী ঐতিহাসিকদের পথে নূতন করে যাত্রা শুরু করলেন ইংরাজ লেখক—ঐতিহাসিক শুধু নন, সাহিত্যিক—গিবন। তাঁর রচিত *দ্য ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার* (1722-88)-এ কোন কল্পিত চরিত্র নেই, উপন্যাসের বাষ্পমাত্র নেই; কিন্তু তা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর নভেলের মতো রাত জেগে পড়া যায়। পরীক্ষা পাশ করার জন্য নয়। গল্পের টানে। গল্প যদিচ খাঁটি ইতিহাস।

ইংরেজী ও য়ুরোপীয় সাহিত্যে এ ধারাটি সগৌরবে টিকে আছে। মস্কোদমনব্যর্থ বিশ্বত্রাস নেপোলিয়ানের প্রত্যাবর্তনের বর্ণনা পড়ুন টলস্টয়ের *যুদ্ধ ও শান্তি*-তে। এবার সেটা বন্ধ করে খুলে বসুন শীরার-এর *দ্য রাইজ অ্যাণ্ড ফল অব দ্য থার্ড রাইখ্*। পড়ুন লেনিনগ্রাড-অধিকারে ব্যর্থ বিশ্বত্রাস হিটলারের 'ব্লিৎসক্রীগ্‌-বাহিনী'র পশ্চাদপসরণের বর্ণনা। দুইটি বিশুদ্ধ ফরাসী শ্যাম্পেন। 'আধারকারে'র মতো কনৌসার না হলে স্বাদে মালুম হবে না প্রথমটি বট্‌লড্‌ 1869 খ্রীষ্টাব্দে; দ্বিতীয়টি নব্বই বছর পরে, 1959-এ। প্রথমটি সার্থক 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', দ্বিতীয়টি সার্থক 'উপন্যাসোপম ইতিহাস'। দুটি-গ্রন্থেই মহাকালের বিচিত্র গম্ভীর সুদূরবিস্তৃত ঝংকার ধ্বনিত হচ্ছে। প্রথমটি কথাসাহিত্যিক লেও টলস্টয়ের রুদ্রবীণায়, দ্বিতীয়টি সাংবাদিক শীরার-এর অতন্দ্রসাধনার সুপার-রিপোর্টাজ-এ।

বাংলা সাহিত্যে রিপোর্টাজ যথেষ্ট হয়েছে ও হচ্ছে। রাজনৈতিক মতবাদের প্রচারে অথবা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক-অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপরে (রাজনৈতিক হেতুতেই) ঢাউস-ঢাউস গ্রন্থ লেখা ও লেখানো হচ্ছে। সেকালে যেমন রাজাদেশে *রাজতরঙ্গিণী* লেখা হয়েছিল এ-কালেও তেমনি পার্টি-ফাণ্ড থেকে খরচ যোগানো হয়। অথবা সরকারী আদেশে গ্রন্থাগারে ব্যাপক বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দলগত প্রচারের উর্ধ্বে উঠে সাধারণ পাঠককে ইতিহাস সম্বন্ধে অবহিত করার মানসিকতা নিয়ে একটা কালকে, একটা যুগের আন্দোলনের ইতিহাসকে কেউ তুলে ধরতে চান না শুধুমাত্র তথ্যনির্ভর গবেষকের নিষ্ঠায়। তাই পাশ্চাত্ত্যদেশে গিবন-এর উত্তরসূরীর অভাব হয়নি; বাংলায় চণ্ডীচরণ সেন, নিখিলনাথ রায় অথবা অক্ষয়কুমার মৈত্রের উত্তরসূরী খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। ঐতিহাসিক গবেষণা-গ্রন্থ অবশ্য কিছু কিছু রচিত হয়েছে। আমরা নমুনা হিসাবে চারটির নামোল্লেখ করেছি। সেগুলি ইতিহাস-বিষয়ক নয়। ইতিহাস-সম্পৃক্ত। রাখালদাসের *বাঙ্গালার ইতিহাস* বা রমাপ্রসাদের *গৌড়রাজমালা*-র পাতা ওল্টালেই বোঝা যায় যে, লেখকের মানসচক্ষে যে-পাঠক সে ইতিহাসের ছাত্র। কিন্তু নীহাররঞ্জনের *বাঙালীর ইতিহাস*-এ প্রত্যাশিত পাঠক শিক্ষিত কৌতূহলী বঙ্গবাসী। অর্থনীতি বা দর্শন কেন সে পদার্থ-বিদ্যার ছাত্রও হতে পারে। সরসীকুমার যখন *পালযুগের চিত্রকলার* ইতিহা। লিখছেন তখন তাঁর পাঠক শিল্পরসপিপাসু। ধরুন বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র*। *মহাভারত* বা *ভাগবতের* একটি বিশেষ চরিত্রকে নিয়ে আলোচনা; কিন্তু এমন

বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তা রচিত যে, আমরা ঐতিহাসিক রস তির্যকভাবে পাই। একই কথা শরৎচন্দ্রের *নারীর মূল্য* প্রসঙ্গে। কথাসাহিত্যিক এখানে প্রাবন্ধিক। ইতিহাস তাঁর বিষয়বস্তু নয়: সমাজ। কিন্তু লেখকের দৃষ্টি ঐতিহাসিকের—দেশ-ভেদে, কালভেদে ইতিহাসবেত্তার নিষ্ঠায় নারীর মূল্য তিনি নির্ধারণ করেছেন। এগুলিও ইতিহাস-রসসিক্ত। ব্যাপক অর্থে।

গিবন-এর অনুকরণে বাঙলা ভাষায় একটি যুগের, একটি কালের ধারাবাহিক রচনার পথিকৃৎ কোন্ ঐতিহাসিক-সাহিত্যিক এ নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। বাবু নিখিলনাথ রায়ের *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* এবং অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র *সিরাজদ্দৌলা* একই বৎসরে (1898) প্রকাশিত। তার পূর্বে বাঙলা ভাষায় বিশুদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, বিশুদ্ধ উপন্যাস তিনই লেখা হয়েছে। কিন্তু 'গিবনঢঙের উপন্যাসপ্রতিম লোকরঞ্জক ইতিহাস' লেখা হয়নি। নিখিলনাথ এবং অক্ষয়কুমার প্রায় একই সঙ্গে তথ্যনির্ভর ইতিহাস পরিবেশন করলেন কথাসাহিত্যের ভাষায়। একই বছরে প্রকাশিত হলেও *মুর্শিদাবাদ কাহিনী* বয়োজ্যেষ্ঠ। কারণ তার ভূমিকায় নিখিলনাথের স্বাক্ষরের তারিখ ১২ই শ্রাবণ এবং অক্ষয়কুমারের *সিরাজদ্দৌলার* ভূমিকায় লেখকের স্বাক্ষর আশ্বিন মাসে। অপিচ, নিখিলনাথের গ্রন্থে কোথাও অক্ষয়কুমারের উল্লেখ নাই। অক্ষয়কুমারের গ্রন্থে *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*র উদ্ধৃতি আছে।

এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। ঐ দুই ঐতিহাসিকের অপেক্ষা প্রায় দুই দশকের বয়োজ্যেষ্ঠ চণ্ডীচরণ সেন তিন-চারখানি গ্রন্থ রচনা করেন, যা আমাদের বর্তমান সংজ্ঞা অনুসারে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' পর্যায়ের। কিন্তু হেতুটি মর্মন্তুদ:

চণ্ডীচরণ ছিলেন সাবজজ। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের নাম ও বিষয় নির্বাচন লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ঝোঁকটা কোনদিকে: *অযোধ্যার বেগম* (1886), *দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ* (1886), *ঝাঁসির রাণী* (1888) এবং *মহারাজ নন্দকুমার* (1888)। শেষোক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় (পাণ্ডুলিপি: 1875) লেখক জানাচ্ছেন,

> "বড় দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশের সুশিক্ষিত লোকেরা দেশের ইতিহাস একেবারেই জানেন না। সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক এবং বঙ্গের কৃষকদিগের উপর যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। ...বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠ করিতে জনসাধারণের রুচি হয় না, এই নিমিত্তই উপন্যাসের আকারে এই পুস্তক লিখিত হইল।"[৩]

ডঃ বিজিতকুমার দত্ত ঠিকই বিশ্লেষণ করেছেন:

> *মহারাজ নন্দকুমার* প্রকৃতিতে ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। গ্রন্থের নাম *মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষ পূর্বে সামাজিক অবস্থা*। চণ্ডীচরণ শেষোক্ত দিকটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণই স্পৃহনীয়। এজন্য *মহারাজ নন্দকুমার*-এ নন্দকুমারের সঙ্গে যোগ নেই এমন সমস্ত ঘটনারই বেশি উল্লেখ দেখি। গ্রন্থের আরম্ভে ও গ্রন্থের শেষে নন্দকুমারের উল্লেখ আছে। কিন্তু অংশটি শিথিলবিন্যস্ত।[৪]

আমাদের ধারণা দোষ লেখকের নয়। পাঠকের। পাঠকমানস ইতিহাসবিমুখ। তাছাড়া

'উপন্যাস'-এর পরিবর্তে 'ইতিহাস' লিখলে সাবজজ-সাহেবের অদৃষ্টে হয়তো লঙ-সাহেবের লাঞ্ছনা জুটত। কারণ

> নন্দকুমারাদি লিখিয়া তিনি (চণ্ডীচরণ) অচিরাৎ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছিলেন।[৫]

এজন্যই যদিচ লেখক ভূমিকায় বলেছেন যে, তিনি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' লিখেছেন, আমরা গ্রন্থটিকে 'লোকরঞ্জন ধ্রুপদী ইতিহাসের' তালিকাভুক্ত করতে বাধ্য হলাম।

ধ্রুপদী ধারায় লোকরঞ্জন ইতিহাসের গ্রন্থ-তালিকা এখানে পেশ করা সম্ভবপর নয়। নমুনা হিসাবে বিশ্বসাহিত্যের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল: ফরাসী বিপ্লবের উপর কাজ (1837) করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন কার্লাইল (1795-1881); ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমে পোপদের ধর্মীয় শাসনের ইতিহাস (1834-37) রচনা করেছিলেন র‍্যাঙ্কে (1795-1886)। কার্ল মার্ক্স-এর (1818-83) মহাগ্রন্থ *Das Kapital* (1867) যদিচ বিশুদ্ধ ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা, কিন্তু আর·এইচ টনি (Towney, 1886-1962)র *Religion & the Rise of Capitalism* (1926)কে লোকরঞ্জক ধ্রুপদী ইতিহাস বলা যায়। টনি অবশ্য মার্কসীয় দৃষ্টিতে সমস্যাটা দেখেননি। চার্চিলের (1874-1965) ছয় খণ্ডের *দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার*। টয়েনবীর (1889-) অতি বিশাল *বিশ্ব ইতিহাস* একাধারে বিশুদ্ধ ইতিহাস এবং লোকরঞ্জক।

অনুরূপভাবে বাঙলা ভাষাতেও সমান্তরালে একটি ধারা প্রবাহিত। এবারেও আমরা পূর্ণ তালিকা দাখিলের প্রয়াস না করে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি দিকচিহ্নের উল্লেখ করছি: ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (1880-1961) *অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস* অথবা *বাংলার ইতিহাস*; ঈশান স্কলার বিনয়কুমার সরকারের (1887-1949) তেরটি খণ্ডে প্রকাশিত বিশালায়তন *বর্তমান জগৎ*; সুরেন্দ্রনাথ সেনের (1890-1962) *অশোক*; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (1891-1952) *সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, সংবাদপত্রে সেকালের কথা* কিংবা *বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস*; যোগেশচন্দ্র বাগলের (1903-1972) *মুক্তির সন্ধানে ভারত* বা *স্ত্রীশিক্ষার কথা*; নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙালীর ইতিহাস*, বিনয় ঘোষের একাধিক গ্রন্থ, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্তের (1907-1947) *ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ* ও *তৎকালীন বাঙালী সমাজ*; বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস*।

(6B) লোকরঞ্জক রম্য ইতিহাস: সদ্য-বর্ণিত ধ্রুপদী লোকরঞ্জক ইতিহাসের সঙ্গে এর মৌল পার্থক্য রম্যতা গুণ। এ জাতীয় রচনাতেও কাল্পনিক চরিত্র আমদানী করার রীতি নেই, তবে ঐতিহাসিক চরিত্র প্রায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঢঙে আলাপচারীতে রত হলে আপত্তি করার রেওয়াজও নেই, শুধুমাত্র যদি দেখা যায় লেখক সেই কথোপকথনের মাধ্যমে ইতিহাসকেই পরিবেশন করছেন। কল্পিত কাহিনী নয়। সাল তারিখ সচরাচর বর্জিত, ফুটনোট বরদাস্ত করা হয় না। তবে গ্রন্থশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়—সহায়ক গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা। এই ধারার প্রথম যুগের প্রচেষ্টা অক্ষয়কুমারের *সিরাজদ্দৌলা* (তিনি অবশ্য সাহিত্যের 'রম্যতা' গুণের চেয়ে ঐতিহাসিক 'তথ্য'কে সর্বত্র প্রাধান্য দিয়েছিলেন) এবং নিখিলনাথ রায়ের *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*। ইদানীং শোনা যাচ্ছে এই ধারাটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এবারেও নমুনা হিসাবে অসংখ্য সাম্প্রতিক প্রকাশনার ভিতর দু-একটি বইয়ের নাম

করি, যথা সুকন্যার *নূরজাহান*, শ্রীপারাবতের *বাহাদুর শাহ, জাহানারা*।

উপন্যাসের অথবা কথাসাহিত্যের ঢঙে রচিত, সাহিত্য রসসিক্ত এই গ্রন্থগুলিতে কল্পনার বিন্দুমাত্র আশ্রয় নেওয়ার রেওয়াজ নেই, তবু রচনাগুণে সাধারণ পাঠককে এগুলি ইদানীংকালে যথেষ্ট আকৃষ্ট করছে। শুধু রচনার গুণে নয়, আরও একটি হেতু আছে। সাধারণ পাঠক ইতিহাসকে আজকাল বেশি করে জানতে চায়, কিন্তু ঐতিহাসিকদের ধ্রুপদী রচনায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফলে এই জাতীয় বই লোকশিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

স্বীকার্য, লেখকের একদেশদর্শিতা দোষে, 'শৌখিন মজদুরী'র প্রবণতায় এতে কখনও কখনও ক্ষতিও হচ্ছে। ইতিহাসকে কিছু লেখক বিকৃত করছেন। তাঁরা পরিশ্রম করতে নারাজ! বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। নমুনা হিসাবে একটি মাত্র জনপ্রিয় 'লোকরঞ্জক রম্য ইতিহাস'কে বেছে নিচ্ছি: তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের *পলাশীর যুদ্ধ*। গ্রন্থটি জনপ্রিয় হওয়ায় লেখক এর পর রচনা করেন: *পলাশীর পর বক্সার*। তপনমোহন প্রথমোক্ত গ্রন্থে লিখছেন:

> বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর (সিরাজদ্দৌলার) ঔদ্ধত্য-লাম্পট্য কাণ্ডজ্ঞানের অভাব যেন আরও বেড়ে যেতে লাগল। বুনো স্বভাব যেন আরও বন্য হতে চলল। না হল তাঁর যুদ্ধবিদ্যা শেখা, না হল তাঁর রাজকার্য চালানোর কোন জ্ঞানগম্যি। এক কাব্যকাহিনী ছাড়া আর কিছুতে তো সিরাজদ্দৌলাকে কোনক্রমে শহীদ বানাতে পারা যাচ্ছে না। কী হিন্দু, কী মুসলমান, কী ইংরেজ, কী ফ্রেঞ্চ, কী ডাচ একজনও কেউ তাঁকে একটা ভালো সার্টিফিকেট দিয়ে যাননি।[৬]

এরপরে সেই পরিচিত দীর্ঘ ফিরিস্তি—গঙ্গার ঘাটে কোন সুন্দরী পুরললনা স্নান করতে এলে নিখোঁজ হয়ে যায়, খেয়া নৌকার যাত্রীদের মাঝগঙ্গায় ডুবিয়ে দিয়ে তাদের মৃত্যুযন্ত্রণা দেখা নাকি সিরাজের এক বিলাস; গর্ভিণী নারীর উদর বিদীর্ণ করে ভ্রূণ দেখতে নাকি ভারী আমোদ পেতেন, ইত্যাদি প্রভৃতি। তপনমোহনের পূর্বসূরীরা এসব কথা বলেছেন; কিন্তু কেন, কারা এসব রটনা করেছিল তাও লিপিবদ্ধ করেছেন। ইংরেজ ম্যাজিশিয়ানি কায়দায় বণিকের মানদণ্ডটাকে যখন রাজদণ্ডে রূপান্তরিত করল তখন তাদের ঐতিহাসিকদের বাধ্য হয়ে লিখতে হল কিছু: 'গিলি-গিলি—হোকাস-পোকাস।' হিন্দু রাজা-রাজড়া, মুসলমান আমীর-ওমরাহ্‌রা নিজ নিজ স্বার্থে গদীর হকদারকে হটিয়ে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে কেন মদৎ দিলেন তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে বই কি! প্রায় সকল পরবর্তী ঐতিহাসিক এ বিষয়ে একমত। অক্ষয়কুমার বলছেন:

> সিরাজদ্দৌলার সমসাময়িক ইংরেজ এবং মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণ তাঁহার জীবনকালে যে-সকল ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার মধ্যে তাঁহার অনেক কুকীর্তির উল্লেখ আছে; কিন্তু গর্ভিণীর গর্ভবিদারণ, নৌকাসহিত ভাগীরথী-গর্ভে নরনারী নিমজ্জন প্রভৃতি অদ্ভুত অত্যাচারের কোনও উল্লেখ কোথাও নাই। বলা বাহুল্য যে, ইহার অধিকাংশই নিছক রটনা।[৭]

যুবরাজ সিরাজ মদ্যপ, ইন্দ্রিয়াসক্ত—একশবার। কিন্তু নবাব সিরাজ? শুনুন নিখিলনাথের জবানীতে:

> একটা কথা বলিয়া রাখি, সিংহাসনে আরোহণের পরেও বাঙ্গালার ইতিহাসে সিরাজকে যে ঘোরতর মদ্যপায়ী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক।

যৌবনারম্ভে সিরাজ মদ্যপান করিতেন বটে কিন্তু আলিবর্দী মৃত্যুশয্যায় সিরাজকে কোরাণ স্পর্শ করাইয়া ভবিষ্যতে মদ্যপান না করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন এবং সিরাজ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন মাতামহের সেই হিতকর অনুরোধ রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই।[৮]

নিখিলনাথ আশঙ্কা করেছিলেন, পাঠক তাঁর কথা বিশ্বাস নাও করতে পারে; তাই যুক্তির স্বপক্ষে সমকালীন ইংরেজ ঐতিহাসিকের দীর্ঘ উদ্ধৃতি ফুটনোটে দাখিল করে সক্ষেদে বলছেন :

ইহা একজন ইংরেজের কথা, দেশীয়ের নহে।

তবু তপনমোহন সিরাজের স্বপক্ষে একটাও 'গুডকন্ডাক্ট'-এর সার্টিফিকেট খুঁজে পেলেন না। ঐ নবীন সেনের কাব্য ছাড়া। যে কারণে সমকালীন ঐতিহাসিক 'গুডকন্ডাক্ট'-এর সার্টিফিকেট খুঁজে পাননি সে হেতুটি তো তপনমোহনের প্রতি প্রযোজ্য নয়! বিংশ শতাব্দীর লেখকের এ মানসিকতা কেন? নবীন সেন থেকে শচীন সেনগুপ্ত কেউই বলেননি যে, সিরাজ ছিল ধোওয়া তুলসীপাতা। কিন্তু ঐ জাতের একটি পাঁড় মাতাল—যে বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতিরাত্রে মদ্যপানে 'বেহেড' হয়ে যেত, সে যদি এক কথায় মদ্যত্যাগ করতে পারে তাহলে সেই দৃঢ়চেতা-শয়তান Devil's dueটুকুও পাবে না বিংশ শতাব্দীর লেখকের কাছে?

এ জাতীয় 'শৌখিন মজদুরী' ইতিহাস এবং সাহিত্য দু-তরফেই ক্ষতি করে!

(7) ঐতিহাসিক কালের কথাসাহিত্য :

ব্যাপারটা কী? 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কী, তা আমরা জেনেছি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে। 'ঐতিহাসিক-কালের উপন্যাস' তাহলে কাকে বলছি?

পার্থক্যটা প্রণিধান করতে হলে সবার পূর্বে জানা দরকার কোন্ শর্তটি পালিত হলে দূরকালের একটি ইতিকথা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলে স্বীকৃত হবে।

কিন্তু পৃথিবীতে অল্পসংখ্যক লোকের অভ্যুত্থান হয় যাঁহাদের সুখদুঃখ জগতের বৃহৎ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজ্যের উত্থানপতন, মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান কলসংগীতের সুরে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিরাগ-অনুরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের কাহিনী যখন গীত হইতে থাকে তখন রুদ্রবীণার একটা তারে মূলরাগিণী বাজে এবং বাদকের অবশিষ্ট চার আঙুল পশ্চাতের সরুমোটা সমস্ত তারগুলিতে অবিশ্রাম একটা বিচিত্র গম্ভীর, একটা সুদূর বিস্তৃত ঝংকার জাগ্রত করিয়া রাখে।[৯]

'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর বিবর্তন যখন আমরা বিচার করব তখন লক্ষ্য করব এই শর্তটি প্রত্যেকটি লেখককে পূরণ করতে হয়েছে। কখনো সোচ্চারভাবে, কখনো বা প্রচ্ছন্নভাবে। কিন্তু দূরকালের একটি কাহিনীতে, সুকথিত কাহিনীতে,যদি মহাকালের ঐ বিচিত্র-গম্ভীর সুদূর-বিস্তৃত ঝংকারটুকু শ্রুতিগোচর না হয়? তখন তাকে কী বলব?

ধরুন বিমল মিত্রের *সাহেব-বিবি-গোলাম।* দূরকালের কাহিনী। উপন্যাস। তাহলে কি এটি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'? আমাদের বিচারে তা নয়। কেন নয়?

দেখছি কতকগুলো কল্পিত চরিত্রকে দূরকালের একটি তাসের 'চিপেন্ডেল' টেবিলে হাত ফিরি করা হচ্ছে। সামাজিক আইনে প্রতিবারই সাহেবের পিট তোলার কথা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে লেখকের পক্ষপাতিত্বে মাঝে-মাঝে তুরুপের গোলাম পিট নিজের কোলের দিকে টে ন নিচ্ছে।

কল্পিত নায়ক-নায়িকার দুঃখে আমরা কাঁদছি, সুখে হাসছি, কিন্তু ইতিহাস কোথায়? বাঈজী, বুলবুল, পায়রা-ওড়ানো, বাবু-কালচার মায় মহাকালের কর্ণধার 'ঘড়িবাবু' সব আছে—কিন্তু তবু তা ঊনবিংশ শতকের এক খণ্ডিত চিত্র। তা একদেশদর্শী। তা ইতিহাস নয়। তার হেতু—যে দুরবীনে আমরা সেই দূর কালটাকে দেখবার চেষ্টা করছি তার 'আইপীস'টা ঘষাকাচের! শিবের দোর ধরে যার জন্ম সেই ভূতনাথের চোখ দিয়ে বাংলার নবজাগরণের কালটাকে দেখা যায় না। তাই অগণিত কাল্পনিক চরিত্রের ভিড়ে ঠাঁই হয়নি কিছু পরিচিত মানুষের: বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ। বিমল মিত্র বলেছেন, It was the worst of times.....it was the season of darkness, বলতে ভুলেছেন, It was also the best of times, it was, nevertheless, the season of Light !

কিম্বা ধরুন কমল মজুমদারের: *অন্তর্জলী যাত্রা*। সমকালীন নিখুঁত চিত্র। 'সতীদাহ'-নামক ঐতিহাসিক প্রথার প্রভাব কতকগুলি কল্পিত নরনারীর উপর। তবু তাকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলতে বাধে: সেটি সার্থক 'ঐতিহাসিক কালের উপন্যাস'। হেতু ঐ— রুদ্রবীণার ঐ একটা তারের মূলরাগিণী শুনতে পাইনি।

আরও একটি অনবদ্য উদাহরণ—তারাশঙ্করের: *রাধা*।

আমাদের আপত্তি আছে তাকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলতে! তা অসাধারণ, তা কালজয়ী, তা সাহিত্য জগতের দিকচিহ্ন। কিন্তু 'ঐতিহাসিক কালের উপন্যাস' মাত্র। কেন?

লেখক সমকালীন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রকে কিছুমাত্র গুরুত্ব দিতে চাননি। মহারাষ্ট্রীয় সন্ন্যাসীদলের অকস্মাৎ আবির্ভাবে ঐতিহাসিক রসের ক্ষীণ সূচনা হতেই লেখক নৌকার দিক পরিবর্তন করে দিলেন। মনে হচ্ছে, লেখক কয়েকটি কল্পিত চরিত্রকে পাল্‌কিতে চাপিয়ে দু-আড়াই শ' বছর দূরের দেশে নির্বাসন দিয়েছেন। বাদশাহ বা নবাবের নাম মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হচ্ছে বটে, কিন্তু তারা লেখকের কাছে কোন পাত্তা পাচ্ছে না। 'ঐতিহাসিক রস' দানা বেঁধে উঠ্‌ছে না। তার হেতু: তারাশঙ্কর সেই অতীতকালের সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার চেয়ে বড় করে দেখেছেন একটি তত্ত্বকে: 'রাধাতত্ত্ব'। উপন্যাস-অংশে লেখক সমকালীন ধর্ম, শিক্ষা, সমাজের চিত্র আঁকতে অবহেলা করেননি, মায় বাজারে চাউলের দর পর্যন্ত। কিন্তু রুদ্রবীণার তারে বিগতযুগের ঝংকারকে ছাপিয়ে উঠছে একটা বাঁশীর তান। চরম দুঃখের আগুনে পুড়েই যে পরমপ্রেম নিখাদ হয়ে ওঠে, 'দ্বন্দ্ব' শব্দের যে দুটি অর্থ—এটাই লেখকের মূল বক্তব্য। পাত্রপাত্রীদের দূর কালে যেতে বাধ্য করেছেন এই কারণে যে, 'রাধাতত্ত্ব' তখনো প্রতিষ্ঠা পায়নি।

প্রায় একই কথা বিভূতিভূষণের *ইছামতী প্রসঙ্গে*।

'প্রায় একই কথা' বলছি এ জন্য যে, বিভূতিভূষণ তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় সাধারণ নরনারীর—যারা উপন্যাস অংশের মূলচরিত্র নয়—কী অবস্থা, তা দেখতে ও দেখাতে চান। ইংরেজ কুঠিয়াল আর তাদের বশংবদ দেশীয় অনুচরদের অত্যাচারের চিত্র বিভূতিভূষণ এঁকেছেন।

মূল বিচারটা বস্তুত 'রস'-এর। উপন্যাস-অংশের সঙ্গে ঐতিহাসিক রস কতটা মিশেছে, কী ভাবে মিশেছে এটাই বিচার্য। রাজা-রাজড়া অথবা সমকালীন ইতিহাসবিখ্যাত ব্যক্তিদের যে মঞ্চে উপস্থাপিত করতেই হবে এমন কোন মাথার দিব্য দেওয়া নেই। ধরুন *বৈকুণ্ঠের খাতা*। স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটিকা, ঠিক মুকুট-এর মতো। ঠিক? মোটেই নয়। রসের বিচারে দুটি

স্ত্রীভূমিকাবর্জিত নাটিকা দুটি ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। কারণ *বৈকুণ্ঠের খাতায়* তিন-তিনটি নারী চরিত্র নাট্যকার এঁকেছেন নিপুণ তুলিতে। স্বীকার্য, তাঁরা মঞ্চে আসেননি। আছেন উইংস্-এর আড়ালে: কেদারের দজ্জাল পিসি, কেদারের সলজ্জ শ্যালিকা, আর বৈকুণ্ঠের সর্বংসহা 'নিরু-মা'। ঠিক তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসে নেপথ্যে থেকে মহাকালের মেঘডম্বরুর একটি বিচিত্র গম্ভীর গুরু গুরু আওয়াজ কানে আসা চাই। সে শব্দ নানান ঢঙের হতে পারে। তবে সে ধ্বনি মহাকালের। ঐতিহাসিক রস-এর মূল নিয়ামক-নায়ক: TIME !

সাহেব-বিবি-গোলাম-এর ভূতনাথ অথবা *অন্তর্জলী যাত্রা*-র শ্মশানডোম নায়কোচিত চরিত্র কি না এটা বিচার্য নয়, সিডনে কার্টনও তো ছিল পাঁড় মাতাল। তার বাঁধা লব্জ: "আই কেয়ার ফর নোবডি অ্যান্ড নোবডি কেয়ার্স ফর মি।" তবু ডিকেন্স-এর *আ টেল অব টু সিটিজ* বিশ্বসাহিত্যের এক অনবদ্য সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। কারণ সেখানে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল নায়ক 'অতীত' একেবারে প্রথম পংক্তি থেকে 'বর্তমান':

> It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us,we had nothing before us, we were all going direct to Heaven, we were going direct the other way — in short, the period was so far like the present period, that some of its noisiest authorities insisted on its being received for good or for evil, in the superlative degree of comparison only."[1]

দুই নগরীর কাহিনীতে ফরাসী বিপ্লবের কোন বিখ্যাত/কুখ্যাত নায়ক অনুপস্থিত; কিন্তু বিপ্লবোত্তর পৈশাচিক রক্ততৃষ্ণার যে অমানুষিক বীভৎস-রস করুণ-রসে আপ্লুত হতে চাইছে সেই ঐতিহাসিক উপাদানটি লেখকের রুদ্রবীণায় মন্দ্রিত। আর সেই মূলতানের মূল তানে ঐ মদ্যপ নায়কের মাৎলামি-মাখা অগীত-গান "আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান, তুমি জান নাই, তুমি জান নাই" একটা বেদনবিধুর ঐকতান তুলেছে।

(8) ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যের বিবর্তন:

ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যকে আমরা এখানে দ্বিধারায় বিভক্ত করে আলোচনা করতে চাই। প্রথমত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' দ্বিতীয়ত 'ঐতিহাসিক ছোটগল্প'। আকারে এবং চরিত্রগত পার্থক্যে দু-জাতির হলেও উভয়স্থলেই ঐতিহাসিক রস অনিবার্যভাবে উপস্থিত। একে একে আলোচনা করা যাক।

(8A) ঐতিহাসিক উপন্যাস:

আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন:

> ইতিহাসের কাহিনী নিয়েই আমাদের দেশে গদ্যগল্পের সূত্রপাত। বিগত শতাব্দীর ঠিক মাঝখানে শশিচন্দ্র দত্ত ইংরেজিতে কিছু গল্প লিখেছিলেন ইতিহাস অবলম্বনে। শশিচন্দ্রের পথ অবলম্বন করে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলায় দুটি গল্প লিখেছিলেন।

তার মধ্যে একটি, *অঙ্গুরীয় বিনিময়*, বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী*তে কিঞ্চিৎ ছায়া ফেলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসকে পশ্চাৎপট করে তাঁর রোমান্সগুলির গল্প জমিয়েছেন। তারপর শশিচন্দ্রের স্নেহপালিত ভ্রাতুষ্পুত্র রমেশচন্দ্র দত্ত রীতিমতো ইতিহাস-অনুগত উপন্যাস লিখলেন। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হল।[১১]

রমেশচন্দ্রের খুল্লতাত রায়বাহাদুর শশিচন্দ্র (1824-85) যে কাহিনী লিখেছিলেন তা ইতিহাসের উপাদানে নয়। তাঁর *Reminiscences of a Kerany's life* সমকালীন বাঙালী বাবুদের সরকারী চাকুরীলাভের লোলুপতার বিরুদ্ধে শ্লেষ। *Sankar—a Tale of the Indian Mutiny* আজকের দিনে নিশ্চয়ই ইতিহাস, কিন্তু শশিচন্দ্র তা সিপাহীযুদ্ধের সমকালে দাঁড়িয়ে রচনা করেছিলেন। ফলে তা ইতিহাস নয়। তবে সিপাহীবিদ্রোহের সমকালে রচিত লেখকের একটি পংক্তি না শুনিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যেতে মন সরছে না।

ভবিষ্যতে একদিন ভারতবাসীর সম্মিলীত প্রয়াসে ইংরাজ বাধ্য হবে এ-দেশ ছেড়ে যেতে ···
তখন আধুনিক সমরবিদ্যায় শিক্ষিত ভারতীয়ের অপরিহার্য প্রয়োজন দেখা দেবে।[১২]

ভূদেবচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হোন বা না হোন বঙ্কিমচন্দ্র (1838-94) বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হাতে এসে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন তাঁর নায়কের মতোই দড়বড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে : *দুর্গেশনন্দিনী* (1865)। তার পরের পর্যায়ে *রাজসিংহ* পর্যন্ত আটখানা উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের কমবেশি যোগ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং স্বরচিত একটিমাত্র উপন্যাসকে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-এর মর্যাদা দান করেছেন : *রাজসিংহ*। অন্যান্যগুলি, তাঁর মতে, খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 'বঙ্কিম-শতবার্ষিক-সংস্করণে' আচার্য যদুনাথ সরকার অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর মতে তথ্যগত কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশই 'ঐতিহ্যাসিক উপন্যাস'। অন্তত *দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম* এবং *রাজসিংহ* যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। পরবর্তীকালে এক-এক গবেষক এক-এক কথা বলেছেন। যেমন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে *সীতারাম* ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, যেহেতু তার মুখ্য আবেদন নরনারীর প্রেম, দ্বন্দ্ব ও তার পরিণতি—সমকালীন ইতিহাস নয়। অর্থাৎ যে কারণে আমরা তারাশঙ্করের *রাধাকে* 'ঐতিহাসিক কালের উপন্যাস' বলেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই নাম করতে হয় তাঁর দশ বছরের অনুজ রমেশচন্দ্র দত্তের (1848-1909)। এই আই·সি·এস· অফিসার সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন ইংরেজিতে। তাঁর মোট ইংরেজি রচনার সংখ্যা দশটি—ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি, রাজনীতি সব বিষয়েই। তাঁর একটি গ্রন্থে *(Economic History of British India)* ব্রিটিশ সরকারের ভারত-শোষণ পদ্ধতি এমন সুচারুরূপে উদ্ঘাটিত করা হয়েছিল যে, জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক পরবর্তীকালে তার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, "A book like this does more work than cart-loads of Congress resolutions" ! বঙ্কিমচন্দ্রই তাঁকে বাঙলাভাষার দিকে আকর্ষণ করেন। রমেশচন্দ্রের চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাসই কালজয়ী : *বঙ্গবিজেতা* (বঙ্গদেশ 1874), *মাধবীকঙ্কণ* (শাহজাহাঁর শেষজীবন, 1877), *মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত* (শিবাজী ও আওরঙ্গজীব, 1878), *রাজপুত জীবনসন্ধ্যা* (বঙ্গবিজেতার পরবর্তী রাজপুত কাহিনী, 1879)। রমেশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য *মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতের* ভূমিকাতেই বলেছেনঃ

"পাঠক! একত্র বসিয়া একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাহিব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই যত্ন সফল হইয়াছে। নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবেন না।[১৩]

ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় পরবর্তী নামটি হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর। *বালক* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্ণকুমারী দেবী (1855-1932)। মাত্র একুশ বছর বয়সে রচিত তাঁর *দীপনির্বাণ* (1876) ঐতিহাসিক উপন্যাসে সূত্র-উৎস টড-এর *রাজস্থান*। উপন্যাসের ঘটনার ভিড় কিছু বেশি, এবং আকস্মিকতা তার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবু তরুণী লেখিকা যে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের উন্মাদনায় এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। তারপর *মিবাররাজ* (1887), *হুগলীর ইমামবাড়ী* (1888) এবং *বিদ্রোহ* (1890)। স্বর্ণকুমারীর শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস *ফুলের মালা* (1895)র পটভূমি রাজা গণেশের আমলের বঙ্গদেশ। গবেষক বিজিতকুমারের মতে,

স্বর্ণকুমারী দেবী তখন অভিজ্ঞতার প্রৌঢ় পরিণতিতে আসীন। *ফুলের মালাতে* স্বর্ণকুমারী দেবী সার্থকতায় পৌঁছেছিলেন। *ফুলের মালার* ইংরেজী অনুবাদ 1909 খ্রীষ্টাব্দে মডার্ণ রিভিয়্যুতে বার হয় *The Fatal Garland* নামে।[১৪]

পুঠিয়া স্টেটের শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (1860-1908) কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন—*ফুলজানি, বিশ্বনাথ* এবং *শক্তিকানন*। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সাবডেপুটি কালেকটর। তিনখানি উপন্যাসের কোনটিই ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়নি। নানা কারণে। কিন্তু তাঁর শেষজীবনে আলিবর্দীর রাজত্বকালের পটভূমিকায় মেদিনীপুরের এক ভূস্বামী পদাঙ্কনারায়ণকে নায়ক করে যে কাহিনী লিখলেন—*রাইবণীদুর্গ* (1906), তা সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথের *বউঠাকুরাণীর হাট* প্রকাশিত হয়েছিল 1882 খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ কালের মাপে ততদিনে বঙ্কিমের প্রায় সব কয়টি এবং রমেশচন্দ্রের চারখানি গ্রন্থই প্রকাশিত কিন্তু কবিজ্যেষ্ঠা স্বর্ণকুমারীর পাঁচখানির ভিতর মাত্র একটিই প্রকাশিত—দীপনির্বাণ (1876)। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় গ্রন্থরচনার পূর্বে রামরাম বসুর *প্রতাপাদিত্য চরিত্র* এবং দুইখণ্ডে প্রকাশিত প্রতাপচন্দ্র ঘোষের *বঙ্গাধিপ পরাজয়*এর (1869) প্রথম খণ্ড পড়েছিলেন (দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থপ্রকাশের দুই বছর পর)।

বউঠাকুরাণীর হাট বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসে একটি জলবিভাজন রেখা। ইতিপূর্বে কী বঙ্কিম, কী রমেশচন্দ্র, কী স্বর্ণকুমারী, কী শ্রীশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন স্বাদেশিকতার উন্মাদনায়, দেশাত্মবোধের উৎসাহে। এই প্রথম দেখা গেল একজন কথাসাহিত্যিককে যিনি নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠায় খাঁটি ইতিহাসকে উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে মেশাতে চান। ইতিপূর্বে রাজা-রাজড়াদের বীরত্ব গাথাই ছিলই এ জাতীয় কাহিনীর উপজীব্য। 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' নীতিবাক্যটি সকলেই মেনে চলতেন। সেই সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির এক বালকের 'প্রাচীর-ঘেরা মন বেড়িয়ে পড়ল বাহিরে তখন, সংসারের বিচিত্র পথে তার যাতায়াত

আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলে। তারই প্রথম প্রকাশ দেখা দিল: *বউঠাকুরাণীর হাট* গল্পে—একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারে, সেও অল্পবয়সেরই খেলা।[১৫]

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে রচনাবলীতে সংকলনের সময়ে পরিণত বয়সে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ *বৌঠাকুরাণীর হাট*-এর ভূমিকায় লিখেছেন:

> এই উপলক্ষ্যে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময় বাংলা দেশের বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময় তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক। দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।[১৬]

এই উদ্ধৃতিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এ-কারণে যে, স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময় আদর্শ বীর চরিত্ররূপে খাড়া করবার যে প্রচেষ্টার কথা রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন তার পুরোভাগে ছিলেন তাঁরই ভাগিনেয়ী স্বনামধন্যা সরলা দেবী চৌধুরাণী। স্বর্ণকুমারীর কন্যা। 1903 সালে সরলা দেবী চৌধুরাণী মহারাষ্ট্রের 'শিবাজী উৎসব'-এর অনুকরণে কলকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব'-এর পালন করেন। রবীন্দ্রনাথ শিবাজী উৎসবে দীর্ঘ কবিতা লিখে ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তবাসীদের সঙ্গে দেশাত্মবোধের মহাযজ্ঞে আত্মিক সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু ইতিহাসকে অস্বীকার করে বোন্‌ঝিকে সমর্থন করতে পারেননি। সাহিত্যিকের ইতিহাসনিষ্ঠার এটি এক দুর্লভ উদাহরণ।

তা হোক, কিন্তু *বউঠাকুরাণীর হাট* পুরোপুরি ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসের প্রশংসা করেছিলেন। সম্ভবত তরুণ লেখকের ভিতর প্রচণ্ড সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে বলেছেন

> চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। তারা আপন চরিত্রবলে অনিবার্য পরিণামে চালিত নয়, তারা সাজানো জিনিস—একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে।

তাঁর পরবর্তী উপন্যাস *রাজর্ষিতে (1886)* উপন্যাস ও ইতিহাস হাত মিলিয়েছে। রাজা গোবিন্দমানিকের অহিংসা আর রঘুপতির সংস্কারাচ্ছন্ন হিংসার দ্বন্দ্ব যেন দুদিকই বজায় রেখে চলেছে। তাই সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের মেন লাইনে পরবর্তী জংশন-স্টেশন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর (1853-1931) বেণের মেয়ে (1915)। বলা বাহুল্য *রাজর্ষি* আর *বেণের মেয়ের* মাঝখানে অনেকগুলি ছোট ছোট স্টেশন আছে যেখানে লোকাল ট্রেন দাঁড়ায়। হারানচন্দ্র সাহার *রণচণ্ডী (1876),* সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *জাল প্রতাপচাঁদ* (1882), কালীপ্রসন্ন দত্তের সিপাহীযুদ্ধ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস *বিজয়* (1884), নগেন্দ্রনাথ গুপ্তেরও সিপাহীবিদ্রোহমূলক *অমর সিংহ* (1889), প্রভৃতি প্রায় সমকালের রচনা—কিছু আগে-পরের। কিন্তু সেসব স্টেশনে গবেষক ভিন্ন আর কোন ডেলি-প্যাসেঞ্জার ওঠা-নামা করে না। স্বয়ং হরপ্রসাদের প্রথম প্রচেষ্টাও *কাঞ্চনমালা* প্রথমে বঙ্গদর্শনে, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর *বেণের মেয়েকে* এই ধারাবাহিকতার ইতিহাসে দিকচিহ্ন বলতে হচ্ছে বিশেষ হেতুতে।

কাঞ্চনমালায় হরপ্রসাদ ছিলেন বঙ্কিমের অনুগামী একজন গতানুগতিক কথাসাহিত্যিক;

কিন্তু বত্রিশ বছর পরে *বেণের মেয়েতে* তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা নূতন দিকদর্শকরূপে উপস্থিত। ভূমিকায় লেখক বলেছিলেন:

> *বেণের মেয়ে* ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেন না, আজকালকার বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখনো হইতেও চাই না। *বেণের মেয়ে* একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে, এও তাই। তবে এতে বাঙ্গালার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল। বাঙালি এখন কেবল একেলে গণিকাতন্ত্রের উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সেকেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন?[১৭]

বেণের মেয়েতে রাজা হরিবর্মদেব এবং মহীপালের উল্লেখ আছে। যুদ্ধের পটভূমিকা সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিত* কাব্য অনুসারী, যদিচ যুদ্ধ বর্ণনা অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘনরাম ও মানিকরামের অনুসরণে। যোদ্ধারা ডোম ও বাগ্‌দী। ভবদেব ভট্টও ঐতিহাসিক ব্যক্তি। লুই সিদ্ধাও তাই। কিন্তু হরপ্রসাদের কৃতিত্ব এই যে, তিনি 'ইতিহাস' বলতে রাজা-রাজড়ার কীর্তি-কাহিনী বোঝেননি। সমকালের সাধারণ মানুষের ছবি এঁকে গেছেন নিপুণ তুলিতে। ধনপতি-শ্রীপতি বা চাঁদ-সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার রীতিনীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত, কিন্তু নৌকার গলুই-য়ের অন্তরালে মাঝি-মাল্লাদের সুখ-দুঃখের কথা জানতাম না। বিলাসব্যসনে মগ্নচৈতন্য ধনীর পায়রা-ওড়ানোর বর্ণনা জানা ছিল। কিন্তু তাঁদের দেহরক্ষী বাগ্‌দী, ডোম লাঠিয়ালদের কথা এতদিন শোনা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'কে সার্থক হতে হলে যে শর্ত আরোপ করেছিলেন—মহাকালের রুদ্রবীণার বিচিত্র গম্ভীর ধ্বনি—হরপ্রসাদ যেন তার এক করোলারি এনে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'মহাকাল'-এরও তো নানান রূপ! রুদ্রবীণার বদলে তিনি খেয়াল হলে মাঝে মাঝে খঞ্জনীও বাজান, কিংবা বাঁশি, এমনকি গুবগুবি।

আচার্য সুনীতিকুমারের মতে:

> রমেশচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস যে বাংলার শ্রেষ্ঠ রসরচনা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এঁদের বইয়ে কিন্তু ইতিহাস ব্যাপারটা গৌণ, মুখ্যবস্তু হচ্ছে ঘটনার সমাবেশ ও চরিত্রচিত্রণ। রাখালদাসের গুরু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর *বেণের মেয়ে* উপন্যাসে যে-ভাবে প্রাচীন সামাজিক বাতাবরণকে জিইয়ে তুলেছেন তা অদ্ভুত। তাঁর পূর্বে এ-বিষয়ে আর কেউ এতটা সার্থকতা দেখাতে পারেননি। রাখালদাস আরও পরবর্তীকালের পূর্ণতর তথ্যসম্ভার নিয়ে ইতিহাস আলোচনার আধারভূমিতে দাঁড়িয়ে যে কয়খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন তা একাধারে উপন্যাস আর অনবদ্য ঐতিহাসিক চিত্র।[১৮]

হরপ্রসাদের পরের ধাপ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (1885-1930)। এবারেও এই গুরুশিষ্যের মাঝখানে অনেকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস এসেছে। শরৎকুমার রায়ের *মোহনলাল* (1906) একটি সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস। গ্রন্থের নামকরণ যদিও নায়কের নামে, প্রধান চরিত্র খলনায়ক উমীচাঁদ। সে যেন শেক্সপীয়ারের ইয়াগো আর শাইলকের মিলিত ফল। তার ছলনায় সকলেই ফাঁদে পা দিয়েছে: রাণী ভবানী, তারাসুন্দরী, মীরণ, মীরজাফর, মোহনলাল, সিরাজ। দুর্গাদাস লাহিড়ীর *রাণী ভবানী* (1909), দীনেন্দ্রকুমার রায়ের *নানাসাহেব* (1929) এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অসমাপ্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস *ডঙ্কা নিশান*।

পরবর্তী দিকচিহ্ন : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁর সাতখানি উপন্যাস উল্লেখের দাবী রাখে : *শশাঙ্ক* (1914), *করুণা* (1915), *ধর্মপাল* (1916), *ময়ূখ* (1917), *অসীম* (1925), *লুৎফউন্না* (1928), এবং *ধ্রুবা* (1932).

আচার্য সুকুমার সেনের মতে :

> রাখালদাস ইতিহাসের পাঠক ছিলেন না, ছিলেন ইতিহাসের গবেষক এবং ইতিহাসের লেখক। ইনি ইতিহাস বিদ্যাকে অধিগত করেছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসের ঐতিহাসিক মালমশলা টাট্‌কা সব্‌জির মতো স্বাদু। রাখালদাসের উপন্যাস পড়লে ইতিহাস পড়ার ফল হয়।.... সাধারণ পাঠকের কাছে রাখালদাসের উপন্যাস—বোধকরি *ময়ূখ* ছাড়া—যতটা সমাদর পাওয়া উচিত ছিল ততটা পায়নি। সে দোষ সম্পূর্ণ সাধারণ পাঠকের নয়।[১৯]

সৌজন্যবোধে সুকুমার সেন-মশাই যে-কথা ইঙ্গিতে বলে থেমেছেন,আমাদের তা স্পষ্টাক্ষরে বলতেই হবে। ইতিহাস সম্বন্ধে বৈদগ্ধ্যই সার্থক 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'-রচনার ছাড়পত্র নয়! সাহিত্য রচনার প্রসাদগুণও সমানভাবে প্রয়োজন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে দুটি রসই থাকা চাই—ইতিহাস ও সাহিত্য। তাদের সুষম বণ্টনে রচনার সার্থকতা। *রাজসিংহ-এ* ঐতিহাসিক-রসের প্রাবল্য, প্রধান চরিত্রগুলি অধিকাংশই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। কিন্তু *দুর্গেশনন্দিনীতে* তা নয়। নায়ককে পিতৃপরিচয়ে সহজেই সনাক্ত করা যায়। নায়িকার পরিচয় বুড়ো ইতিহাসের মনে থাকত না যদি না বঙ্কিমবাবু তাকে পুনর্জীবিত করতেন। একই কথা *দেবী চৌধুরাণী* প্রসঙ্গে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বা ফকির বিদ্রোহের সুবিখ্যাত নেতা মজনু শাহ্ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের এজলাসে পাত্তাই পেলেন না, লেখক হান্টার না গ্লেজিয়ার কোন সাহেবের সংকলিত নথীপত্র ঘেঁটে উদ্ধার করলেন *দেবী চৌধুরাণীকে*। এখানে চার আনা ইতিহাস, বারো আনা উপন্যাস। আর *কপালকুণ্ডলা*? পনের আনার পর সাড়ে-তিন কপর্দক উপন্যাস। আড়াই-গণ্ডা ইতিহাস উঁকি দিচ্ছে যখন মেহের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সেলিম ভারতের সিংহাসনে, আমি কোথায়!"

য়ুরোপীয় সাহিত্যেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। স্কট অতীতকে জীবন্ত করতে গিয়ে জীবন্ত মানুষ আমদানী করেছেন। *আইভ্যান হো*-তে প্রথম রিচার্ড ও জন উপস্থিত; কিন্তু তাঁদের ভূমিকা মুখ্য চরিত্রের নয়। অপরপক্ষে যাঁরা মুখ্য চরিত্র তাঁরাও নিতান্ত সাধারণ মানুষ নন—বীরত্ব, শিভ্যালরি, আত্মসম্মান ইত্যাদি নিয়েই তাঁদের চিন্তার জগৎ। তুলনায় থ্যাকারের *হেনরি এসমণ্ড*-কে চিহ্নিত করা যায় বাস্তববাদী ধারায়। আর ডিকেন্স-এর *দুই নগরীর কাহিনীতে* লেখক 'বাস্তববাদী-রোমান্টিক'। নায়ক নায়িকার রোমান্টিক প্রেম আর আত্মত্যাগের পাশাপাশি জ্যাকোবিনদের ষড়যন্ত্র, নৃশংসতা, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের বিস্ময় জাগায়। মনে প্রশ্ন জাগে—কে নিখুঁত? সিডনে কার্টন, না ম্যাডাম ড'ফার্জ? এর পাশাপাশি দেখুন টলস্টয়ের *যুদ্ধ ও শান্তি*। এপিক ঐতিহাসিক উপন্যাস! ঐতিহাসিক নরনারী সাধারণ মানুষের মধ্যে মিশে গেছেন বললেই যথেষ্ট হয় না—প্রমাণ করেছেন তাঁরাও রক্তমাংসে-গড়া সাধারণ মানুষ—ঐ নেপোলিয়ান আর কুটুজোভরা। তাঁদের অসি-ঝঞ্ঝনা আর বীরত্বমহিমাকে সমাচ্ছন্ন করে মূর্ত হয়ে উঠেছে অগণিত সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, হাসি-অশ্রুর খণ্ডকাহিনী: আন্দ্রে, নাতাসা, পিয়ের, প্লাতো প্রভৃতি। ইতিহাসের সমান্তরালে সমান তরঙ্গবেগে চলেছে মানবসত্যের

নিত্য প্রবহমান ধারা। টলস্টয়ের যুদ্ধ *আর শান্তি* পড়তে পড়তে উপলব্ধি হয় লুকাস-এর উক্তির যাথার্থ্য

> Truth lies in the secrets of human hearts, whose interaction are neglected by the historians. The characters of a novel are forced to be more rational than historical characters.

এইসব কথা মনে রাখলে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না—মহাপণ্ডিত হরপ্রসাদ এবং রাখালদাসের বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি কেন জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সেই ধারাটি পরবর্তীকালের অনেক অনেক কথাসাহিত্যিককে আকৃষ্ট করেছে। আজও তা রচিত হচ্ছে। নমুনা স্বরূপ কয়েকটির নামোল্লেখ করি: *পদসঞ্চার, উপনিবেশ, অমাবস্যার গান, গোপালদেব, কালের মন্দিরা, গৌড়মল্লার, লালকেল্লা, বহ্নিবন্যা, কেরী সাহেবের মুন্সী, জব চার্ণকের বিবি, লালবাঈ, সেই সময়।*

কিন্তু আকারে ছোট হওয়ায়, উপন্যাসের স্বীকৃত লক্ষণাদি না দেখতে পেয়ে ইতিহাস-রসমণ্ডিত কথাসাহিত্যের আর একজাতির বেসাতিকে কী নামে অভিহিত করব? আমরা তাদের বাধ্য হয়ে বলেছি 'ঐতিহাসিক ছোট গল্প'।

এবারেও আমাদের মতে তা দু-জাতের।

একটি ধারা: **ঐতিহাসিক ছোটগল্প**—যেখানে ঐতিহাসিক-রস কাহিনীতে মিশ্রিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধারা: **ঐতিহাসিক-কালের ছোটগল্প**—যেখানে ইতিহাস অনুপস্থিত, হয়তো ঐতিহাসিক কালটি অনির্দিষ্ট—শুধু বোঝা যায়, তা দূরকালের কাহিনী। বিশেষ প্রয়োজনে লেখক কয়েকটি কল্পিত চরিত্রকে দূরকালের পটভূমিকায় এঁকেছেন!

ঐতিহাসিক ছোটগল্প: *নববাবুবিলাস*-এর (1825) অস্তিত্ব সত্ত্বেও যেমন ধরা হয় *দুর্গেশনন্দিনী (1865)* বাংলাসাহিত্যে প্রথম উপন্যাস, তেমনি বোধহয় আমরা ভূদেবচন্দ্রের *অঙ্গুরীয় বিনিময়*-এর (1857) অস্তিত্ব সত্ত্বেও ধরে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথের *দালিয়া* (1891) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক ছোটগল্প। তার কাঠামোটা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, উপন্যাস হতে-হতে নেহাৎ ভাগ্যক্রমে সেটি ছোটগল্প হয়ে গেছে। আট পৃষ্টার গল্পাংশ ছয়টি পরিচ্ছদে বিভক্ত, তদুপরি একটি ভূমিকা। যেন উপন্যাসের প্রথম খসড়া!

সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতি মাঝে-মাঝে ঐতিহাসিক ছোটগল্প লিখেছেন বটে কিন্তু শরদিন্দুর মতো একাত্ম হয়ে এই শাখাটিতে নিবদ্ধদৃষ্টি হননি। প্রাক-শরদিন্দু কালে মুসলমান-যুগ, শাহী দরবার, রাজপুতানা ও মহারাষ্ট্র নিয়েই লেখকেরা মেতে ছিলেন; শরদিন্দু তাই শুধু মুস্‌লিম অধিকারকালে আবদ্ধ না থেকে বিভিন্ন যুগ এবং বিচিত্র দেশ থেকে তাঁর কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ করেছেন। আঙ্গিকের দিক থেকে কাহিনীগুলি দু-জাতের:

প্রথম দলে দূর-ইতিহাসের সঙ্গে শরদিন্দু বর্তমান কালের মেলবন্ধন করেছেন। এর অধিকাংশের মূলে 'জাতিস্মর' পরিকল্পনা। আচার্য সুকুমার সেন বলছেন: 'শরদিন্দুবাবু জাতিস্মর ঘটনায় বিশ্বাসী ছিলেন কিনা ঠিক জানি না'। তা থাকুন-না-থাকুন পাঠককে তিনি বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছেন। কোন কোন কাহিনীতে জাতিস্মর-তত্ত্ব স্বীকার না করেও অতীত ও বর্তমানের

অদ্ভুত মেল-বন্ধন করা হয়েছে; যেমন, *ইন্দ্রতুলক, চন্দনমূর্তি*। শরদিন্দুর এই অতীত-বর্তমান একাকার করে দেওয়া যে-সব কাহিনী—*অমিতাভ, মৃৎপ্রদীপ, চন্দনমূর্তি, রক্তসন্ধ্যা, রুমাহরণ, ইন্দ্রতুলক, সেতু*—তার গঙ্গোত্রী বোধকরি গল্পগুচ্ছের ছোট গল্প *দুরাশা* (1898)। শরদিন্দু বলেছেন জাতিস্মর তত্ত্বটা তাঁর মস্তিষ্কে উদয় হয় জ্যাক লন্ডনের একটি উপন্যাস পাঠ করে। *দুরাশার* লেখক বুট জুতা এবং ম্যাকিন্টশ, বার্ডস্ আই আর ফেল্ট-হ্যাট সম্বল করে দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোডের কুয়াশা-ঢাকা একান্তে যে কাহিনীর অবতারণা করলেন তাতে ঐতিহাসিক রস ভরপুর:

> নবাবজাদীর ভাষামাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজরচিত আধুনিক শৈলনগরী দার্জিলিঙের ঘনকুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগলসম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেতপ্রস্তররচিত বড়ো বড়ো অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ মছলন্দের সাজ, হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণঝালরখচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্র বর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেশমের মস্‌লিনের প্রচুরপ্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারি, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্রশীর্ষ—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।[২০]

এ কাহিনী যেদিন রচিত হয় তার পর বৎসর জন্মগ্রহণ করেন শরদিন্দু। কিন্তু এই ভাষা, এই আঙ্গিক, এই রসপরিবেশনের শৈলী তাঁর জন্যেই প্রতীক্ষা করেছিল দীর্ঘদিন,গল্পগুচ্ছের পৃষ্ঠায়।

দ্বিতীয় জাতের গল্পে বর্তমান কাল অনুপস্থিত। পাঠককে সরাসরি ঐতিহাসিক কালে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। কাহিনীর শুরু ও শেষ অতীতে: *বাঘের বাচ্চা, অষ্টম সর্গ. চুয়াচন্দন, বিষকন্যা, শঙ্খ-কঙ্কণ, রেবা-রোধসি* প্রভৃতি।

এ তো গেল 'কাল'-এর বিচার। এবার কাহিনীর গঠন-চাতুর্যের প্রসঙ্গে আসা যাক। ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো এই ছোট গল্পগুলিতেও ইতিহাস আর কাহিনী, বাস্তব আর কল্পনার অনুপাতে গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। কোথাও মূলচরিত্রগুলি ইতিহাসের পরিচিত নরনারী। ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক। যেমন *মৃৎপ্রদীপ, অষ্টম সর্গ, তক্ত-মুবারক, রক্তসন্ধ্যা*। কোথাও বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে মঞ্চে উপস্থাপিতই করা হয়নি, যেমন *সেতু*। 'দেবপাদ কনিষ্ক' নামটা সে গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে শুধুমাত্র কালটাকে চিহ্নিত করতে। যেমন গল্পগুচ্ছের *দালিয়া*; 'শাহ্ সুজা'র নাম শুধুমাত্র ভূমিকা অংশেই নিঃশেষিত। কখনো বা ঐতিহাসিক বস্তু, ব্যক্তি বা কালের ইঙ্গিতমাত্র করা হয়নি যথা: *মরু ও সঙ্ঘ, রুমাহরণ*।

মুজতবা আলী একবার বলেছিলেন:

> ক্লাইমেক্স্ আবিষ্কার মোপাসাঁর একান্ত নিজস্ব। মোপাসাঁর পর বিস্তর লোক এনতার ছোটগল্প লিখেছেন, কেউ কেউ মোপাসাঁর চেয়ে ভাল লিখেছেন; কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সব গল্পই মোপাসাঁর ছাঁচে ঢেলে গড়া। মোপাসাঁ যে কাঠামোটি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কাঠামোটিতে কোন ফেরফার করার সাহস কারও হল না। চেখফ্ই প্রথম এই কাঠামোতে হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, ক্লাইমেক্স্ বাদ দিয়েও সরেশ ছোট গল্প লেখা যায়। .... আর রবীন্দ্রনাথের গল্প মোপাসাঁ চেখফ্ দুজনের গল্পকেই হার মানায় তার গীতিরস দিয়ে।[২১]

শরদিন্দু অম্নিবাসের ষষ্ঠখণ্ডে সতেরটি ঐতিহাসিক ছোটগল্প সংকলিত। প্রকাশক আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, ঐ হচ্ছে 'সমুদয় ঐতিহাসিক ছোটগল্প'। আমরা যদি বিচার করে দেখি,

তাহলে নজরে পড়বে আলী-সাহেবের শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে তিনজাতের ছোটগল্পই শরদিন্দু লিখেছেন।

মোপাসাঁ-ধর্মী—আরও সহজে চেনা যাবে যদি বলি 'ও-হেন্‌রিধর্মী'—এক জাতের ঐতিহাসিক ছোটগল্প রচিত হতে পারে যা নাকি অন-ঐতিহাসিক গল্পে সম্ভব নয়। এই কায়দাটিকে ইংরেজীতে বলে 'টুইস্ট ইন দ্য টেইল' [অ্যালিস-বর্ণিত মার্জারকথিত মূষিককাহিনী অনুসরণে বানান tail এবং tale দুইই হতে পারে]। বাঙলা কথাসাহিত্যে এ পারদর্শিতায় ও'হেনরির অনবদ্য তুলনা বনফুল। কিন্তু দুজনের কারও পক্ষেই শরদিন্দুর প্যাঁচ কষা সম্ভবপর নয়। কারণ প্যাঁচটা হচ্ছে কাহিনী-বর্ণিত চরিত্রগুলির ঐতিহাসিক পরিচয় শেষ মুহূর্তে উদ্‌ঘাটন। ও'হেনরি বা বনফুল এ কায়দা করলেই তাঁদের ঐতিহাসিক ছোট-গল্পকার হয়ে যেতে হত। পাঠক যদি ইতিহাসে আলিম হন তাহলে দু-চার লাইন পড়েই মুখ টিপে হাসবেন; আর আমার মতো গোলামার্কা হলে একেবারে শেষ পংক্তিতে পৌঁছে বিরিঞ্চিবাবার মাহাত্ম্যটা সম্‌ঝে নিয়ে বলবেন: মাই গড! ইনি গৌটামা বুড্‌ঢার সঙ্গে.....

ধরুন, *বাঘের বাচ্চা*। শরদিন্দু কাহিনীতে বৃদ্ধ ও বালকের নাম দুটি এড়িয়ে চলেছেন। এমনকি কাহিনীর শেষেও বাঙালীর অপরিচিত বানানে মারাঠী নাম দুটি লিখিত হল 'শিব্বা' এবং 'দাদোজী কোণ্ডু'রূপে। তবু পাঠক নিজের ইতিহাসজ্ঞানের মাপকাঠিতে কাহিনীর কোথাও না কোথাও চরিত্র দুটিকে সনাক্ত করবে এবং তৎক্ষণাৎ আবিষ্কারের বিমল আনন্দলাভ করবে। এবার ঐ বৃদ্ধ এবং বালকের কিছু কথোপকথন নমুনাস্বরূপ দাখিল করি:

> বালক বিস্মিত হইয়া বলিল, 'কিন্তু এরকম (সংখ্যাগরিষ্ঠ ডাকাতদলের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে লড়াই করে) মরে লাভ কী দাদো?' তারপর মাথা নাড়িয়া বলিল, 'আমি কিন্তু লড়ি না, তীরের মতো এই ধার বেয়ে পালাই। এত জোরে পালাই যে, ডাকাতের বর্শা আমাকে ছুঁতেও পারবে না।'
>
> ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে দাদো বলিলেন, 'ক্ষত্রিয়ের ছেলে তুমি, দুশমনের সামনে থেকে পালাবে? এই না বলছিলে ভয় কাকে বলে জানো না?'
>
> বালক বলিল, 'ভয়। পালানোর সঙ্গে ভয়ের সম্পর্ক কী? পালাব, কারণ পালালেই আমার সুবিধা হবে। পরে ওদের জব্দ করতে পারব। আর লড়ে যদি মরেই যাই, তাহলে তো ডাকাতদেরই জিত হল।'
>
> দাদো মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না, না, এসব শিক্ষা তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ? না লড়ে পালিয়ে যাওয়া ভয়ংকর কাপুরুষতা। যে বীর, সে কখনো পালায় না। রাজপুত বীরদের গল্প শোননি?'
>
> বালক বলিল, ' রাজপুতদের গল্প শুনলে আমার গা জ্বালা করে। তারা শুধু লড়াই করতে পারে, বুদ্ধি এতটুকু নেই। যিনি যত বড় বীর, তিনি তত বড় বোকা।'[২২]

পড়ে,মনে হয়—রমেশচন্দ্র মোটা মোটা দুখানি উপন্যাসে যা বলতে চেয়েছিলেন শরদিন্দু এখানে তা 'শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি' বলে শুনিয়ে গেলেন। একটি অনুচ্ছেদে *'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'* এবং *'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'*-এর নির্যাস। শরদিন্দুর এই কাহিনীটি অন্যান্য কাহিনীর মতো জনপ্রিয় নয়। তার হেতু এটি এতই উচ্চমানের যে, জনপ্রিয়তা গুণ এখানে প্রত্যাশিত নয়। মোহিতলাল মজুমদার একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে শরদিন্দুকে *চুয়াচন্দন* বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে

লেখেন (তাতে *চুয়াচন্দন* ব্যতিরেকে *মরু ও সঙ্ঘ, রক্তসন্ধ্যা, বিষকন্যা* প্রভৃতি জনপ্রিয় গল্পগুলি ছিল)

> *চুয়াচন্দন*-এর গল্পগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে *বাঘের বাচ্চা*। একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ইহাকেই বলে, reconquest of antiquity. ইহা আপনার ঐতিহাসিক কল্পনার একটি চূড়ান্ত নিদর্শন (চিঠি, ব্যক্তিগত, তাং 8.9.1940)।[২৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর একটি ছোটগল্পে (নাম মনে পড়ছে না) একটি অসাধারণ ও'হেনরি জাতীয় ওস্তাদের মার শেষরাত্রে মেরেছেন। নদীয়া জেলার ছেলে মেঘনা পার হতে গিয়ে নৌকাডুবি হয়ে মৃত্যুমুখে পড়েন। মাঝি যখন বলছে, 'বাবু আমার কাঁধে ভর দিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করুন', তখন বাবু বললেন, 'আমি ডুবে মরি ক্ষতি নেই, তুমি এই পুলিন্দাটা পৌঁছে দিও ওপারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে।' মাঝি জানতে চায় ঐ পুলিন্দাতে কী আছে? বাবু বলেন, একটা নাটকের পাণ্ডুলিপি, মানে যাত্রার পালা-গান আর কি!

কাহিনীর শেষ পর্যায়ে পাঠক জানতে পারে বাবু হচ্ছেন দীনবন্ধু মিত্র, ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব বঙ্কিমচন্দ্র এবং পালাগানটা হচ্ছে *নীলদর্পণ*। অসাধারণ 'টুইস্ট ইন দ্য টেইল'!

দু-একটি ক্ষেত্রে এই শেষ প্যাঁচ মারার উৎকট উৎসাহে শরদিন্দু যে কাণ্ডটা করেছেন তাকে 'ক্রিকেট' বলা যায় না। আমরা কী বলি তা অনুক্ত থাক, সেটা শ্রুতিকটু।

শরদিন্দুর বিচিত্র ভাষায় তা 'হস্তলাঘবতা'। ধরুন *আদিম* গল্পটিতে। লেখক প্রথম পংক্তিতে বললেন, "এই কাহিনীতে আদৌ স্থান-কাল-পাত্রপাত্রীদের প্রকৃত নাম বদল করিয়া লিখিতেছি।" আমরা মনে মনে বলি, 'বুঝেছি। যেমন শিবাজীকে 'শিব্বা', দাদাজী কন্বদেওকে 'কণ্ডু'।

শরদিন্দু ঐ সুবাদে মিশরের রাজার নাম দিলেন 'সূর্যশেখর', পত্তিনায়কের নাম 'সোমদত্ত'। বুঝুন? কে আন্দাজ করবে দেশটা মিশর? যুদ্ধপ্রত্যাগত পত্তিনায়কের সঙ্গে বিবাহ স্থির হয়ে আছে তার সহোদরা ভগিনীর! পাঠক চমকে উঠে লাইনটা দুবার পড়ে। শরদিন্দু হাসতে হাসতে বলেন, "অমন চমকে উঠলে কেন হে? হবেই তো! ওর বাবা-মাও তো ছিল সহোদর ভাই বোন! কেন? সে-কথা বলিনি?" শেষপ্যাঁচটা মারবার জন্য লেখক নীল 'নদ'কে তিন-তিনবার 'নদী' বলেছেন। এটি বোধকরি শরদিন্দুর ও'হেনরিধর্মী নিকৃষ্টতম গল্প।

শেষ চমকটা যে ঐতিহাসিক ধাক্কা হতেই হবে এমন কোন নিয়ম নেই। মোপাসাঁধর্মী অন-ঐতিহাসিক গল্পের শেষ চমক নানান জাতের হতে পারে। কখনো তা নিয়তির নিদারুণ নিষ্ঠুরতা (*নেকলেস*), কখনো ভালবাসার কাছে ভাগ্যের পরাজয় (*গিফ্‌ট্ অব দ্য ম্যাজাঈ*) আবার কখনো বা সতীত্বপনার মান-নিরুপণ (*বুল দ্য সুফ*)।

যে কোনও প্রতিষ্ঠিত চরিত্র কাহিনীর শেষে ভিন্ন রকম আচরণ করলে আমরা চমকে উঠি। সেটাও চমক বা stunt! শরৎচন্দ্রের বিপ্রদাস যদি শঙ্করের *চৌরঙ্গি*তে স্ট্রিপ-টিজ নাচের আসরে উপস্থিত হন, অথবা গোরা যদি পরশুরামের অ্যাংলো মোগলাই 'কেফ্'-এ এসে 'ডবল ডিমের রাধাবল্লভী' অর্ডার দিয়ে বসেন তাহলে আমাদের প্লীহা কম্পন উপস্থিত হবেই। বস্তুত *দৃষ্টিপাত*-এর শেষপাতে আধারকারের কাহিনীতে এমন একটি অযৌক্তিক স্টান্ট-এর ধাক্কা আজও ভুলতে পারিনি। মনে হয়েছিল, এমনটা যে হতে পারে তার কোনও ইঙ্গিত লেখক নায়িকার চরিত্রচিত্রণে কোথাও দেননি, এ হয় না! এ চমক মেলোড্রামাটিক!

ঠিক একই কাণ্ড ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের *দুরাশা* গল্পে। ঐতিহাসিক ছোটগল্প। যদিও ইতিহাস কালের-মাপে সাঁইত্রিশ বছর অতীতের। 1895-এ লেখা সিপাহী বিদ্রোহের গল্প। ওস্তাদ শেষ

রাত্রে অনুরূপ ধাক্কা মারলেন! নিষ্ঠাবান নায়ক 'বিপ্রদাস' অথবা 'গোরা'র অপেক্ষা কম শুদ্ধাচারী নয়। তার পরিবর্তন দেখে চিৎকার করে বলতে গেলাম, "এমনটা যে হতে পারে তার কোনও ইঙ্গিত লেখক কোথাও দেননি, ..."

বাকিটা বলা গেল না। মনে হল, তবু এমনটাও হয়! নায়ক তো দেবতা নয়, সে যে জানোয়ার—না হলে ওভাবে নায়িকাকে আঘাত করতে পারে? না, না, কী বলছি! নায়ক তো জানোয়ার নয়, সে যে দেবতা—না হলে মৃত্যুমুহূর্তে যবনস্পর্শিত পিপাসার পাত্র ওভাবে সরিয়ে রাখতে পারে? সব শেষে অনুভব হয়—নায়ক দেবতাও নয়, দানবও নয়, সে নিতান্তই: মরমানুষ!

আর তাতেই শেষ ধাক্কাটা ড্রামাটিক, মেলোড্রামাটিক নয়!

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে এখানে আরও একটি কথা বলি। ঐ যে পাঠকের মনে হল 'এমনটা যে হতে পারে তার কোনও ইঙ্গিত *দুরাশা*-র লেখক কোথাও দেননি', সেটা ঠিক নয়। দিয়েছেন। কাহিনীর মধ্যেই। কিন্তু পাঠক তা খেয়াল করে দেখে না। শেষ চমকটা তাই 'প্রাপ্যপ্রাপ্তি'—নাকের উপর চশমা তুলে চশমা খোঁজা। কেউ দেখিয়ে দিলে তবে টের পাওয়া যায়। অথবা ন্যায়ের 'নস্যসূত্র' বা 'নাসাসূত্র'। সেটা কী জানেন তো? এমন সুনিপুণ কায়দার শিরশ্ছেদ করা হল যে, লোকটা টেরই পেল না। তখন লোকটার নাকে নস্য দিতে হয়। হতভাগ্য নিজের মৃত্যুর কথাটা টের পায় যখন 'হ্যাচ-চো' বলার সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডটা ছিট্‌কে পড়ে!

চেখফ্‌ধর্মী ঐতিহাসিক ছোটগল্প অনেকগুলি লিখেছেন শরদিন্দু—অর্থাৎ যেখানে ওস্তাদের মার শেষ রাতে বা 'ত্রি-ইন-ওয়ান আইসক্রীমের কাপ' নিমন্ত্রণবাড়ির শেষপাতে আচম্‌কা পরিবেশন করা হচ্ছে না। মেনুকার্ড ফেলা আছে চোখের সামনে। যেমন: *রক্তসন্ধ্যা*। পাঠককে প্রথমেই জানিয়ে দেওয়া হল মীর্জা দাউদ কী-ভাবে পরজন্মে প্রতিশোধটা নিল, তারপর বলা হল কীসের প্রতিশোধ। 'বৈরীনির্যাতন' যেখানে পরিবেশ্য রস, সেখানে ঘটনার পর্যায়ক্রমে একটা চিরাচরিত রীতি আছে—বেদব্যাসের শকুনি থেকে মুদ্রারাক্ষসের চাণক্য, সবাই সেটা মেনে চলেছেন। এখানে শরদিন্দুবাবু তা মানলেন না। তাই বলে কি 'ক্ল্যাইম্যাক্স' নেই! আছে। চোখ বুঁজলে আরবসাগরের লালে-লাল আকাশটা দেখতে পাই।

বিভূতিভূষণের *স্বপ্ন – বাসুদেব* গল্পটির কথা বিবেচনা করুন। ঐতিহাসিক উপাদান নিক্তি-ভর—আছে-কি-নেই। তক্ষশীলায় প্রাপ্ত একটি গরুড়স্তম্ভের ভগ্নাবশেষে উৎকীর্ণ করা একটি পংক্তি—সেটি একজন গ্রীক-এর দান। কেন? কেন? একজন অহিন্দু বিদেশী হঠাৎ গ্যাঁটের দীনার খরচ করে গরুড়স্তম্ভ গড়ালো কেন? ইতিহাস বললে, কদ্দিন আগেকার কথা! তা কি আর মনে আছে আমার?

বিভূতিভূষণ কাগজ কলম টেনে নিয়ে বসলেন পাদপূরণ করতে।

শরদিন্দুর তৃতীয় জাতের রবীন্দ্রধর্মী কাহিনী: *মরু ও সঙ্ঘ*।

গীতিময়তাগুণে টৈটম্বুর। কিন্তু এটি 'ঐতিহাসিক ছোট গল্প' নয়,—'ঐতিহাসিক কালের ছোটগল্প'। কোনও ঐতিহাসিক চরিত্র বা ঘটনা কাহিনীতে ছায়াপাত করেনি। লেখক ইতিহাসকে সাল-শতাব্দী দিয়ে চিহ্নিত করেননি। কিন্তু একে থর মরুভূমির চৌহদ্দিভুক্ত কাহিনী কিছুতেই বলা যাবে না। কাহিনীর ভৌগোলিক অস্তিত্বটাই ঐতিহাসিক-রসমণ্ডিত। লেখক না বললেও আমরা জানি ঐ 'মরু'—তাকলামাকান, ঐ 'সঙ্ঘ' রেশম-সড়কের সহস্রাব্দী-চিহ্নিত

উটের-কঙ্কালাকীর্ণ তারিম নদীর বাঁকে! রবিন্সন ক্রুসোকে নির্জন দ্বীপে খাওয়াতে-পরাতে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে বাঁচিয়ে রাখতে ডিফোকে প্রাণান্ত হতে হয়েছে। শরদিন্দু ভ্রুক্ষেপমাত্র করলেন না ওসব সমস্যা নিয়ে—কীভাবে গুটিকতক খর্জুরগাছের উপর ভরসা করে চারটি প্রাণী দুটি দশক টিকে রইল। সার্থবাহর দল যে মাঝে-মাঝে আসে না, এ-কথা তো বলা হয়নি। চারটি চরিত্রের টানা-পোড়েনে অক্ষয় হয়ে রইল একটি অনবদ্য ছোট গল্প।

পাতিমোক্ষমতে বহিষ্কারের বিধান মাথায় নিয়ে যেদিন নির্বাণ আর ইতি 'সঙ্ঘ' ত্যাগ করে 'মরু'র 'শরণ' নিল, শরদিন্দুর বর্ণনায়,

> সেইদিন মধ্যাহ্নে বাতাস সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল; কেবল প্রজ্বলিত বালুকার উপর হইতে একপ্রকার শিখাহীন অগ্নিবাষ্প নির্গত হইতে লাগিল। পঞ্চাগ্নি পরিবেষ্টিত সঙ্ঘ যেন তপ্ত তপস্যারত বিভূতিধূসর কাপালিকের ন্যায় এই বহ্নি-শ্মশানে বসিয়া আছে। আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত কোথাও একটি পক্ষী উড়িতেছে না। শব্দ নাই। চতুর্দিকে যেন একটা রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা।[২৪]

পাঠক বুঝতে পারে: আঁধি আসছে পনের বছর পরে। কাহিনীর সমাপ্তি হল আর্ত মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ মন্ত্রোচ্চারণ সঙ্গীতে—স্থবিরের শীর্ণকণ্ঠে উচ্চারিত মন্ত্রে: হে শাক্য, হে লোকজ্যেষ্ঠ, হে গোতম, অন্তিমকালে আমাকে চক্ষু দাও। তমসো মা জ্যোতির্গময়.....

এতক্ষণে একটি ঐতিহাসিক নাম খুঁজে পাওয়া গেল বটে!

'রবীন্দ্রধর্মী' ঐতিহাসিক-কালের ছোটগল্পের শেষ তথা সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণটি আমার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা: বিশ্বসাহিত্যেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প: *ক্ষুধিত পাষাণ*।

আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমরা ধূম তর্ক চালিয়ে যাব—সেটি 'ঐতিহাসিক-কালের ছোটগল্প'।

'ঐতিহাসিক ছোটগল্প' নয়। 'ভূতের গল্প' তো নয়ই! আড়াই শ' বছর অতীতকালের দ্বিতীয় শা-মামুদ সশরীরে একবারও হাজির হননি। প্রাসাদটির মালিকীস্বত্বের প্রয়োজনে তার নামটা উচ্চারণ করা হয়েছে মাত্র।

দুরাশার মতো এবারেও লেখক বারে বারে একাল-সেকালের মেলবন্ধন করেছেন। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে। সমকালে বরীচে তুলার মাশুল আদায়কারী দিনান্তে

> সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরাম কেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তানদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে; ওপারে অনেকখানি বালুচর অপরাহ্নের আভায় রঙিন হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়িগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সেদিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ের বনতুলসী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।[২৫]

আর এই বর্তমানকালের মধ্যভারতে অবস্থিত লেখক কল্পনায় আমদানি করেন অতীতকালের এক বন্দিনী নারীর কামনাবাসনা জর্জরিত অতৃপ্ত প্রেম:

> তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী। তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তোমাকে কোন্ বেদুয়িন দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া, বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া, জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া, কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন্ বাদশাহের ভৃত্য

তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস![২৬]

'তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে জানি না', জানি না 'সেখানে সে কী ইতিহাস?' শুধু জানি—এই বাস্তব ঐ কল্পনা, এই কাহিনী আর ঐ ইতিহাসের একটি যোগসূত্র আছে। সে যোগসূত্র অনুভবের রাজ্যে। তার রহস্য জাগতিক অর্থে উদ্ঘাটন করতে গেলেই ভুক্তভুগী সাবধানবাণী শোনাবে: "তফাত যাও, তফাত যাও! সব ঝুট হ্যায়, সব ঝুট হ্যায়!"

ঐতিহাসিক-রসের কারবারীদের দায়বদ্ধতা:

ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যের লেখক তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলিকে ইতিহাস-নদীর স্রোতধারায় নৌকায় উঠিয়ে দেন। নৌকাগুলি লেখকের ইচ্ছানুসারে উজান-ভাঁটিতে যাতায়াত করে। কখনো ইতিবৃত্ত লগির ঠেলায়, কখনো একহাতে পুরাবৃত্ত অপরহাতে কাহিনীর দাঁড় তুলে নিয়ে। আবার কখনো বা স্রেফ কল্পনার পাল খাটিয়ে। লেখকের নির্দেশানুসারে নৌকাগুলি এ-ঘাট ও-ঘাটে ভেড়ে। মাঝ-গাঙে চড়ায় নেমে যাত্রীরা খিচুড়ি রেঁধে খায়। ক্রমাগত নজরে পড়ে ইতিহাস-স্বীকৃত স্বনামধন্যরা ভিন্ন ভিন্ন নৌকায় পারাপার হচ্ছেন অথবা ময়ূরপঙ্খী বজরায় নৌ-বিহারে মগ্ন। কল্পিতচরিত্রে-বোঝাই নৌকা কখনো পড়ে ঝড়-তুফানের খপ্পরে। লেখক নিষ্ঠুর হলে নৌকা উল্টে যাওয়াও বিচিত্র নয়। সাহিত্যিক যদি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো করুণাময় হন, তাহলে নায়ক-নায়িকা জলের তলায় তলিয়ে যায়, উপন্যাসখানা ভেসে ওঠে; দামোদর মুখুজ্জের মতো নিষ্ঠুর হলে নায়ক-নায়িকা ভেসে ওঠে, উপন্যাসখানা তলিয়ে যায়। মোটকথা কল্পিতচরিত্র-বোঝাই নৌকায় মাঝিমাল্লাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হয়, ঐসব ঐতিহাসিক চরিত্রে বোঝাই নাও-য়ের সাথে যাতে টক্কর না লাগে। ইতিহাস-নদীর দুই-কিনারের ভৌগোলিক সীমানা এবং স্রোতধারার 'কিউসেক'-এর গাণিতিক পরিমাণের উপরে লেখকের নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হয় না। তাঁকে ইতিহাসের নির্দেশেই গল্প ফাঁদতে হয়। সেটাই নিয়ম; তবে সামান্য এদিক-ওদিক হলে তা ক্ষমাঘেন্না করে মেনে নেওয়ার রীতি আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ছাড়পত্র মোতাবেক:

> আধুনিক ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফ্রীম্যান-সাহেবের নাম সুবিখ্যাত। উপন্যাসে ইতিহাসের যে বিকার ঘটে সেটার উপর তিনি আক্রোশ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রা-যুগ (The Age of the Crusades) সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন স্কটের *আইভ্যানহো* পড়িতে বিরত থাকেন। অবশ্য য়ুরোপের ধর্মযুদ্ধযাত্রার-যুগ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানা আবশ্যক সন্দেহ নাই, কিন্তু স্কটের *আইভ্যানহোর* মধ্যে চিরন্তন মানব ইতিহাসের যে নিত্যসত্য আছে তাহাও আমাদের জানা আবশ্যক। এমনকি তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এত বেশী যে, ক্রুজেড-যুদ্ধ সম্বন্ধে ভুল সংবাদ পাইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও ছাত্রগণ অধ্যাপক ফ্রীম্যানকে লুকাইয়া তাহা পাঠ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবে না। এখন আলোচ্য এই যে, ইতিহাসের বিশেষ সত্য এবং সাহিত্যের নিত্যসত্য উভয় বাঁচাইয়াই কি স্কট *আইভ্যানহো* লিখিতে পারিতেন না? পারিতেন কি না সে-কথা

আমাদের পক্ষে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। দেখিতেছি তিনি সে-কাজ করেন নাই।[২৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের *রাজসিংহ*-র সমালোচনায় স্যার যদুনাথ সরকার বলছেন: এই বাদশাহ (আওরঙজীব) কোনও যোধপুর রাজকন্যাকে বিবাহ করেন নাই···আকবরের পর বাদশাহী মহলে কোনও হিন্দু মহিষী হিন্দু আচার-ব্যবহার রক্ষা করিতে পারিতেন না। তাঁহাদের সকলকে মুসলমান হইয়া থাকিতে হইত। ···তাই রাজসিংহের অন্যতম প্রধান চরিত্র যোধপুরী-বেগমের অস্তিত্বটাই টিকে না।[২৮]

ফলে, আলমগীরের হারেমে 'চাটুজ্জে বামুন' যে-কায়দায় ইমলিবেগমের জাত বাঁচালেন, সেটা সাদা-বাঙলায় ইতিহাসকে অস্বীকার করা। দ্বিতীয় কথা, রবীন্দ্রনাথের মতে,

রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ···উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না। নায়িকা জেবউন্নিসা।[২৯]

মোবারকের সঙ্গে জেবউন্নিসার গোপন প্রেমকাহিনী *রাজসিংহ* উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপজীব্য। অথচ Studies in Aurangzibs Reign-গ্রন্থে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, জেব-চরিত্র কলঙ্কমুক্ত ছিল!

জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে জানি না, বঙ্কিমচন্দ্র গল্পের গরুটিকে অসঙ্কোচে হ্যাট-হ্যাট করে গাছের মগডালে তুলে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন কিনা জানা যায় না, রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তবু এই সব হিমালয়ান্তিক ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মতে *রাজসিংহ* একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। বলাবাহুল্য, এ-বিষয়ে পরবর্তীকালের কোনও সাহিত্যপণ্ডিত দ্বিমত হননি।

বিবেকের নির্দেশ এবং কালের বিবর্তনে আজ ঐ 'গুরুবাক্য'টিকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিতে পারছি না। আজ মনে হচ্ছে ঐ 'ম্যাগ্‌নাকার্টা'য় একটা 'প্রোভাইডেড-ক্লজ' বাদ গেছে! সেটা না থাকায় রবীন্দ্রোত্তর বর্তমান যুগের তা-বড় তা-বড় কিছু মহারথী স্বাধিকারপ্রমত্ত হবার ছাড়পত্র পেয়ে যাচ্ছেন! তাঁদের বক্তব্য: যেহেতু *আইভ্যানহো* এবং *রাজসিংহে* দু-একটি গরু গাছের ডালে উঠেছিল, এবং 'গুরুদেব' তাতে আপত্তি করেননি, তার ফলে আমরা অতঃপর বিরাট রাজার গোটা-গোশালা তাল-তমালের মাথায়-মাথায় বানাবো!

কোন্ মর্মান্তিক আঘাতে এ-কথা বলছি সে-প্রসঙ্গে এখনি আসব, তার পূর্বে বলি—আমাদের মতে ঐ 'প্রোভাইডেড-ক্লজে' কী থাকা উচিত ছিল। আশঙ্কা হয়, এরপর যে-কথা বলতে যাচ্ছি তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বাঙলার অধ্যাপক হয়তো ফতোয়া জারী করবেন: "যাঁহারা 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সম্বন্ধে কিছু জানিবার ইচ্ছা করেন তাঁহারা যেন 'কথাসাহিত্যে ঐতিহাসিক রস' প্রবন্ধটি পড়িতে বিরত থাকেন।"

ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যে কালীক দূরত্ব:

ইতিহাস মানেই অতীতকাল; ফলে প্রথম শর্ত: একটা ন্যূনতম কালীক দূরত্ব। কিন্তু ঠিক কতটা? স্বীকার্য: বিজ্ঞানের মতো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা সাহিত্যে আশা করা যায় না। হেতুটি এ নয় যে, বিজ্ঞান বাস্তবের কারবারী, আর শিল্প-সাহিত্যের বেসাতি অনির্বচনীয়, বিমূর্ত, ধোঁয়াশা! 'রুটওভার মাইনাস ওয়ান' অ-বস্তুটাও ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে, তার বাস্তব অস্তিত্ব নেই; কিন্তু স্বয়ং আইনস্টাইনের মস্তিষ্কে ঐ $\sqrt{-1}$ যে বোধের অনুরণন জাগাতো আমার মতো

অর্বাচীনের কাছেও তার একই মূল্য। অথচ বড়গল্প, 'নভেলেট', আর উপন্যাসের মধ্যে কোনটার মাপ কত তা আজও কেউ বলতে পারলেন না। তাই এক্ষেত্রে ন্যূনতম কালীক দূরত্ব যে কতটা তার কোন নির্দেশনা নেই। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় প্রশ্নটাকে এ-ভাবে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। যাহোক একটা সীমারেখা টানতেই হয়। ছাপ্পান্নোটি পর পর দৃশ্যে সারারাতব্যাপী অভিনয় চালিয়ে ভোররাতে কি বলতে পারি এটা আমাদের 'একাঙ্কিকা'? যেহেতু দৃশ্যগুলি অঙ্কে-গর্ভাঙ্কে ভাগ করা নয়?

আমরা একটা প্রস্তাব রাখছি, দেখুন মানতে পারেন কি না: যে শতাব্দীতে কাহিনীটি রচিত সেই শতাব্দীর ঘটনায়-ভরা কাহিনীকে 'ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য' বলা যাবে না। তার ফলে, আজ যদি কোন কথাসাহিত্যিক নেতাজী, লিন্ডবার্গ, বা রাসবিহারী বসুকে নায়ক করে কাহিনী ফাঁদেন তাহলে বলা যাবে না যে, তিনি 'ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য' রচনা করেছেন। কিন্তু রোদ্যাঁ? যাঁর এক-পা গত শতাব্দীতে, এক-পা এপারে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধতক? সেটা 'মার্জিনাল কেস'। 'অ্যা'-ও হতে পারে, 'অ'-ও হতে পারে। আর স্বামী বিবেকানন্দ? মাত্র দু বছরের জন্য যিনি বিংশ-শতাব্দীকে চরণধূলি দিয়ে গেলেন? তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি!

কিন্তু নাঃ। এ ফর্মুলাটাকে মানা যাচ্ছে না। তাহলে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এপিক্ ঐতিহাসিক উপন্যাসটিকেই বাতিল করতে হয়। নেপোলিয়ানের মৃত্যু 1821, যুদ্ধ *আর শান্তি* প্রকাশিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে। ব্যবধান পঞ্চাশ বছর হয়-কি-না-হয়। তাহলে কি হাফ-সেঞ্চুরিতে হাততালি দেওয়ার ব্যবস্থা করব? কিন্তু তাও মানা যাচ্ছে না শরদিন্দুর প্যাঁচে। তিনি জাতিস্মরের ভেক ধরে হিসাবটাকে নয়-ছয় করে ছেড়েছেন। *মৃৎপ্রদীপ* গল্পে বিংশ শতাব্দীর আর্কিওলজিস্ট পাটলীপুত্রে এক্সকার্শান করতে গিয়ে হুস করে ষোলো-শতাব্দী পিছিয়ে গেলেন। একলাফে পৌঁছালেন চন্দ্রগুপ্ত-সমুদ্রগুপ্তের অন্দরমহলে! আমরা চোখ কচ্‌লে, একগ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে সামলে নিতে নিতেই দেখি—সেই আর্কিওলজিস্ট ভদ্রলোক গুপ্তযুগ থেকে উল্টোদিকে 'জয় রাম' বলে আবার এক লাফ মেরেছেন। গুপ্তযুগের চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা মুহূর্তমধ্যে হয়ে গেল প্রাগার্য সিন্ধু-সভ্যতায় *রুমাহরণরত* 'গাক্কা'।

এতক্ষণে মালুম হচ্ছে কোন্ মর্মান্তিক হেতুতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ থেকে আচার্য সুকুমার সেন 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' ন্যূনতম কালীক দূরত্ব বিষয়ে স্রেফ স্পিকটি নট। অঙ্কের অঙ্কে উঠে বসতে গররাজি!

বেশ, ন্যূনতম না-হোক। দূরতম কালীক দূরত্ব? সেটা অন্তত নির্দিষ্ট করা যায়। এবারে আমাদের প্রস্তাব: ইতিহাস যতদূর পিছাতে পারে।

ইতিহাস? প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী নয়? *রুমাহরণ* বাতিল?

আচ্ছা না হয় 'প্রাগৈতিহাসিক কাল' পর্যন্ত। নৃতত্ত্ব সাল-শতাব্দী দিয়ে আজও চিহ্নিত করতে পারেনি 'কাল'-টাকে; আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় বলব: *হোমোস্যাপিয়ান্স*-এর সেই অচিহ্নিত জন্মলগ্ন পর্যন্ত।

তার অর্থ এই অধম গ্রন্থকারের *নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা* বাতিল?

হ্যাঁ, তাই! তার নায়ক-নায়িকা 'মানুষ' নামক দ্বিপদীজীব ছিল না— ছিল 'প্রায়-মানব': হোমো-ইরেক্টস! তাকে বড়জোর 'পুরা-নৃতাত্ত্বিক কাহিনী' বলা চলে, 'প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী'ও নয়।

এখানে আরও একটা কথা বলা দরকার। শুধু সময়ের দূরত্বই 'ঐতিহাসিক রস' এর মাপকাঠি নয়। লক্ষ্য করতে হবে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক কিনা। আচার্য সুকুমার সেন 'প্রাগৈতিহাসিক' কালের কাহিনীকেও 'ঐতিহাসিক গল্প' বলে স্বীকার করেছেন। *শরদিন্দু অম্নিবাস*-এর ভূমিকায় বলছেন:

> ঐতিহাসিক গল্পের···একটির কাল হল আর্যদের আগমনের গোড়ার দিকে *(প্রাগ্‌জ্যোতিষ)*, একটির কাল তারও আগে *(ইন্দ্রতূলক)*। একটির কাল প্রাচীন, তবে অনির্দেশ্য *(রুমাহরণ)*। আর একটির বীজ মিশরের প্রাচীন ইতিহাস থেকে নেওয়া *(আদিম)*।[৩০]

পুরাণ এবং মহাকাব্যগুলি রচিত হয়েছিল উপরিলিখিত চারটি ঐতিহাসিক গল্পের কালের অনেক পরবর্তী সময়ে। তবু আমরা পুরাণ ও মহাকাব্য অবলম্বনে রচিত কাহিনীকে 'ঐতিহাসিক-রসমণ্ডিত' বলে স্বীকার করতে রাজী নই। এজন্য সুবোধ ঘোষের *ভারত প্রেমকথা*, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের *পাঞ্চজন্য*, অথবা সুবোধ চক্রবর্তীর *ভাগবত* ইত্যাদি গ্রন্থকে ঐতিহাসিক-রসসিক্ত বলে গ্রহণ করতে পারছি না। সেগুলি পৌরাণিক-রসমণ্ডিত।

আগেই বলেছি, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং 'রস'-এর বিচারটাই মুখ্য। জ্ঞানবিজ্ঞানের যে শাখাটিকে আমরা 'ইতিহাস' বলি তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক যত নিকট ধর্মের সম্পর্ক তত নিকট নয়।

ধর্ম 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ' বলে দু-হাত তুলে নাচে। বিজ্ঞান আর ইতিহাস 'বিশ্বাস'কে বাতিল ধরে ধূম তর্ক বাধিয়ে বসে। সুতরাং বিশ্বাস-ভিত্তিতে নয়, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠায়, যুক্তিনির্ভর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি কোন সাহিত্যিক পুরাণ অথবা মহাকাব্যের আলোচনা করেন তাহলে আমরা তাকে 'ঐতিহাসিক-রসমণ্ডিত' বলে সাদরে গ্রহণ করব। যথা: শ্রীঅরবিন্দের অসমাপ্ত প্রবন্ধ: Vyas & Valmiki; গিরীন্দ্রশেখর বসুর *পুরাণপ্রবেশ*, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণচরিত্র*। মূল প্রশ্নটা দৃষ্টিভঙ্গির, পরিবেশিত 'রস'-এর। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে আমরা কোন যুক্তিতে *কৃষ্ণচরিত্র*কে ঐতিহাসিক-রস-মণ্ডিত বলে স্বীকার করছি অথচ গজেন্দ্রকুমারের *পাঞ্চজন্য* অথবা সুবোধ চক্রবর্তীর *ভাগবত*কে বলছি পৌরাণিক রস-সিক্ত।

কথা হচ্ছিল ঐতিহাসিক-রস পরিবেশনের 'ডীলার'দের দায়বদ্ধতা নিয়ে। আমাদের অভিমত: কোন কথাসাহিত্যিক যদি ডীলারশিপের জন্য দরখাস্ত করেন তাহলে অতঃপর তাঁকে একটি 'এগ্রিমেন্টে' স্বাক্ষর করতে হবে। ভদ্রলোকের-চুক্তির যুগ অতিক্রান্ত!

আমরা দেখেছি, স্কট-এর *আইভ্যান্‌হো* প্রসঙ্গে ফ্রীম্যান-সাহেবের 'ফ্রীডাম বিরোধিতা'-র বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যাকে বলে 'অসুরারিরিপু'! সাহিত্যের নিত্যসত্যের অনুরোধে তিনি অবাধ স্বাধীনতা মঞ্জুর করেছিলেন সাহিত্যিকদের তরফে।

কেন আমরা আজ সেই 'অবাধ ছাড়পত্রের' বিরোধিতা করছি এবার তা বলি।

প্রথম কথা: রবীন্দ্রনাথের আমলে লেখকেরা একটা অলিখিত শালীনতার সীমারেখা মেনে চলতেন। তাছাড়া সে-আমলে একাধিক ক্ষমতাশালী পত্রিকাগোষ্ঠী ছিল। একপক্ষের স্বাধিকারপ্রমত্ততার লক্ষণ দেখলে অন্যপক্ষ পরের সংখ্যা 'সংবাদ সাহিত্য' বা 'সমালোচনা-সাহিত্যে' সোচ্চার প্রতিবাদ করতেন। সবাই অলিখিত 'ভদ্রলোকের চুক্তি' মেনে চলতে বাধ্য হতেন। এখন বাঙলা সাহিত্যে অলিগার্কিয়াল শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। পা· পৃ·

সা· স। পারস্পরিক পৃষ্ঠকণ্ডুয়ক সাহিত্যিক সমিতি। অপজিশন পার্টি বলে কিছু নেই। তাই আমাদের বক্তব্য: ঐ ছাড়পত্রটা অতঃপর 'অবাধ' থাকতে পারবে না।

আমাদের প্রস্তাব: কথাসাহিত্যিক কোন ক্ষেত্রেই ইতিহাসের—না শুধু ইতিহাসই বা কেন? —ইতিহাস-পুরাণ-সংস্কৃতি-ধর্ম, যা কিছু এই ভারত সভ্যতার সহস্রাব্দিস্বীকৃত 'নিত্যস্বরূপ', ভারত-আত্মার প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতির স্তম্ভ, তা পরিবর্তন করতে পারবেন না, তথাকথিত 'সাহিত্যের নিত্যসত্য'-র অনুরোধে।

ধরুন *মেঘনাদবধ কাব্য*। লেখকের নির্দেশে নায়ক ও খল-নায়ক স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হলেন। 'সাহিত্যের নিত্যসত্য'র অনুরোধে মাইকেলের সে অধিকার ছিল। মানছি! কিন্তু মাইকেলের নির্দেশে রাবণ পারত না পিতৃসত্য-পালনের জন্য বনে যেতে! অথবা শ্রীরামচন্দ্র পারতেন না খলনায়করূপে মন্দোদরীকে অপহরণ করতে!

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইদানীং তাই হচ্ছে। 'অবাধ' ছাড়পত্র আছে যে! গুরুদেবের! পৌরাণিক চরিত্র নয়, ঐতিহাসিক চরিত্রও লেখকের ইচ্ছানুযায়ী 'নারীহরণ' করছেন, বাস্তবে করুন না করুন!

শারদীয়া ১৩৮৪ *শিলাদিত্য* পত্রিকায় চাণক্য সেনের একটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়: *গেরিলা*। পরে গ্রন্থকারেও তা প্রকাশিত হয়েছে। ঘটনাস্থল আফ্রিকার আঙ্গোলা রাজ্য। কাহিনীর কল্পিত-নায়কের নাম অগস্টিন্‌হো নেটো। তিনি প্রথম জীবনে ছিলেন S. P. L. A – পার্টির বিপ্লবী, কাহিনীর কালে হয়েছেন আঙ্গোলার প্রধানমন্ত্রী। লেখক তাঁর উপন্যাসে চরিত্রটিকে আঁকলেন আদ্যন্ত চাইনীজ ইংকে। তার সবটাই কালো। সে মদ্যপ, চরিত্রহীন, নারীমাংসলোলুপ, ঘুষখোর, স্বজনপোষক—এক কথায়, মূর্ত শয়তান। কীমাশ্চর্যমতঃপরম্। আলোচ্যকালে, আলোচ্য দেশের বাস্তব শাসকের নামও আগস্টিন্‌হো নেটো এবং তিনিও এককালে ছিলেন ঐ S. P. L. A – বিপ্লবী পার্টির নেতা!!

লেখক তাই কাহিনী-শেষে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন:

> এ কাহিনীর চরিত্রগুলি ও ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। সাহিত্যের প্রয়োজনে কয়েকটি বাস্তব চরিত্রের কাল্পনিক ব্যবহার করা হয়েছে। অগস্টিন্‌হো নেটো আঙ্গোলায় S. P. L. A-র নেতা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। ....কিন্তু এ উপন্যাসে-বর্ণিত ঘটনাবলী এবং কথোপকথনের কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। সাহিত্যিক কল্পনায় বিশ্বাসযোগ্য চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।[৩১]

যার নির্গলিতার্থ: 'হোয়্যার‍্যাজ' গুরুদেব নিত্যসত্যের অজুহাতে কথাসাহিত্যিককে 'অবাধ' ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছেন, 'দেয়ারফোর' আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর দুইগণ্ডে ইচ্ছামতো চুন ও কালির প্রলেপ দিতে পারি! আঙ্গোলার কোন কথাসাহিত্যিক অনুরূপভাবে একটি উপন্যাস রচনা করে যদি উপসংহারে কৈফিয়ৎ দেন "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামে বাস্তবে ভারতের এক কবি ছিলেন। জোড়াসাঁকো এবং সোনাগাছী কলিকাতা শহরের দুই মহল্লা। জোড়াসাঁকোর জমিদারকে সোনাগাছীর পটভূমিকায় যেভাবে দেখানো হয়েছে তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। সাহিত্যিক কল্পনায় বিশ্বাসযোগ্য চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র," আজ তাহলে চাণক্য সেন নিশ্চয় আপত্তি করবেন না; সে নৈতিক অধিকার—আর তাঁর নেই। আমরা আপত্তি করব। বাস্তবে অগস্টিন্‌হো নেটো কী চরিত্রের লোক তা আমরা জানি না, জানতে চাইও না। আমাদের বক্তব্য: কথাসাহিত্যে কোনও **'বাস্তব চরিত্র'** আমদানি করলে **'কাল্পনিক কলঙ্ক'** তাঁর ললাটে লেপন করা চলবে না। তা সে চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শাহ, হিটলার

বা ইদি আমিন যেই হোক! চাণক্য সেন তাঁর 'সাহিত্যিক কল্পনায়' একটা কাল্পনিক আঙ্গোলিয়ান নাম কেন পয়দা করতে পারলেন না, খোদায় মালুম। কিন্তু আমাদের মতে তাতে তাঁর অপরাধের তিলমাত্র স্খালন হত না। কারণ স্থান-কাল-পাত্রের পরিচিত সনাক্তিকরণ চিহ্নে আমি যদি কোন বাস্তব ব্যক্তিকে বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে আমার উপন্যাসে সুনির্দিষ্ট করি, তাহলে তাঁর নাম উচ্চারণ করি বা না করি, সেই পাত্রের আচরণ ইতিহাসস্বীকৃতরূপে অঙ্কিত করতে বাধ্য থাকব। আমাদের প্রস্তাব: ঐতিহাসিক-রসের ডীলারশিপ নিয়ে মুনাফা লোটার ইচ্ছা থাকলে প্রতিটি কথা-সাহিত্যিক এই শর্ত পালন করতে বাধ্য থাকবেন!

ইতিপূর্বেই বলেছি, ঐতিহাসিক রসের কারবারীকে সজাগ থাকতে হবে—ইতিহাসের স্রোতধারায় কল্পিতচরিত্র-বোঝাই নৌকা যেন ঐতিহাসিক চরিত্রে-বোঝাই নৌকায় ধাক্কা না মারে। তবে হ্যাঁ, নৌকা বাইতে গেলে অমন দু-একটা টক্কর ভুলে-ভাট্টে লেগে যেতেই পারে। তা যদি নেহাৎই যায়, লেখককে তৎক্ষণাৎ হুঁসিয়ার হতে হবে!

সে-অবস্থায় কল্পিত চরিত্রগুলি লেখক-নির্দেশে যা-ইচ্ছে করতে পারেন; ঐতিহাসিক-চরিত্ররা তা পারেন না। তাঁরা ইতিহাস-প্রত্যাশিত আচরণ করতে বাধ্য থাকবেন। লেখক দায়বদ্ধ। কিছু উদাহরণ দিই, মালুম হবে—কী বলতে চাই।

ধরুন ঐতিহাসিক নৌকার যাত্রী একদল কীর্তনীয়া, নবদ্বীপ থেকে চলেছেন শ্রীক্ষেত্রে, শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনমানসে। নৌকার দলপতি প্রভুপাদ শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী। সেক্ষেত্রে লেখক নির্দেশে নিত্যানন্দ ঐ টক্কর-মারা বেসামাল নৌকার মাঝি-মাল্লাদের শাস্তি দিতে দনাদ্দন গোলাবর্ষণ শুরু করতে পারবেন না। অপরপক্ষে ঐতিহাসিক নৌকার যাত্রীদল যদি হয় পর্তুগীজ হার্মাদ দস্যু, যার দলপতি *রক্তসন্ধ্যার* রক্তপিপাসু দা-গামা, তাহলে লেখক-নির্দেশে দা-গামা ডেক-এর উপর উঠে দু-হাত তুলে নৃত্য জুড়ে দিতে পারবেন না:

সরা! মারিলি নাও-এ ধক্কা।
তেঁহ কি প্রেমেও ফক্কা?

শ্রীচৈতন্যদেবের কোনও জীবনীকার কোথাও ইঙ্গিতমাত্র দেননি যে, নিমাই পণ্ডিত মাধাইয়ের হাত থেকে একটি কুমারীকে রক্ষা করতে কোন বিদেশীকে সাহায্য করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আমরা রুদ্ধশ্বাসে দেখলাম, নিমাই পণ্ডিত—যিনি সারাজীবনে কোনও বিবাহ-বাসরে পৌরোহিত্য করেছেন বলে বৈষ্ণবসাহিত্যে উল্লেখ নেই—একটি 'রাক্ষস-বিবাহ' দিচ্ছেন! পরমুহূর্তেই শুনি বিদেশী-বণিক অপরিচিত ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করছে, 'ঠাকুর, এ বিয়ে লোকে মানবে তো?'

এ পর্যন্ত কথাসাহিত্যিক ছিলেন স্বাধীন। কিন্তু এ-প্রশ্নের জবাবটি লিপিবদ্ধ করার সময় শরদিন্দু ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ! আত্মবিশ্বাসের দার্ঢ্যে সমুন্নতশির নিমাই পণ্ডিতের প্রত্যুত্তর শরদিন্দুর কলম থেকে নির্গত হলে কী হয়, সেই ডায়ালগ ইতিহাস-নাট্যকার কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত: "নিমাই পণ্ডিত যে বিয়ের পুরুত, সে-বিয়ে অমান্য করে কে?"

এই প্রত্যুত্তরের একটি শব্দ অদল-বদল করার অধিকার শরদিন্দুর ছিল না!

গল্প ওখানেই শেষ হতে পারত। হল না। আমরা সকৌতুকে দেখি শরদিন্দুর কলম এগিয়ে চলেছে, "চন্দনদাস তখন নিমাই পণ্ডিতের পদতলে একমুঠি মোহর রাখিয়া বলিল, 'দেবতা, আপনার দক্ষিণা।'"

তা তো বলতেই পারে। চন্দন দাস 'চন্দ্রহাস'এর দাস। শরদিন্দুর সৃষ্ট চরিত্র। লেখক তাকে

দিয়ে যা বলাবেন সে তাই বলবে। তাছাড়া নিমাই বিবাহ দিলেন, দক্ষিণা তো দিতেই হবে।

কিন্তু তারপরের অনুচ্ছেদে শরদিন্দু যখন লিখলেন, "নিমাই মোহর কয়টি উঠাইয়া অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া লইলেন। কহিলেন, অতঃপর তুমি আমার যজমানভুক্ত হইলে। পুত্রসন্তান জন্মিলে আমাকে সংবাদ পাঠাইও—অল্প খরচে অন্নারম্ভের ব্যবস্থাদি করিয়া দিব।"

তখন?—আজ্ঞে না, শরদিন্দু তা লেখেননি। কিন্তু লিখলে?

চুয়াচন্দন গল্পটি গঙ্গায় ডুবে মরত। বস্তুত পরের পংক্তিটা শরদিন্দু আদৌ লেখেননি। লিখেছে ইতিহাস, শরদিন্দুর কলম দিয়ে, "নিমাই এইবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'ঐটি পারব না।'"

উপায় কী? ভগবানই কি পারেন আর একটা ভগবান পয়দা করতে? কিংবা এসব অপ্রিয় সত্য কথা বলে হাটে-হাঁড়ি-ভাঙার অপরাধে তাঁর সৃষ্ট আনন্দলোকের বাহিরে এই দুর্বিনীত অধম প্রবন্ধ-লেখককে বহিষ্কারদণ্ড দিতে? তেমনি নিমাই পণ্ডিত অনেক-অনেক কিছু পারেন; কিন্তু ঐ এক মুঠি মোহর তাঁর অঞ্চলপ্রান্তে বেঁধে নিতে পারেন না। যেমন পারেন না কল্পনা-বিস্তারের যাদুকর শরদিন্দু, সে কথা কল্পনা করতে।

তাই বলছিলাম—কোন এক ঐতিহাসিক উপন্যাসকার যদি তাঁর কল্পিত কেন্দ্রীয় চরিত্রের জীবনকাল চিহ্নিত করেন 1863 থেকে 1902, দেখান যে, তিনি সন্ন্যাস নিয়ে ভারত পরিক্রমা করছেন এবং 1893 খ্রীষ্টাব্দে শিকাগো-শহরে এক ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দিয়ে জগৎবিখ্যাত হচ্ছেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ছাড়পত্র বলে সেই কল্পিত নায়কের একটি গোপন রক্ষিতার উপস্থিতি 'কাহিনীর খাতিরে' আমরা বরদাস্ত করতে রাজী নই—লেখক উদারতা দেখিয়ে নায়কের নাম স্বামী নির্বোধানন্দ রাখলেও।

সাম্প্রতিক কালে এই জাতীয় স্বাধিকার-প্রমত্ততা দেখাচ্ছেন কেউ কেউ। যেহেতু পূর্বজমানার ভিন্ন-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ-সমন্বিত নটেগাছগুলি মুড়িয়ে দেওয়া গেছে তাই এর প্রতিবাদ কোথাও নজরে পড়ছে না। একটি উদাহরণ দিয়েছি। আর একটি দিই:

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্থান-কাল এবং ঐতিহাসিক সনাক্তকরণচিহ্নে জনৈক সর্বজনমান্য পণ্ডিতের ছায়া-দিয়ে-গড়া এক কাল্পনিক নায়ক খাড়া করে বললেন,—'নায়ক জারজ!'

গ্রন্থকারের স্বীকৃতিমতে তাঁর কাহিনীর কাল 1840 থেকে 1870; ত্রয়োদশবর্ষে এই কাল্পনিক জমিদার-তনয় 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' ('বিদ্যাদায়িনী' নয়) প্রতিষ্ঠা করছেন, 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকা প্রকাশ করছেন, বিদ্যাসাগর-মশায়ের উৎসাহে সমগ্র মহাভারতের (রামায়ণের নয়) বঙ্গানুবাদ করছেন। বিধবাবিবাহকে জনপ্রিয় করার জন্য, বহুবিবাহরোধ এবং বারবনিতা স্থানান্তরকরণে যেভাবে নায়ক সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন তাতে জোড়াসাঁকোর জমিদার নন্দলাল সিংহের পুত্রটির সনাক্তকরণে কল্পনার কোনও অবকাশ রাখা হয়নি। অথচ ঐতিহাসিক কাহিনীকারের কল্পনায় নন্দলাল সিংহের পুত্র সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ: বাস্টার্ড!!

দুর্ভাগ্য আজ বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের! *শনিবারের চিঠি* আজ আর বিলি হয় না। *অচলপত্র* সচল নয়। মোহিতলাল থেকে সজনীকান্ত, দেবজ্যোতি বর্মন থেকে বন্ধুবর দীপ্তেন সান্যাল আজ অনুপস্থিত। তাই এই বৃহদায়তন ঐতিহাসিক উপন্যাসটিকে ক্রমাগত নানান পুরস্কারে শুধু ভূষিতই করা হল— তার সমালোচনা করা হল না!

সুনীল ভূমিকায় বলেছেন,

কৈফিয়ৎ দেবার দায় নেই ঔপন্যাসিকের। পাঠক অনায়াসেই গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন।[৩২]

বিশ্বাস করা কঠিন, উদীয়মান যশোপ্রার্থী কোন কিশোর নয়, এ যুক্তি একজন পরিণতবয়স্ক সাহিত্যিকের কলম থেকে নির্গত! লেখক—গ্রন্থশেষের বিজ্ঞপ্তিমতে যাঁর গ্রন্থসংখ্যা দ্বিশতাধিক—বিস্মৃত হয়েছিলেন কোন্ 'ভূমিকা' অভিনয় করতে তিনি মঞ্চে অবতীর্ণ! তিনি আদৌ 'ঔপন্যাসিক' নন! তিনি 'ঐতিহাসিক উপন্যাসকার'!

ভূমিকা লেখার সময় তাঁর স্মরণ ছিল না: দুটি 'ভূমিকায়' আস্‌মান-জমিন ফারাক!

'ঔপন্যাসিক' হিসাবে যখন তিনি *পূর্বপশ্চিম*-অভিযানে যাচ্ছেন তখন যে-কোন কল্পিত চরিত্রকে 'জারজ' বানাতে পারেন; কিন্তু যে মুহূর্তে স্থান-কাল-পাত্রের নির্দিষ্ট গণ্ডীতে এসে দাঁড়িয়েছেন তৎক্ষণাৎ ঐ 'ঐতিহাসিক-উপন্যাসকার' দায়বদ্ধ। 'দেশ'-এর কাছে নয়, সেটা তাঁর স্বরাজ্য—'দেশের' কাছে, যে দেশ মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহকে শ্রদ্ধা করে।

একটি 'ঐতিহাসিক' মহিলাকে 'অসতী' বলার অধিকার কোন কথাসাহিত্যিকের নেই। যতক্ষণ না তিনি সেটা প্রমাণ করতে পারছেন। 'পাথুরে প্রমাণ' পেলেও সে-কাজ করা রুচিসম্মত কি না সেটা ভিন্ন প্রশ্ন; কিন্তু প্রমাণ না পেলে ও-কথা কোন ভদ্রলোকই লিখতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, 'ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক' এই ইংরেজী প্রবাদবাক্যের সূত্রে একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে বিশ্বসাহিত্যে। ঐ একজনই এ হিম্মৎ দেখিয়েছেন: "তোমরা শোন! আমার কাহিনীবর্ণিত এই তিনজন বাস্তব সীমন্তিনী পরপুরুষ ভজনা করে সন্তানবতী হয়েছিলেন! সমাজ তা জানে না, ইতিহাসে তার প্রমাণ নেই, দুনিয়ায় তার কোন সাক্ষী নেই! তবে আমি এ-কথা লিখে গেলাম এই অধিকারে যে, আমি—এই বাস্তব কাহিনীর লেখক, স্বয়ং সেজন্য দায়ী।"

বিশ্বসাহিত্যের সেই একমেবাদ্বিতীয়ম গ্রন্থকারের নাম: কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস!

চাণক্য সেন অগস্টিন্‌হো নেটোর চরিত্র হনন করে লজ্জিত হননি, তবু সে-কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করার হিম্মৎ অন্তত দেখিয়েছেন। নলচের আড়াল দেননি। সুনীল এই স্বাধিকারপ্রমত্ততার শিকার হলেও স্বীকার করেননি। তবু অপরাধটা সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন তা বোঝা যায় তাঁর কৈফিয়ৎ দেবার সকুণ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গিতে:

> মূর্তিপূজা আর ব্যক্তিপূজার দেশ আমাদের। যেসব মানুষ নিজগুণে আমাদের চোখে শ্রদ্ধেয় হয়ে ওঠেন তাঁদেরও দেবতার স্তরে উন্নীত করতে না পারলে আমাদের স্বস্তি হয় না। কিন্তু উপন্যাস রচনার সময় নির্লিপ্তভাবে এক-একটি জীবনের সব কয়টি দিকই দেখাতে হয়। এতে ভক্তিমান পাঠকেরা ক্ষুণ্ণ হন অনেক সময়। রামমোহন রায় কিংবা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ডিনার টেবিলে সুরাপান কিংবা দেশপ্রেমিক হরিশ মুখার্জির পরদারগমন প্রভৃতির উল্লেখই অনেকের কাছে ভয়াবহ মনে হয়। অনেকের মতে এসব তথ্য সত্য হলেও প্রকাশ করা অবাঞ্ছনীয়। আমি তা মনে করি না। ব্লাসফেমি আধুনিক সাহিত্যের একটা উৎকৃষ্ট আঙ্গিক, এর কুফল কিছু নেই, সুফল অনেক।[৩৩]

এটি সেই জাতের বঙ্কিম-রসিকতা নয়, "বোধহয় কোর্টশিপটা পাঠকের পছন্দ হইল না"।

এখানে নিজ অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন লেখক সাফাই গাইবার চেষ্টা করছেন। সুচিন্তিত কৈফিয়ৎ দাখিল করছেন, কারণ তিনি বুঝেছেন 'কৈফিয়ৎ দেবার দায় নেই ঔপন্যাসিকের'

কৈফিয়ৎটা ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের ক্ষেত্রে দাঁড়ায় না! তাই তিনি চারটি যুক্তি খাড়া করলেন:

এক: আমাদের দেশে মূর্তিপূজায় ও ব্যক্তিপূজায় সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন।

দুই: 'ব্লাসফেমি' আধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট আঙ্গিক।

তিন: 'ব্লাসফেমি'তে কুফল কিছু নেই, সুফল অনেক।

চার: ঐতিহাসিক কালের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নমস্যব্যক্তিদের 'শ-কার ব-কার' করার ইংরেজী প্রতিশব্দ: 'ব্লাসফেমি'।

একে একে আলোচনা করি:

সুনীল – নির্ধারিত সময়কালে সর্বশ্রেষ্ঠ কবির সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যটি তাঁর প্রথম যুক্তির বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম 'এভিডেন্স'। মূর্তিপূজা আর ব্যক্তিপূজায় বাঙালী যদি নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকত তাহলে *'মেঘনাদবধ কাব্য'* কিছুতেই সাদরে গৃহীত হত না বাংলাসাহিত্যে। জাত তুলে বাঙালী পাঠক-মানসকে গাল দেওয়ার পূর্বে লেখককে দুটি কাজ করতে হবে। এক: 'শ্রীরামচন্দ্রের' চেয়ে জনপ্রিয় একটি ভারতীয় নায়ককে খুঁজে বার করা। দুই: *ভাষা রামায়ণ* আর *গীতাঞ্জলির* মাঝখানের ঐ পাঁচশ বছরের ভিতর *মেঘনাদবধ* অপেক্ষা কোনও অধিক জনপ্রিয় কাব্য খুঁজে বার করা। ও-দুটি কাজ যিনি পারেন না তাঁর অধিকার নেই বাঙালী পাঠককে 'হিরো-ওয়র্শিপের' জন্য গালমন্দ করার।

আর একটি উদাহরণ দিই: এ পোড়া-দেশে রাজা-গজার বড় অভাব। আমি বঙ্গ-'দেশ'টার কথা বলছি! কোন সাপ্তাহিক পত্রিকার কথা নয়। আদিশূর থেকে রাজা গণেশ বা শশাঙ্কের ঐতিহাসিক উপাদান এতই নগণ্য যে, বাঙালী একটা জুৎসই হিরোই জোটাতে পারেনি 'ওর্শিপ' করার জন্য। রাজপুতানা ভাগ্যবান, পেয়েছে প্রতাপকে; মারাঠীরা নাচানাচি করার সুযোগ পেয়েছে শিবাজীকে নিয়ে। কুল্লে একটিমাত্র রাজা-গজা মজুত ছিলেন আমাদের ভাঁড়ারে: যশোরের প্রতাপাদিত্য। সেই যে গো—সেই রাজামশাই, যিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দিল্লীশ্বরের সেনাপতির বিরুদ্ধে! বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাসের নায়কের বাপের বিরুদ্ধে! আমাদের সেই সবেধন নীলমণি রাজা-মশাইকে জোড়াসাঁকোর বাবুমশায়দের এক 'পোলাপান' হাটের মাঝে ন্যাংটো করে ছেড়ে দিলে!

হ্যাঁ, তাই দিয়েছিলেন। মূর্তিপূজক আর ব্যক্তিপূজক বলে সুনীলকর্তৃক ধিক্কৃত বাঙালী পাঠক টুঁ শব্দটি করেনি। তার হেতু এ নয় যে, লেখক লব্ধপ্রতিষ্ঠ কেওকেটা। সে তখন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এক বালক! নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বে এমনকি পরেও সেই লেখককে নানা সমালোচক নানাভাবে আক্রমণ করেছেন; কিন্তু *বৌ-ঠাকুরাণীর হাট-এ* প্রতাপাদিত্যের চরিত্রহননের অপরাধে কেউ কোনদিন কোনও অভিযোগ আনেননি। কেন? কারণ সেই তরুণ লেখক ইতিহাসকে তিলমাত্র অতিক্রম করেননি! প্রতাপাদিত্যের দম্ভ, কবি বসন্ত রায়ের প্রতি দুর্ব্যবহার ঐতিহাসিক সত্য। সেই বাস্তব দোষগুলিই তুলে ধরেছিলেন বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ব্লাসফেমি' কলাকৌশলের সুফললাভের লোভে প্রতাপাদিত্য জননীর সতীত্ব সম্বন্ধে কোনও অলীক অভিযোগ আনেননি বাবু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো!

মূর্তিপূজায় বাড়াবাড়ি—যদি সত্যই বাঙালীর চরিত্রগত দোষ হয়—নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। অনুরূপভাবে 'ব্লাসফেমি'-র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার প্রবণতাই কি প্রশংসনীয়? রামমোহন অথবা দেবেন্দ্রনাথ মদ্যপান করতেন কি না, শরৎচন্দ্র তাঁর স্ত্রীকে কোন ধর্মমতে বিবাহ

করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণ-আমেরিকায় গিয়ে ভিক্টোরিয়ো ওকাম্পোর সঙ্গে কবে কোথায় সাক্ষাৎ করেছিলেন—এগুলিই কি হবে প্রাবন্ধিক আর কথাসাহিত্যিকের গবেষণার একমাত্র বিষয়বস্তু? পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক পেট্রিয়ট হরিশ মুখার্জির নানা কীর্তিকাহিনীর কথা শুনেছি, কিন্তু সুনীলের মতো অনুসন্ধিৎসা, গবেষকমন, এবং দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় তাঁর সম্বন্ধে অমন একটা আনন্দবার্তা শুনিনি। নিশ্চয় ওঁর আস্তিনের তলায় কিছু অকাট্য প্রমাণ লুকানো আছে, নাহলে —হোক সজনীকান্ত থেকে দীপ্তেন অনুপস্থিত এবং বঙ্গসাহিত্য অলিগার্কিয়াল দেশশাসকের কব্জায়—এতবড় একটা অভিযোগ তিনি ছাপা-হরফে আনতেন না। কিন্তু সাহিত্যিক কি কর্পোরেশনের ভূগর্ভস্থ 'সূয়্যর-লাইন'-এর ধাঙড় যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে ...

না, তুলনাটা ঠিক হচ্ছে না। ধাঙড় ময়লা ঘাঁটতে বাধ্য হয়। সেটা তার জীবিকা। আমাদের মালিন্য অপসারণের দায়িত্ব নিয়েছে বলেই সে ময়লা ঘাঁটে। একই হেতুতে বদলের থেকে মোরাভিয়া, শরৎচন্দ্র থেকে সমরেশ ময়লা ঘেঁটেছেন। ইবসেনকে একজন সাংবাদিক একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "সমাজের ক্লেদাক্ত দিকের ছবি আপনিও তো কম আঁকেননি, তাহলে এমিল জোলার ঐ বর্ণনায় আপনার আপত্তি কেন?"

ইবসেন জবাবে বলেছিলেন, "Zola goes down in the mire to wallow in it, I go down in the mire to cleanse it."

পাঁকে নামার মধ্যে সরমের কিছু নেই। নফর কুণ্ডু সেটা প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন—"পঙ্কে সে মানেনি অগৌরব/সে শুধু মানসচক্ষে দেখেছে যে বিপন্ন মানব।" ম্যানহোলে নেমে অচৈতন্য ধাঙড়কে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দেন নফর কুণ্ডু!

'ব্লাসফেমি'র কুফলহীন সুফল আহরণে নয়।

'ব্লাসফেমি'র যুক্তিটা বিশদভাবে আলোচনার দাবী রাখে। প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের এই জাতীয় অর্বাচীন উক্তি তরুণ সাহিত্যিকদের বিপথে পরিচালিত করার আশঙ্কা থাকায়। 'ইতিহাস' এবং 'সাহিত্য'—উভয়ের সঙ্গেই ব্লাসফেমির কী সম্পর্ক সেটা যাচাই করা দরকার:

Blasphemy শব্দটার প্রকৃত অর্থ কী, তা সমঝে নিতে অভিধান হাৎড়াতে হল। দেখা গেল, একেবারে আদিযুগে—আব্রাহাম বা মোজেস-এর আমলে শব্দটার অর্থ ইহুদিদের কাছে ছিল: ঈশ্বরকে অসম্মান বা অপমান করা। ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত। সেই অর্থটি বরাবর চালু আছে। সর্বদেশে, সর্বকালে। এখানে 'ঈশ্বর' ইংরেজী হরফে লিখতে একটা ক্যাপিটাল 'G' লাগবে। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব, কিংবা ভিন্ন সংজ্ঞায় বিশ্বাসী? অথবা ঈশ্বর মানেন না? সেখানেও 'ব্লাসফেমি' অর্থবহ, অর্থাৎ অনর্থবহ! বুদ্ধদেবের কাছে তার অর্থ—'বিনয়, সদাচার, বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ'। আইনস্টাইনের কাছে 'Reviling the cosmic law' যার স্রষ্টা সেই 'illimitable superior spirit', সেই 'Superior reasoning power, which is revealed in this comprehensible universe.'। শচীশের জ্যাঠামশায়ের কাছে শব্দটার অর্থ: "প্রচুরতর লোকের প্রভূততম সুখসাদনে" বাধাদান।

সুনীল নিশ্চয় 'ব্লাসফেমি'র এই অর্থে বলেননি যে, সেটি "আধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট আঙ্গিক, এর কুফল কিছু নেই, সুফল অনেক।"

একটা কথা বলা দরকার : সুনীল যখন ব্লাসফেমির সুফল-কুফলের এই ব্যালেন্স-শীট টানেন, ডেবিট-ক্রেডিটের হিসাব মেলাতে বসেন, তখনো 'রুসদি-খোমেনি' ঘটনাচক্র ছিল ভবিষ্যতের গর্ভে। সে-কথা জানাজানি হবার পর ব্যালেন্স-শীটে কিছু বদল হবে কিনা সেটা *সেই সময়ের* পরবর্তী সংস্করণে জানতে পারব। সে প্রসঙ্গ সম্বন্ধে তাই আমি নীরব।

এবার খুঁজে দেখতে থাকি, 'ব্লাসফেমি' শব্দটার আধুনিক প্রয়োগ কী-ভাবে হয়। দেখছি, ইংরেজি ভাষার পণ্ডিতেরা ব্লাসফেমির সমার্থবোধক যে শব্দগুলিকে এককাট্টা করেছেন, তারা হল :

> Profanity, Cursing, Obscenity, Swearing এবং Vulgarity. বলা হচ্ছে: These words all refer to crude or foul language. **Profanity** emphasizes abusive vituperation or rage expressed in irreverent use of religious terms and names applied to the deity. More loosely, profanity may be used as the general term for any sort of habitually foul language....**Blasphemy**, a stronger term than profanity, as applied to choice of language, is restricted specifically to an irreverent use of religious terms, especially the name of the deity; this may be done as a habitual mannerism of speech, to shock others, or to insult a particular person....[34]

অর্থাৎ ব্লাসফেমিকে আধুনিক সাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট আঙ্গিক বলে মনে করবেন সেই কথা-সাহিত্যিক যাঁর কলমে খিস্তি ছাড়া আর কিছু বার হতে চায় না (habitual mannerism of speech, সুনীলের লেখায় তা দেখিনি)। অথবা অপরকে আঘাত করতে (to shock others, কাকে ? রামমোহন ? দেবেনঠাকুর ? হরিশ মুখুজ্জে ? পাঠককে ? কেন ? তারা লেখকের কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে ?) কিংবা বেমক্কা কাউকে অপমান করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার তির্যকতৃপ্তিতে (or to insult a particular person. এটা হতে পারে ! হাউই-এরও তো মাঝে মাঝে সখ হয় তারকার মুখে ছাই মাখিয়ে দিয়ে আসতে)। কিন্তু দেবেন ঠাকুর বা কালীপ্রসন্ন এত দূর কালের মানুষ যে, তাঁদের শ-কার ব-কার করে আজ কেউ তির্যক আনন্দ পেতে পারে না।

তাহলে কেন এই মানসিকতা ?

রুসদির এজাতীয় চিন্তা হতে পারে। "আছি মার্গারেট থ্যাচারের বাক্-স্বাধীনতার দেশে। আমার ভয়টা কী ? —'ব্লাসফেমির কুফল কিছু নেই। সবটাই সুফল'। রয়্যালটি এক কোটি ডলার সুইস্ ব্যাঙ্কে জমা হলে সপরিবারে ডুব মারব।"— এ জাতীয় চিন্তা তাঁর হতে পারে। 'অমূল্য সেন'-এর চিন্তাধারাও হয়তো ঐরকমই ছিল। 'দ্বিশতাধিক গ্রন্থ' রচনার সৌভাগ্যলাভ তাঁর ঘটেনি। শ্রীচৈতন্যদেবকে শ-কার ব-কার করে লেখা বইটা বাজেয়াপ্ত না হলে ঐ রগরগে রচনার সুফল অনেক ফলত ; বাজেয়াপ্ত হওয়াতেও লোকসান হয়নি—'কুফল কিছু নেই' —নামটা সাহিত্যসেবীরা মনে রেখেছে ! সুখ্যাতি না হলেও কুখ্যাতিতে !

এখানে পরিষ্কারভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে, ধর্মের নামে, চার্চের নামে, গুরুবাদের নামে যে ভণ্ডামি, যে অনাচার তার প্রতিবাদ করাকে কিন্তু 'ব্লাসফেমি' বলে না। কোন অভিধান সে কথা বলেনি। পোপ দশম লেও সে-আমলে আলটু-বালটু যাই বলে থাকুন, মার্টিন লুথার রচিত

On the Babylonish Captivity of the Church— যা-থেকে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের জন্ম—তাকে 'ব্লাসফেমাস' বলা হয় না। রবীন্দ্রনাথ যখন রোমা রোলাঁকে বলেন:

> Indian religious life suffers from this lack of wholesome spirit of intolerance which is characteristic of creative religion. Even a vogue of atheism may do good to India today....

তখনো 'নিরীশ্বরবাদী' রবীন্দ্রনাথ ব্লাসফেমাস নন। কারণ একই নিশ্বাসে কবি বলেছেন:

> for I know that my country will never accept atheism as her permanent faith.... It will sweep away all obnoxious undergrowths in the forest and the tall trees will remain intact. At the present moment even a gift of negation from the West will be of value to a large section of the Indian people.[৩৫]

এখানে রবীন্দ্রনাথ ব্লাসফেমাস্ নন!

কাজী নজরুল একবার রুখে উঠেছিলেন:

> ভারত জুড়িয়া শুধু সন্ন্যাসী সাধু ও গুরুর ভীড়
> তবু এ ভারত হইয়াছে কেন ক্লীব মানুষের নীড়?
> শুম্ভ-নিশুম্ভরে যে মারিল সে চণ্ডী কি গেছে মরে?
> কুম্ভমেলায় শুধায়েছ কেউ সাধুদের জটা ধরে?
> জটা তাহাদের কটা হয়ে গেল, কটাহ হইল চোখ,
> আনিতে পারিল তবু কি তাহারা একটি ফোঁটা আলোক?[৩৬]

রুসদি মুসলমান; তবু খোমেনির মতে সে কাফেরের অধম! কাজী নজরুলও মুসলমান। তবু ঐ 'শেষ সওগাত' শুনে হিন্দু বাঙালী-পাঠক লজ্জায় মাথা নিচু করেছে; একবারও বলেনি, ওটা বিধর্মীকবির ব্লাসফেমি!

তাহলে কোন্ 'ব্লাসফেমি'র জয়গানে সুনীল এত সোচ্চার? কেন?

দর্শনে যাঁরা নিরীশ্বরবাদী—চার্বাকের মতো লোকায়ত মতের প্রচারক, তাঁরাও 'ব্লাসফেমাস' বলে চিহ্নিত নন। নাস্তিক বার্ট্রান্ড রাসেল যখন এই বিংশ-শতাব্দীর অবক্ষয়ে আর্তনাদ করে ওঠেন:

> Do you think that if you were granted omnipotence and omniscience and millions of years in which to perfect your world, you should produce nothing better than the Ku Klux Klan, the Fascisti and Mr. Winston Churchill?

অথবা স্বামী বিবেকানন্দের মতো ঈশ্বরবিশ্বাসী আর্তনাদ করেন:

> The scheme of the universe is devilish. I could have created a better world."

তখন তাঁরাও blasphemous নন! উক্তি তো ছাড়, ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছেন যে নারায়ণ তাঁকে সাক্ষী মানছি, তিনিই স্বীকার করবেন স্বয়ং ভৃগু ঋষিও 'ব্লাসফেমাস্' নন! তাহলে সুনীল সজ্ঞানে এমন একটা বে-তালা কথা কেন বললেন?

এবার সেই প্রসঙ্গেই আসব।

ঐতিহাসিক-রসস্রষ্টার সজ্ঞান বিকৃতির স্বীকৃতি ও নির্ঘণ্ট

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি ইতিহাস আর সাহিত্যের মিলনে তিনটি শাখার জন্মলাভ হয়েছে। তার প্রথমটি মূলত ইতিহাস, পরের দুটি মূলত কথাসাহিত্য। নির্ভেজাল 'বিশুদ্ধ ইতিহাস' থেকে নির্ভেজাল 'খাঁটি সাহিত্যে' সংক্রমণের পথে এই যে তিনটি মিশ্ররস, এখানে ঐতিহাসিক-তথ্যের বিকৃতি কী-পরিমাণে অনুমোদনযোগ্য তার একটা ফিরিস্তি—আমরা যে সিদ্ধান্তে এসেছি—তা দাখিল করি। ইতিহাসের পণ্ডিত এবং সাহিত্যাচার্যরা মিলিতভাবে একটা সেমিনার করে শেষ নিদান দেবার অধিকারী। আপনি-আমি নই। ভূষণ্ডীর-মাঠের সমস্যাও ঐজাতের সমাধানের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল।

খাঁটি ইতিহাসে তথ্যের বিকৃতি বিলকুল নামঞ্জুর। 'ঐতিহাসিক রস' তাতে এতই জমাট যে, তার স্বাদ তিক্ত-কষায়। তা হচ্ছে স্যাকারিন ট্যাবলেট! তবে নাকি যাঁরা ইতিহাসের ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাঁদের এছাড়া উপায় নেই! 'ঐতিহাসিক কথাসাহিত্য' হচ্ছে পায়েস অথবা ফির্নি। মিষ্টরস যথেষ্ট; কিন্তু তার সঙ্গে আছে—হিন্দুযুগ হলে আতপ চাউল, মুসলীমযুগ হলে সিমাই। জলীয় অংশ আছে—নিছক বিশুদ্ধ উপন্যাসের মতো পাৎলা সরবৎ নয়, ঘনীভূত অবস্থায়। আর 'লোকরঞ্জক ধ্রুপদী ইতিহাস' হচ্ছে মিছরির স্ফটিক। খাঁটি ঐতিহাসিক-রসের মিষ্টত্ব ছাড়া আর কিছু ভেজাল নেই 'গিবন থেকে শীরার'-এ। কিন্তু তার স্বাদ স্যাকারিনের মতো তেতো নয়। সরবতের মতো তা তরলও নয়। নিছক 'অব্‌জেকটিভ' নয়, সূক্ষ্মভাবে 'সাব্‌জেকটিভ'। অর্থাৎ ইতিহাস পরিবেশনের অন্তরালে লেখকের ব্যক্তিমানস উপস্থিত। তিনি আছেন বলেই মিষ্টরসটা স্ফটিকের মতো সুন্দর স্বচ্ছ দানা বেঁধে উঠছে। কিন্তু লেখকের ব্যক্তিমানসটা থাকবে সঙ্গোপনে। তাকে সহজে দেখা যাবে না। সে থাকবে মিছরির দানার সুতোটির মতো।

খাঁটি ইতিহাসে তো বটেই এমন কি লোকরঞ্জক ইতিহাসেও গল্পের গোরু গাছে উঠতে পারে না। প্রথমত গল্পে গোরুই নেই, সব ঐতিহাসিক চরিত্র; দ্বিতীয়ত চতুর্দিকে কাউ-ক্যাচার গেট। কল্পিত চরিত্র বা ঘটনা থাকবে না। কল্পিত কথোপকথন না থাকাই বাঞ্ছনীয়। নেহাৎ যদি থাকে তাহলে ইতিহাসস্বীকৃত পাত্রপাত্রীকে ক্রমাগত সার্কাসের খেলা দেখাতে হবে। ইতিহাসের দুই খুঁটিতে বাঁধা টানা-তারের উপর সন্তর্পণে তাদের হাঁটতে হবে। এক-পাও এদিক ওদিক করতে পারবে না। এই কঠিন শর্ত মেনেই গিবন ঐ অতবড় কাজটা করেছেন, করেছেন শীরার। করেছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। তবু সে-সব গ্রন্থ উপন্যাসের মতো সুখপাঠ্য, চিত্তাকর্ষক, মিষ্টস্বাদী, সাহিত্য-রসমণ্ডিত বাস্তব ইতিহাসের ঘটনা-পরম্পরা।

'ঐতিহাসিক কালের কথাসাহিত্যে' অতীত কালটাই থাকে, ইতিহাস প্রায় থাকেই না। ফলে সেখানে ইতিহাস বিকৃত হওয়ার প্রসঙ্গ বিশেষ ওঠে না।

যা কিছু ঝামেলা তা ঐ: 'ঐতিহাসিক কথাসাহিত্যে'—উপন্যাসে এবং ছোটগল্পে। এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবাধ ছাড়পত্রটি কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন হয়েছে, সে-কথা আমরা বলেছি। আমাদের আরও কয়েকটি প্রস্তাব আছে। সেগুলি আপনাদের খেদমতে পেশ করি:

প্রথম কথা: ঐতিহাসিক তথ্য তো গাণিতিক ধ্রুবক নয়, দৃষ্টিকোণ, তথ্যসংগ্রহের উৎস, প্রভৃতি মতপার্থক্যের কারণ ঘটাতে পারে। হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভের যাথার্থ্য বিষয়ে যেমন সে-যুগে ছিল দু-দুটি মত। আমাদের প্রস্তাব ঐ জাতীয় ইতিহাসের বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তের একটিকে অবলম্বন করে যদি কথাসাহিত্যিক গল্প ফাঁদেন তাহলে ফুট-নোট বা পরিশিষ্টে ঐ

মতভেদের বিষয়ে যেন পাঠককে অবহিত করেন।

দ্বিতীয় কথা: সাহিত্যের নিত্যসত্যের অনুরোধে কথাসাহিত্যিক যদি স্বীকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের সজ্ঞান বিকৃতি ঘটান (আমাদের মতে 'ঐতিহাসিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির নিত্যসত্য'কে অস্বীকার না করে) তাহলে সে-কথাও পরিশিষ্ট বা ভূমিকায় স্বীকার করে যাওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে বাঙলা ও দেশীয় সাহিত্যে। কারণ এখানে আমাদের মা-মাসি-বোনেরা, অনেক সময় খুড়ো-জ্যাঠাও ইতিহাসকে চিনতে পারেন ঐ জাতীয় লোকরঞ্জক কথাসাহিত্যের সাহায্যে। হেরোডোটাস থেকে টয়েনবি তাঁদের নাগালের বাইরে। তাই এই অনুরোধ। কথাসাহিত্যিকের অধিকার আমরা এখানে খর্ব করছি না। শুধু বিনীত অনুরোধ—পরিশিষ্টে দয়া করে জানিয়ে দেবেন: কোন্ কোন্ বৃক্ষশাখে গল্পগোরু গরুড়াবলোকনে আমাদের মতো গোলামার্কা পাঠকদের দেখতে পাচ্ছে।

তৃতীয় কথা; 'সময়' যেখানে উপন্যাসের স্বীকৃত নায়ক—অর্থাৎ একটা মনগড়া দূরকালের আষাঢ়ে কাহিনী পরিবেশন করাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, অপরপক্ষে একটা বিশেষ ঐতিহাসিক কালকে সামগ্রিকভাবে উপস্থাপন করাই যেখানে লেখকের মৌল লক্ষ্য, সেখানে গ্রন্থশেষে একটি নির্ঘণ্ট আবশ্যিক। কারণ তথ্যনির্ভর এইসব আকরগ্রন্থ ভবিষ্যৎ-কথাসাহিত্যিকদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে, করবেও। তখন ঐ নির্ঘণ্টটি অপরিহার্য।

একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝানো সহজ হবে:

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *'সেই সময়'* পাঠের সময় 'হটী বিদ্যালঙ্কার' নামটির উল্লেখ পেয়েছি, মনে ছিল। যখন পড়ি, তখন আমার সুদূর কল্পনাতেও ছিল না যে, ঐ নামটি নিয়ে আমাকেই একটি 'গো + এষণা' করতে হবে। পরে সে-কাজে যখন হাত দিলাম তখন হাজার পৃষ্ঠার গন্ধমাদনে আমার বিশল্যকরণীকে খুঁজে বার করতে পুরো একটি দিন সময় লেগেছে। তবু সারাটা দিন খেটেছি একটা বিশেষ হেতুতে। আমার মনে ছিল, সুনীল ঐ নামটা তাঁর হাজার পৃষ্ঠার ভিতর একবার মাত্র ব্যবহার করেছেন; এবং পাঠকালে আমার অবচেতন মনে একটা ছায়াপাত ঘটেছিল—সেখানে একটি কালানৌচিত্য দোষ ছিল।

খুঁজে যখন পেলাম (প্রথম খণ্ড, সপ্তদশ মুদ্রণ, পৃ: 259) তখন বুঝতে পারি ব্যাপারটা—হ্যাঁ একটা 'অ্যানাক্রনিজম' হয়েছে—অতি সামান্য ব্যাপার; একটিমাত্র ক্ষুদ্র বাক্যাংশে: "এক্ষণে শিক্ষা দিতেছেন।"

আলোচনা করছেন বীটন, রামমোহন ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সময়টা সুনির্দিষ্ট না হলেও আন্দাজ করা যায়। উনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক। কথাপ্রসঙ্গে বীটন বললেন, "স্ত্রীশিক্ষার চল আপনাদের মধ্যে আগেও ছিল বলিতেছেন? আমি কখনো শুনি নাই।"

মদনমোহন তখন অনেকগুলি বিদুষী মহিলার নাম শুনিয়ে শেষে বললেন, "আর কত উদাহরণ দিব? এত প্রাচীনকালেই বা যাইবার প্রয়োজন কী? হটী বিদ্যালঙ্কার নামে এক প্রসিদ্ধা রমণী বারাণসীতে টোল খুলিয়া এক্ষণে রীতিমতন ছাত্রদের শিক্ষা দিতেছেন।"

হটী বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। মদনমোহন তখন অজাত!

প্লীজ! আমাকে ভুল বুঝবেন না। সুনীলের ঐ সামান্য ভুল ধরতে এ প্রসঙ্গ তুলিনি। সুনীলের কৃতিত্বকে ছোট করে দেখানোর জন্যও নয়। তাঁর *সেই সময়* নিঃসন্দেহে একটি মহৎ

প্রচেষ্টা। আড়াই বছর ধরে 'দেশ'-শাসন করেছে বলে নয়। বঙ্কিম-আকাদেমী এবং দু-দুবার আনন্দ পুরস্কার লেখককে দেওয়া হয়েছে বলেও নয়। তিনি বিগত শতাব্দীর 'বাঙলার নবজাগরণের বার্তা' বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পেরেছেন বলে। তাঁর গ্রন্থের মূলরস কেন্দ্রীয় চরিত্র নবীনচন্দ্রের জননী এবং জননীর তথাকথিত 'সিডিউসার'-এর মনগড়া টানাপোড়েন নয়, উনবিংশ শতাব্দীর শারদাকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা। জনসাধারণের সার্বিক অশিক্ষা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডূকতাকে মূলধন করে একদল তথাকথিত সমাজপতির দেশ-শোষণের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন তরুণের মরণপণ সংগ্রামের সুলিখিত ইতিকথা।

ইতিপূর্বে কঠোর সমালোচনা করেছি বলে ভুল বুঝবেন না আমাকে। সুনীলের কৃতিত্বটা যদি উপলব্ধি করতে না পারি তাহলে বৃথাই পঞ্চাশ বছর ধরে কলম আঁকড়ে পড়ে আছি। অকুণ্ঠভাষায় স্বীকার্য: একটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে একটি বিশেষ কালকে যে সর্বসাধারণের কাছে এভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব সে-চিন্তা আমার মস্তিষ্কে জাগ্রত করেছেন আমার চেয়ে দশ বছরের অনুজ এক কথা-সাহিত্যিক। সে জন্য নিশ্চয় মাথার টুপি খুলব!

আর সেটাই হল ট্র্যাজেডি!

স্কট-এর ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ইতিহাসের বিশেষ সত্য আর সাহিত্যের নিত্যসত্য উভয় বাঁচাইয়াই....স্কট আইভ্যানহো লিখিতে....পারিতেন কিনা সে-কথা আমাদের পক্ষে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। দেখিতেছি তিনি সে-কাজ করেন নাই।"

কী দুঃখের কথা! কী অপরিসীম দুঃখের কথা! সুনীলের ক্ষেত্রে সে-কথা বলে সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি না! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—নবীনচন্দ্রের জন্মসংক্রান্ত কাল্পনিক জটিলতা আমদানি না করেও লেখক রসোত্তীর্ণভাবে ঐ ঐতিহাসিক উপন্যাসটি প্রণয়ন করতে পারতেন। সে ক্ষমতা তাঁর ছিল! জোড়াসাঁকোর জমিদার কালীপ্রসন্ন সিংহের জনক নন্দলাল সিংহ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য প্রায় কিছুই নেই। লেখক যদি বলতেন—তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী, হুতোমের এসব 'আধিক্যেতা' অথবা 'বিদ্যেসাগরের ছেলে-খেপানো বাতিক' তিনি সহ্য করতে পারেননি, তাহলে তা আমরা মেনে নিতাম। বিশ্বাস করতাম, এজন্যই পুত্র এবং পিতার অথবা পিতৃতুল্য কাকাবাবু বিধুশেখরের সংঘাত বেধেছিল। জেনারেশন গ্যাপের চিরাচরিত সমস্যা। তার পরিবর্তে লেখক তাঁর কল্পনাকে এমন এক অশালীন দূরত্বে টেনে নিয়ে গেলেন যার ফলে 'কালীপ্রসন্ন সিংহ' নামক এক হতভাগ্যের ঠাঁই হল না *সেইসময়*-এ।

"ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী!"

ভাবা যায়? একটি হাজার পৃষ্ঠা-ব্যাপ্তি বিশাল ঐতিহাসিক উপন্যাস, যার সময়ের ব্যাপ্তি 1840-70, পরিধি কলকাতার সমাজজীবন—এবং সেখানে কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের প্রবেশাধিকার নেই! অনিমন্ত্রিত কোন্ মর্মান্তিক হেতুতে? কারণ লেখক বিম্ববতী-বিধুশেখরের অবৈধ-সম্পর্কের অলীককাহিনী পরিবেশনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! তাতে যদি শিবহীন যজ্ঞ করতে হয় সো ভি আচ্ছা!

অবৈধ 'প্রণয়' নয়। অবৈধ 'জৈবিক-সম্পর্ক'! 'প্রেম' ব্যাপারটাকে হাজার বছরের সাহিত্য এমন একটা মর্যাদা দিয়েছে যার খাতিরে অনেক কিছু মেনে নেওয়া যায়—তা অবৈধ হলেও। লেখক তা দেখাতে চাননি! প্রেমের বাষ্পমাত্র নেই। সে নেপথ্য-কাহিনী পাঠকের আন্দাজের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া যায়, এক পক্ষের কাম, অপর পক্ষের

গর্ভধারণের বাসনা। পাঠকের চিন্তাধারাকে এই অনৈতিহাসিক অশালীন ভ্রান্তপথে পরিচালিত করতে অথবা কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে রগরগে করে তুলতে লেখক ইতিহাস-বিরুদ্ধ কিছু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন ঃ

এক ঃ নবীনকুমারের জননী নিরক্ষরা। দীর্ঘ স্বামী-সহবাসেও সন্তানবতী হতে পারেননি। মহিলাটির ধারণা ঃ প্রৌঢ় স্বামী (সাতচল্লিশ-বছর বয়সী রামদুলাল) শারীরিক অক্ষমতায় পিতা হবার অনুপযুক্ত। এমতাবস্থায় সন্তানধারণের শেষ-সীমান্তে উপনীত সেই নিরক্ষরা অশিক্ষিতা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে মাতৃত্ব কামনায় যদি·····

দুই ঃ রামদুলাল প্রৌঢ়। আযৌবন বহু রমণীর সঙ্গে সহবাস করেছেন অথচ বৈধ-অবৈধ কোন ভাবেই পিতৃত্ব-গৌরব লাভ করেননি। লুপ্তপিণ্ডোদক হবার আশঙ্কায় গঙ্গানারায়ণকে দত্তকপুত্র নিয়েছেন। এমতাবস্থায় সেই প্রৌঢ় যখন সংবাদ পেলেন তাঁর প্রায়-যৌবনোত্তীর্ণা ধর্মপত্নী অকস্মাৎ গর্ভবতী হয়েছেন তখন·····

তিন ঃ রামদুলালের বন্ধু বিধুশেখর পাকা উকিল, কুচক্রী, প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ। সেও আন্দাজ করেছে বন্ধু এবং বন্ধুপত্নীর অবস্থা। এমতাবস্থায় সুন্দরী বন্ধুপত্নীর আযৌবনের বাসনা চরিতার্থ করতে যদি সেই কুচক্রী সুযোগসন্ধানী····

ডট···ডট···ডট হচ্ছে রগরগে উপন্যাস। কিন্তু ইতিহাস কী বলে?

এক ঃ মহাত্মা কালীপ্রসন্নের জননী ত্রৈলোক্যকামিনী আদৌ নিরক্ষরা ছিলেন না। ডঃ পরেশচন্দ্র দাসের অমূল্য গ্রন্থের 37-38 পৃষ্ঠায় তাঁর হস্তাক্ষরের ফটো কপি আছে। তাঁর বিবাহ হয় সাড়ে-চৌদ্দ বছর বয়সে। স্বামীর বয়স উনিশ। বিবাহের মাত্র পনের মাস পরে তাঁর পুত্র কালীপ্রসন্নের জন্ম হয়। এ সংবাদ *সংবাদ প্রভাকরে* এবং *ক্যালকাটা কুরীয়ারে* মুদ্রিত হয় [24.2.1840 তারিখে]।

দুই ঃ কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল সিংহ বিবাহ করেন উনিশ বছর বয়সে। সন্তানের পিতা হন বিংশতি বর্ষে, পরলোকগমন করেন পঞ্চবিংশতি বর্ষে। দত্তকপুত্র গ্রহণের প্রশ্নই ওঠেনি।

তিন ঃ কালীপ্রসন্ন ছয় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হলে যে মহাত্মা তাঁর অভিভাবক হন তাঁর নাম হরচন্দ্র ঘোষ। তিনি কুচক্রী উকিল ছিলেন না, ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় ন্যায়াধীশ। ব্রাহ্মণ নন, কায়স্থ। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*-গ্রন্থে এই আধুনিকমন, ডিরোজিও-শিষ্য, আদর্শচরিত্র হরচন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি প্রথমে ছিলেন মুন্সেফ, পরে সেকেন্ড ম্যাজিস্ট্রেট, অন্তিমে আদালতের জজ। সুনীল ভূমিকায় বলেছেন, "স্বেচ্ছায় কোন ভুল তথ্য আমি দিইনি···যাঁকে অবলম্বন করে নবীনকুমারকে গড়া হয়েছে তাঁর কয়েকটি কীর্তিচিহ্ন ছাড়া ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না। এতদিন পরে আর জানবার উপায়ও নেই।"

মন্মথ নাথ ঘোষের *মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ* কিংবা ব্রজেন্দ্রনাথের গবেষণাগ্রন্থ ঘাঁটলেই জানা যেত কালীপ্রসন্নের জন্মসময়ে তাঁর পিতামাতার বয়স কত ছিল। এমনকি, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধানের মতো সহজলভ্য বই ঘাঁটলেই জানা যায় কালীপ্রসন্নের অভিভাবক রায়বাহাদুর হরচন্দ্র ঘোষ কী জাতের মানুষ ছিলেন।

কাহিনীর খাতিরে অনেক ঐতিহাসিক বিচ্যুতি মেনে নেওয়া যায়। গঙ্গানারায়ণ কালীপ্রসন্নের দাদা নন, দাদু! নবীনচন্দ্রের পিতা রামদুলালের বৃদ্ধবয়সে অপঘাত মৃত্যু হলেও কালীপ্রসন্নের পিতা নন্দলাল মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে কলেরায় মারা যান। কালীপ্রসন্নের পিতৃবন্ধু তথা

অভিভাবক জাস্টিস্ হরচন্দ্রের মৃত্যু হয় কালীপ্রসন্নের জীবদ্দশায়।

লেখকের অজ্ঞতা, পরিশ্রমবিমুখতা অথবা অনুসন্ধিৎসার অভাব ক্ষমার্হ কিন্তু শালীনতাবোধের অভাবটাকেও একই যুক্তিতে মেনে নেওয়া চলে কি?

হয় স্বীকার করুন *সেই সময়* একটি উপন্যাস —*পূর্বপশ্চিম*-এর সগোত্র।.

সে-ক্ষেত্রে আমরা মাথা পেতে মেনে নেব লেখকের দাবী: "কৈফিয়ৎ দেবার দায় নেই ঔপন্যাসিকের। পাঠক অনায়াসেই গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন।" কিন্তু সে ক্ষেত্রে ঐ লাইনটা তাঁকে বদলাতে হবে, "আমার কাহিনীর নায়ক 'সময়'। তার ব্যাপ্তি 1840-1870।" পরিবর্তে তাঁকে বলতে হবে যে, তাঁর কাহিনীর নায়ক জনৈক জারজ নবীনচন্দ্র।

অথবা স্বীকার করুন *সেই সময়* একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস—*রাজসিংহ*-র সগোত্র।

সে-ক্ষেত্রে আমরা মাথা পেতে মেনে নেব লেখকের দাবী: "কাহিনীর নায়ক 'সময়'।"

কিন্তু সে-ক্ষেত্রে লেখককে জানাতে হবে কেন উৎসর্গপৃষ্ঠার সদর দরজা অতিক্রম করতে পারলেন না কালীপ্রসন্ন রাজসিংহ? কেন 'শিবহীন যজ্ঞ' করা হল? তখন আর লেখক দাবী করতে পারেন না: জারজ নবীনচন্দ্র সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয়র 'প্রক্সি'।

কেকটা খেয়ে ফেলা যায়, অথবা সঞ্চয় করা। দুটোই করব—এ আবদার চলে না।

চরমতম ট্র্যাজেডি সেটাই। এই সহজ কথাটা লেখকের না-জানা ছিল না। সেই সজ্ঞানকৃত অপরাধবোধেই ভূমিকায় তিনি এলোমেলোভাবে একবার বলেছেন, 'বাঙালী জাতিগতভাবে মূর্তিপূজক', আবার বলছেন, "আমি কোন মহৎ মানুষের প্রস্তরমূর্তির মুণ্ডচ্ছেদ করতে চাইনি একেবারেই, শুধু মাঝে মাঝে সেই সব প্রস্তরমূর্তির পূর্বতন খড়মাটির পা দেখিয়েছি মাত্র।"

তা কি সম্ভব? মহৎ মানুষের প্রস্তরমূর্তিতে ক্রমাগত ছেনি-হাতুড়ি চালালে কয়েক কিলোগ্রাম মার্বেল-ডাস্টই যে শুধু পাওয়া যাবে। 'খড়মাটির পা'-য়ের সন্ধানী লেখককে কষ্ট করে যেতে হবে বারোয়ারিতলায়, পরিত্যক্ত গর্ধভবাহিনী মনসা বা ওলাবিবির মাটির মূর্তির পদতলে। তাঁদের 'খড়মাটির পা' লুকানো আছে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, হরিশচন্দ্র, বা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মার্বেল স্ট্যাচু'তে 'খড়মাটি'র পা কোথায় যে, 'কালাপাহাড়ী' ব্লাসফেমিতে লেখক তা দেখাবেন?

যে 'অনুপপত্তি'র মীমাংসা হয়নি—কেন সুনীল বলেছিলেন 'ব্লাসফেমি' আধুনিক কথাসাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট আঙ্গিক—তারও একই সমাধান:

আপনার-আমার মতো ঐ লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিকও জানেন: বৈদিক যজ্ঞবিধিকে নিন্দা করার সময় শাক্যসিংহ অথবা তান্ত্রিক পঞ্চ-মকারকে ভর্ৎসনা করার সময় আদি শঙ্করাচার্য 'ব্লাসফেমি'-র আশ্রয় নেননি। 'সুন্দর'কে হত্যার অপরাধে কালাপাহাড়, একই হেতুতে চরম ঈশ্বর-বিশ্বাসী সাভোরানোলা ব্লাসফেমাস! সত্যসুন্দরসম্পৃক্তশিব-হীনযজ্ঞ করে দক্ষরাজ যেমন হয়েছিলেন ব্লাসফেমাস! অপরাধবোধে দিশেহারা লেখক নিজেকে সান্ত্বনা দিতে তাই ব্লাসফেমির জয়গান করছেন দক্ষরাজার দক্ষতায়। সেটাই সবচেয়ে বেদনাবহ!

সুতরাং বুঝতেই পারছেন, অত প্রকাণ্ড একটা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভিতর অত ছোট্ট একটা কালানৌচিত্যদোষ দেখাবার উদ্দেশ্য কোন ছিদ্রানুসন্ধান-প্রবণতা নয়। কী জানেন? 'স্পুনারিজম'-এ স্লিপ অব 'টঙ্গু' (tongue) হয়! মূক হবার সৌভাগ্য যার হয়নি, মাঝে-মাঝে তার মুখ 'ফক্‌সাবেই'! ঠিক তেমনি সাক্ষর হবার দুর্ভাগ্য যার হয়েছে, মাঝে মাঝে তাকে

নন্দলাল সিংহ

জন্ম— 1821
বিবাহ — 1838 সতের বছর বয়সে
পিতৃত্ব লাভ— 1840 ... উনিশ বছর বয়সে
লোকান্তরিত— 1846 ... পঁচিশ বছর বয়সে

ত্রৈলোক্যমোহিনীদেবী

জন্ম— 1825
বিবাহ— 1838 ... তের বছর বয়সে
পুত্রবতী— 1840 ... পনের বছর বয়সে
বৈধব্য— 1846 ... একুশ বছর বয়সে
লোকান্তরিত— 1908 ... তিরাশি বছর বয়সে

কালীপ্রসন্ন সিংহ

জন্ম— 1840
মৃত্যু— 1870

'পেন্সোম্নাম্বোলিজ্‌ম'এ ভুগতে হবেই। ইঞ্জিরি-হরফে না লিখলে মালুম হবে না। আমি সেই বিচিত্র রোগটার কথা বলছি: pen-somnambulism! অর্থাৎ ঘুমাতে ঘুমাতে কলম দু-চার-ছত্তর আলটু-বালটু লিখে চলে, কলমের মালিক টেরও পান না। আপনারা যদি অধম লেখকের 'বিশ্বাসঘাতক' কেতাবের প্রথম সংস্করণ জোগাড় করতে পারেন তাহলে দেখবেন মদীয় লেখনী কী বিশ্রী বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল! আমি লিখেছিলাম, "জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন।" এ-কথা 'সজ্ঞানে' লিখেছি, প্রুফে সংশোধন করিনি, প্রিন্ট অর্ডার দিয়েছি। ছাপা বইখানি হাতে পাওয়ার আগে মালুমই হয়নি যে, কলমটা ঘুমের ঘোরে 'নাইটহুড' লিখতে 'নোবেল প্রাইজ' লিখেছে!

'পেন্সোম্নাম্বোলিজম্‌'-এর কথাই যখন উঠে পড়ল তখন কিছুটা 'ঐতিহাসিক রস' পরিবেশন করা যাক: পুরানো কালের কিস্‌সা। সে অনেকদিন আগেকার কথা। বঙ্গ-সরস্বতী তখন কোন হোলসেলার 'টাইকুন'-এর কারাগারে বন্দিনী নন। নানান গোষ্ঠীর বাকবিতণ্ডার 'টাইফুন' বইত সাহিত্যের আনন্দ বাজারে। হরেক পেড়-এ হরেক চিড়িয়ার কিচির-মিচির। সবচেয়ে প্রভাবশালী একদল 'পরিযায়ী-পক্ষী; হপ্তায় ছয়দিন তাঁরা হাওড়া-বোলপুর ইস্টিশানের মধ্যে ওড়াউড়ি করতেন। হপ্তার শুধু একটি বিশেষ বার ছিল ভিন্‌-পালকী কুঁকড়োর কব্জায়: শনিবারটা!

প্রবাসীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে একটি যুগান্তকারী উপন্যাস: *গোরা*। লেখক দারুণ হুঁশিয়ার! রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মতে তাঁর তিনদশকের সম্পাদকী-অভিজ্ঞতায় ঐ লেখক বাঙলা-সাহিত্যের একমাত্র সাহিত্যিক যাঁর বর্ণাশুদ্ধি হত না! তাঁর ব্যবহৃত বানানে সন্দেহ জাগলে—হ্যাঁ, সেকথাও স্বীকার করেছেন রামানন্দ, তিনি অভিধান হাৎড়ে বানান'টা মিলিয়ে দেখে নিয়েছেন। অমিল দেখলে, পাণ্ডুলিপির পরিবর্তে ছাপা অভিধানের বানানটা সংশোধন করে দিতেন। এ-হেন লেখকের কলম বেমক্কা পড়ে গেল গভীর গাড্ডায়: 'পেন্সোম্নাম্বোলিজম'! প্রবাসীতে ছাপা হল,

> ক্ষণকালের জন্য রমাপতি চাহিয়া দেখিল, গোরার সুদীর্ঘ দেহ সুদীর্ঘতর ছায়া ফেলিয়া মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়া একাকী ফিরিয়া চলিয়াছে।

নজরে পড়েছে? লাইনটা দ্বিতীয়বার পড়ুন। সহজে পড়বে না। 'শনির দৃষ্টি' চাই যে! পরের সংখ্যায় *শনিবারের চিঠিতে* সজনীকান্ত লিখলেন:

> স্বয়ং রবীন্দ্রের আদেশেও রবির ক্ষমতা নাই খরমধ্যাহ্নে কোন বস্তুর ছায়া বস্তু অপেক্ষা দীর্ঘতর করিবার!

বুঝুন ব্যাপার! সে এমন একটা যুগ গেছে বাংলা সাহিত্যের,যখন কল্পিত-চরিত্রের ছায়ার মাপ পর্যন্ত হবু নোবেল-লরিয়েট লেখকের খামখেয়ালীতে এদিক-ওদিক হতে পারত না! আর আজ....থাক! 'অ্যাড নশিয়াম' হয়ে যাচ্ছে!

হায়রে কবে কেটে গেছে সজনীকান্তের কাল!

কৈফিয়তুপসংহার:

আপনারা এবার ঐ সঙ্গত প্রশ্নটা করতে পারেন, "হেড অফিসের বড়বাবুর মতো হঠাৎ এমন 'আমায় ধরে তোল' শুরু করলেন কেন মশাই? হটী বিদ্যালঙ্কারের ঠিকুজী-কুষ্ঠির সন্ধানে এমন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন কেন?"

উপসংহারে সেই কৈফিয়ৎটাই দাখিল করি। একেবারে গোড়া থেকে:

'ইতিহাস' মেয়েটির সঙ্গে এককালে আমার 'কাফ-ল্যভ' হয়েছিল। সে অনেককাল আগে। ও তখন বেড়া-বিনুনী বাঁধে, আমি হাফ-প্যান্টে বেল্ট। স্কুলজীবনেই শেষ করেছিলাম বঙ্কিম আর রমেশ দত্ত। *রাজকাহিনী* তো বটেই। তবে পড়েছি বাংলা মিডিয়ামে; পাঠ্য বইয়ের বাইরে কুল্লে একটি ইংরেজি বই পড়েছি, তাও বাবা-মশাই সাহায্য করায়। লুই ক্যারলের: *অ্যালিস অ্যাডভেঞ্চার*। ম্যাট্রিকের ছুটিতে অভিধানের লাইফ-বেল্ট আঁকড়ে সাঁতরে পার হওয়া গেল *থ্রি মাস্কেটিয়ার্স*। ইংরেজি অনুবাদে। কিন্তু তার পরেই ইতিহাসের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। ঐ পিতৃআদেশেই। আই· এ· নয়, আই· এস্‌সি। বি· এ· নয়, বি· এস্‌সি। অঙ্কে অনার্স। যেতে হল বি· ই· কলেজে। যে-আমলের কথা তখনো 'জেনারেশান গ্যাপ' শব্দটা পয়দা হয়নি। আর এ কিছু চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাস নয়। চার বছরের জন্য বি· ই· কলেজের ছাত্রাবাস। তবু একটা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলাম, আমি সাহিত্যিক হতে চাই, এঞ্জিনিয়ার নয়।

বাবা তৎক্ষণাৎ বললেন, তোমার জীবন, তুমি বেছে নেবে। তবে তোমার সংসারে রোজ সকালে উনুনটা যাতে জ্বলে সে-ব্যবস্থাটুকু আমি করে দিয়ে যাব। যাতে পাণ্ডুলিপি বগলে সম্পাদকের বাজারে-বাজারে তোমাকে লাঞ্ছিত না হতে হয়। আর যেটাকে 'সত্যি' বলে মনেপ্রাণে বুঝতে পারবে তা লিখতে ভয় পাবে না।

আমি পাস করে বেরিয়ে আসার আগেই তিনি স্বর্গে গেছেন। সেদিন ক্ষুব্ধ হলেও আজ বুঝতে পারি তাঁর দূরদৃষ্টির কথা। এখন যেটা লিখছি এটাই কি লিখতে পারতাম তাঁর আশীর্বাদ ছাড়া?

চাকরি পেলাম সহজেই। শুরু হল সখের সাহিত্যসেবা।

আমার লেখা প্রথম উপন্যাস—আজ্ঞে না, *বকুলতলা পি· এল· ক্যাম্প* নয়, *রাওয়ালা*। তার কথা আপনারা জানেন না। ছদ্মনামে প্রকাশ করতে হয়েছিল, স্বনামে সাহিত্যসেবার সরকারী অনুমতি না পাওয়ায়। *রাওয়ালা* একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। ম্যাট্রিকের ছুটিতে পড়া *থ্রি মাস্কেটিয়ার্স*-এর ছায়া দিয়ে গড়া। শুধু ডুমার ঐ ব্যাপারটা কিশোর পাঠকের বরদাস্ত হয়নি—তিনসঙ্গী আর ডার্টাগ্‌নান-এর জান-কবুল অভিযানের পিছনে একটি অবৈধ-প্রণয়। ফ্রান্সের রানী আর ইংল্যাণ্ডের ডিউক অব উইন্ডসর! তাই বঙ্গানুবাদে সেটা বদল করে 'স্বর্গীয় প্রেম' বানানোর চেষ্টা। স্বনামে গ্রন্থরচনার অনুমতি পাওয়ার পর এখন *রাওয়ালা* বইটি *মহাকালের মন্দির* নামে বাজারে চলছে। আমার মতে অপরিণত লেখকের সেই প্রথম উপন্যাসটি মেলোড্রামাটিক! কিন্তু প্রকাশকমশাই কিছুতেই রাজী হননি তার প্রকাশ বন্ধ করতে। মুশকিল এই যে, তার এডিশান হয়ে চলেছে আজও। বোধকরি একটা বিশেষ বয়সের পাঠকের জন্য—যে বয়সে লেখক লিখেছিলেন—'অতি-নাটকীয়তা রস'-এরও দরকার!

পল্লবগ্রাহী দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে স্থাপত্য-ভাস্কর্য-ভ্রমণ-বিজ্ঞান-কথাসাহিত্যের নানান ঘাট থেকে বারে বারে ফিরে এসেছি সেই বাল্যবান্ধবীর কাছে। বিশুদ্ধ 'ইতিহাস' বা 'লোকরঞ্জক ইতিহাস' রচনার শিক্ষা ও যোগ্যতা আমার নেই। 'ঐতিহাসিক কালের কাহিনী' লিখেছি—*হংসেশ্বরী*। সেখানে পাত্রপাত্রীদের অনেকেই বাস্তব; কিন্তু তাঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি নন। কাহিনী একজন মহীয়সী বাস্তব মহিলাকে অবলম্বন করে। তাঁর নামে কলকাতায় একটি গলি রাস্তাও আছে। উইলিয়াম কেরি, রামমোহন এসেছেন কাহিনীতে, সতীদাহ প্রথার বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্যও আছে। তবু তা মূলত ঐতিহাসিক কালের কথাসাহিত্য। ইতিহাসের মূর্ছনা

বরং কিছুটা ধরা দিয়েছে *আনন্দস্বরূপিণীতে*। নায়ক কুমারজীব শুধু নন, অন্যান্য প্রধান চরিত্র—কালিদাস, বুদ্ধযশ, ফা-হিয়েন, বুদ্ধভদ্র, তাও চিং, এবং নায়কের ভগিনী—প্রধান নারীচরিত্র অক্ষুমতী প্রভৃতি প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ঘটনাস্থল শরদিন্দুর *মরু ও সঙ্ঘ* কাহিনীর ঘটনাস্থলের কাছাকাছি। *লাডলি বেগম* পুরোপুরি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এছাড়া *সুতনুকা একটি দেবদাসীর নাম* গ্রন্থে দুটি ঐতিহাসিক কালের নামহীন ছোটগল্প আছে; একটি মৌর্যযুগের, একটি গুপ্তযুগের। *লা-জবাব দেহ্‌লী অপরূপা আগ্রাতে*শের-শাহ্‌র প্রধান স্থপতিকে নায়ক করে আর একটি বড় গল্প লিখেছি।

স্যার আর্থার কন্যান ডয়েল-এর একটি বিচিত্র শৈলী এককালে আমার মন কেড়েছিল। সেই রচনাভঙ্গিতে আর কোনও সাহিত্যিককে ঐতিহাসিক-রস পরিবেশন করতে দেখিনি। কন্যান ডয়েল-এর "ব্রিগেডিয়ার জেরার্ড সিরিজ"। একজন সাধারণ ফরাসী সৈনিকের স্মৃতিচারণের মাধ্যমে নেপথ্যে নেপোলিয়ান ফুটে উঠ্‌ছেন। ঐ আঙ্গিকে আমি দুজন বাঙালীর ঐতিহাসিক কাণ্ডকারখানা লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছি অপরের জবানবন্দির মাধ্যমে: "আমি নেতাজীকে দেখেছি" এবং "আমি রাসবিহারীকে দেখেছি"। দুটিই "প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দি"তে।

হালের কথায় আসি।গত বছর একটাঢাউসকাজ শেষ করে লেখা ছেড়ে পড়ায় মন দেওয়া গেল। অর্থাৎ *না-মানুষী 'বিশ্বকোষের* প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হবার পর শুরু করলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *সেই সময়*।

বইটা শেষ করে মনে একটা খটকা লাগল।

কোন সামাজিক অভ্যুত্থানই তো স্বয়ম্ভূ লিঙ্গের মতো অলৌকিক ক্ষমতায় মাটি ফুঁড়ে হঠাৎ গজিয়ে উঠতে পারে না। শিবনাথ শাস্ত্রী যাকে বলেছেন 'বঙ্গের নবযুগ', পরে যার নাম হয়েছিল 'বেঙ্গল রেনেসাঁস', তার ভগীরথ রাজা রামমোহন রায়। সেখান থেকেই *সেই সময়*-য়ের সূচনা। কিন্তু রামমোহন তো স্বয়ম্ভূ হতে পারেন না। বিবর্তনের একটি পূর্বযুগের ফল্গুধারা যে অনিবার্য। কালের ধারাবাহিকতা একটা থাকতেই হবে। প্রাগ্‌বর্তী 'সেইতর সময়' থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে। কিন্তু ইতিহাস তো সে-কথা বলছে না! কেন?

ঊনবিংশ শতাব্দী সাদায়-কালোয় মেশানো। সে যেন শরৎকালের আকাশ। মেঘরৌদ্রের পর্যায়ক্রম লুকোচুরি। একদিকে বাইজী-বেড়ালের বে'-বুলবুল-বাবুকালচার, অন্যদিকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথের অতন্দ্র সাধনার আশীর্বাদ। তুলনায় অষ্টাদশ শতাব্দী নীরন্ধ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্রাবণের অমারাত্রি। শুধুমাত্র তথ্যের অপ্রতুলতা নয়, যেটুকু দৃষ্টিগোচর তাও পঙ্কিল, ক্লেদাক্ত, আদ্যন্ত পূতিগন্ধময় পুরীষ! ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল অথবা রামপ্রসাদের বিশুদ্ধ কালীকীর্তন সমকালীন জনগণের সঙ্গে সম্পর্কবিমুক্ত। সতীদাহ প্রথাটাকে তখনো কেউ আপত্তিকর বলেই ভাবতে শেখেনি, বিধবাবিবাহ একটা অলীক কবিকল্পনা, কুলীনপাত্রের ধর্মপত্নী-সংখ্যা গুনতির একক 'কুড়ি'। স্ত্রীশিক্ষা এবং বৈধব্যযোগ বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত। 'সেইতর সময়'-এর উপাদান: হামার্দ, বর্গী, ইংরেজ, মীরজাফর, রেজা খাঁ, দেবী সিংহ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

জাতীয় উন্মাদনায় সিরাজ বা মহারাজ নন্দকুমারকে আদর্শ নায়ক খাড়া করার চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু আজ আমরা বুঝি—তার অনেকটাই ফাঁকা বুলি! তাহলে? এমনটা তো হবার কথা নয়? বিবর্তনের একটি ফল্গুধারা যে থাকতেই হবে। লোকচক্ষুর অন্তরালে কেউ-না-কেউ নদীয়ার সেই প্রেমানন্দে পাগল বিদ্রোহী পণ্ডিতের পর্ণকুটীর থেকে হোমাগ্নি-শিখাটি নিশ্চয়

পৌঁছে দিয়েছিলেন রাধানগরের রাজপ্রাসাদে, তুলে দিয়েছিলেন জ্ঞানগরিমার দার্ঢ্যে সমুন্নতশির নবীব বিপ্লবী ঋত্বিকের হাতে। উনবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয় যখন প্রত্যক্ষ সত্য, তখন কেউ-না-কেউ নিশ্চয় করে গেছেন অষ্টাদশ-শতাব্দীর অমারাত্রে অতন্দ্র 'রাত্রির-তপস্যা'।

বুড়ো ইতিহাস সে-কথা বেমালুম ভুলে বসে আছে।

খুঁজতে শুরু করলাম অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে। একটি অলোকসামান্য নায়কোচিত ঐতিহাসিক চরিত্রকে খুঁজেও পাওয়া গেল। বিগত শতকের শুধু কালীপ্রসন্ন সিংহ নয়, বীরসিংহের সিংহের পাশাপাশিও সেই কেশরীকে বেমানান লাগত না—কী পাণ্ডিত্যে, কী সারল্যে, কী কুলিশকঠোর চারিত্রিক দার্ঢ্যে! কিন্তু পরে বুঝতে পারি—যে বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁকে আদর্শ নায়ক করে অষ্টাদশ শতাব্দীটাকে কব্জা করতে চাইছি, সেই 'গুণ'টাই তাঁর 'দোষ'!

তাঁর কোন প্রামাণিক জীবনী নেই! *বাঙালী চরিতাভিধান*-এর পণ্ডিতেরা না খুঁজে পেয়েছেন তাঁর জন্মতারিখ, না তিরোধান দিবস! কেন গো?

কারণ সমকাল সেই পণ্ডিতকে উপেক্ষা করে গেছে! তাই বা কেন? তাঁর অপরাধ?

অপরাধ গুরুতর। সেই আত্মাভিমানী পণ্ডিত সমকালীন মহামহোপাধ্যায়দের পদাঙ্ক অনুসরণে—নবদ্বীপের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক শঙ্কর তর্কবাগীশ থেকে ত্রিবেণীর 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠপণ্ডিত' জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মতো 'লাঙ্গুলহীন শৃগাল' হতে অস্বীকার করেছিলেন! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং উপযাচক হয়ে তাঁর পর্ণকুটীরে গিয়েছিলেন বৃত্তিদানের প্রস্তাব নিয়ে। রাজানুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অরণ্যচারী পণ্ডিত। তাই সমকালীন পণ্ডিতদের পরিচয়-সমন্বিত একাধিক পুঁথি যদিচ আছে—তিন গোষ্ঠীভুক্ত দলেরই: নবদ্বীপকেন্দ্রিক, ভাটপাড়া-কেন্দ্রিক এবং ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম-কেন্দ্রিক; নেই শুধু ঐ একটিমাত্র পণ্ডিতের পরিচয়। তিন্তিড়ী পত্রপ্রেমী সেই আজীবন অরণ্যচারী ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রইলেন 'বুনো রামনাথ' নামে!

ইতিহাস রচনা করে রাজানুগ্রহভোগী একডালে-বসা 'হম-সব-পঞ্ছী'! ইদানীং যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পার্টি-ফাণ্ড অথবা বৃহৎ পত্রিকাগোষ্ঠীর অর্থানুকূল্যে সাহিত্যের বিচার-সমালোচনা-ইতিহাস রচিত হয়। একই পুরস্কার একই পণ্ডিতকে ঘুরে ফিরে দেওয়ার আয়োজন হয়। একডালে-বসা 'বার্ডস অব দ্য সেম ফেদার' পার্শ্ববর্তীর কানে কানে গান গেয়ে চলে, "তোর গানে পেঁচি রে/সব ভুলে গেছি রে।" সে-আমলেও তাই হত। ঐ 'বুনো বামুনটাকে' ইতিহাসের পাতা থেকে একেবারে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা যায়নি। বিচিত্র হেতুতে। যেমন, রাজা নবকৃষ্ণ দেব-এর 'আন্তর্জাতিক বিচারসভা'র বিবরণটা কীভাবে গোপন করা যেতে পারে? রাজা-বাহাদুরের সভাকবি তা যে ইতিহাসে লিখে রেখে গেছেন। সেই বিচারসভায় দক্ষিণভারতের এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারেননি। নবদ্বীপের শঙ্কর তর্কবাগীশ, শান্তিপুরের গোস্বামীপাদ রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি এমনকি ত্রিবেণীর সেই ক্ষণজন্মা পুরুষ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। গৌড়দেশকে ভরাডুবি হতে রক্ষা করতে তখন সভার মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন ঐ অরণ্যচারী 'বুনো' রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত! দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরাজয় স্বীকার করে ফিরে গেলেন দক্ষিণ ভারতে, চীরধারী, চিরঅপরাজেয় 'বুনো' পণ্ডিত ফিরে গেলেন বনে। তাই তথ্যের অপ্রতুলতার হেতুতে ঐ অন্তেবাসী পণ্ডিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক হবার অনুপযুক্ত।

না। ভুল হল। বরং বলা উচিত: অর্থলোভী, যশলোভী বিংশশতাব্দীর কোন শহুরে

'কথাসাহিত্য-ব্যবসায়ী' তাঁকে নায়করূপে লাভ করার অনুপযুক্ত।

অনুসন্ধান কার্যে কিন্তু ক্ষান্ত হইনি।

খুঁজতে-খুঁজতে-খুঁজতে অবশেষে হাতে এল চব্বিশ পৃষ্ঠার একটি চটি বই। শীর্ণ কিন্তু প্রামাণিক। প্রকাশক: বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ। লেখক: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যসাধক চরিতমালার ঊননব্বইতম পুস্তিকাটি: *চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী মহিলা*।

তিনজন অলোকসামান্যার কথা লিখে গেছেন গবেষক: হটী বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার এবং দ্রবময়ী। প্রথম দুজনের জীবনের অনেকটা অষ্টাদশ শতকে।

স্তম্ভিত হতে হল। যা খুঁজছি। নায়ক নয়, নায়িকা। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রস্তাবিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাসর'এ. কেন্দ্রীয় চরিত্র। পেয়েছি তাঁর সন্ধান। যিনি নবদ্বীপ থেকে মশালটি পৌঁছে দিয়েছিলেন রাধানগরে! নিমাই আর রাজা রামমোহনের মাঝখানের 'মিসিং লিংক'!

হটী আর হটুর বাস্তবজীবনের মিশ্র উপাদানে গড়ে উঠতে থাকে আমার মানসকন্যার জীবনী: *রূপমঞ্জরী*।

কিন্তু কেউ কি বিশ্বাস করবে এসব ঐতিহাসিক তথ্য?

রাজা রামমোহনের জন্মের পূর্বদশকে বর্ধমানের সোঞাই গ্রামে এক টুলো পণ্ডিত গ্রামসমাজের কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে একা রুখে দাঁড়াচ্ছেন! ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে সহমরণের চিতা থেকে তুলে আনছেন। তাকে সাক্ষর করছেন, তাকে শিক্ষিতা করছেন, পণ্ডিতা করছেন! আর তার পরের দশকে সেই পিতৃহীন পূর্ণযৌবনা পল্লীগ্রামের কূপমণ্ডূকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন। সমাজ সেই চিতাভ্রষ্টাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত। চিতাভ্রষ্টা উপনীত হচ্ছেন কাশীধামে। সেখানকার পণ্ডিতসমাজ থেকে বিদ্যালঙ্কার উপাধি লাভ করেছিলেন। কাশীধামেই খুলে বসেছিলেন এক চতুষ্পাঠী। পূর্ণযুবতী অধ্যাপিকা—অসঙ্কোচে জ্ঞানদান করতেন প্রায় সমবয়সী ছাত্রদের! শেখাতেন—কাব্য, অলঙ্কার, নব্যন্যায়, বেদান্ত। প্রকাশ্যে পণ্ডিতসভায় তর্কাদিতে যোগ দিতে সঙ্কোচ নেই, আপত্তি নেই দক্ষিণা গ্রহণ করতে।

দ্বিতীয়া: হটু বিদ্যালঙ্কার। পিতৃদত্ত নাম: রূপমঞ্জরী। রাজা রামমোহনের প্রায় সমবয়সী। বর্ধমানের গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করতেন। তিনি চিরকুমারী। সরগ্রামনিবাসী আচার্য গোকুলানন্দ তর্কালঙ্কারের কাছে চরক, সুশ্রুত, নিদান ইত্যাদি আয়ত্ত করে নরনারী নির্বিশেষে কবিরাজ হিসাবে গ্রামবাংলায় চিকিৎসা করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে! আশ্চর্যের কথা: তিনি প্রকাশ্যে উপস্থিত হতেন পুরুষের বেশে! মুণ্ডিতমস্তকে দীর্ঘ অর্কফলা, পরিধানে ধুতি-পিরাণ-উত্তরীয়। লেখকের কল্পনায় নয়। বাস্তবে!

দুটি বড় জাতের কাজ অর্ধসমাপ্ত পড়ে আছে। *লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চির* উপর একখানা বই। আর *না – মানুষী 'বিশ্বকোষ'*এর মেরুদণ্ডী পর্যায়। কিন্তু জাত-পল্লবগ্রাহী হলে যা হয়! সেসব পাণ্ডুলিপি দেরাজবন্ধ করে লিখতে বসলুম: *রূপমঞ্জরী*। অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃহত্তর বঙ্গদেশের উপর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্য যে নিতান্তই অল্প! কল্পনায় কতদূর পাদপূরণ অনুমোদনযোগ্য? সেই সমস্যার সমাধান সন্ধানেই লেখা বন্ধ রেখে ফের পড়া শুরু করা গেল—নানান জাতের ঐতিহাসিক উপন্যাস আর তার উপর আলোচনা। তা থেকেই এ প্রবন্ধটির উৎপত্তি।

আমার মনে হয়েছে 'সাহিত্যের নিত্যসত্য'র অজুহাতে আমরা, ইদানীংকালের সাহিত্যিকেরা,

শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে চলেছি! *আইভ্যানহো* এবং *রাজসিংহ* প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে ছাড়পত্র দিয়েছেন সেটার অপব্যবহার করছি আমরা। একথাই বা কেমন করে ভুলি, *A Tale of Two Cities*—এর ভূমিকায় ডিকেন্স 1859 সালে লিখেছিলেন:

Whenever any reference (however slight) is made here to the condition of the French people before or during the Revolution, it is truly made on the faith of the most trustworthy witness.

সজ্ঞানে ডিকেন্স ইতিহাসের গায়ে হস্তক্ষেপ না করে *দুই নগরীর কাহিনী* রচনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক ভুলভ্রান্তি সেখানেও আছে। G. K. Chesterton তো রসিকতা করে ভূমিকায় বলেছেন: "Like all very creative men, he (Dickens) unfixes the dates of history, and stands as a sort of immortal anachronism."—কিন্তু তা ডিকেন্সের 'সজ্ঞানকৃত' বিচ্যুতি নয়! আমরা যে: "জেনে শুনে বিষ" করাচ্ছি "পান"!

আর কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র থেকে ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুর সকলেই নীরব দর্শক! যেটা আপনি – আমি বুঝছি বঙ্গসাহিত্যের মহারথীরা তা বোঝেন না? সকলেই তো কুরুবংশের অন্নদাস নন! তবু কেউ কেন বলছেন না যে, এটা অন্যায়?

আমি আশাবাদী! আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ-না-কেউ উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করবেই। হয়তো সে নগণ্য, তুচ্ছ, নামগোত্রহীন এক ফরিয়াদী। তবু সে জিগির তুলবে: লিখে রেখ, আমি প্রতিবাদ করে গেছিলাম—এ তোমাদের অন্যায় দ্যূতক্রীড়া! 'ইতিহাস'-কে পণ রেখে পাশা খেলার অধিকার নেই কোনও ঐতিহাসিক উপন্যাসকারের! প্রকাশ্য রাজসভায় এভাবে 'ভাষা মহাভারতকার'-এর শ্রদ্ধেয়া জননীর বস্ত্রাঞ্চল ধরে আকর্ষণের ছাড়পত্র দিয়ে যাননি রবীন্দ্রনাথ!

হয়তো সে হতভাগ্য একলা, জোট-নিরপেক্ষ, অন্তেবাসী! বাকি নিরানব্বইজন এককাট্টা! ঘাড় ধরে ওরা লোকটাকে বার করে দেবে রাজসভা থেকে।

দিক। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত সেও পড়েছে। জানে, বিকর্ণকে বরদাস্ত করেনি স্বাধিকারপ্রমত্তের দল। লোকটা সভাত্যাগ করে চলে যাবে, হয়তো লোকালয় থেকেও উচ্ছেদ করা হবে তাকে। চলে যাবে অরণ্যে। তবে মাথা খাড়া রেখেই।

অন্তেবাসী, অরণ্যচারী, 'বুনো' হয় যাওয়া অসামাজিক, অশোভন, হতে পারে—সেটা অমর্যাদার, অগৌরবের নয়।

॥ তথ্যসূত্র ও নির্দেশিকা ॥

১। *ঐতিহাসিক উপন্যাস*, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য

২। *মিলভাঙা*, রবীন্দ্রনাথ, শ্যামলী

৩। *মহারাজ নন্দকুমার*, চণ্ডীচরণ সেন, নবপত্র প্রকাশন, ভূমিকা

৪। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ডঃ বিজিতকুমার দত্ত. মিত্র ও ঘোষ। পৃঃ 197

৫। *শ্রাদ্ধিকী*, কামিনী রায়

৬। *পলাশীর যুদ্ধ*, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, নাভানা, 1981, পৃঃ 103

৭। *সিরাজদ্দৌলা*, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সমকাল প্রকাশনী, 1983, পৃঃ 59

৮। *মুর্শিদাবাদ কাহিনী*, নিখিলনাথ রায়, পুথিপত্র। 1983, পৃঃ 115

৯। *ঐতিহাসিক উপন্যাস*, রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য

১০। *A Tale of Two Cities*, Charles Dickens, p.1.

১১। *শরদিন্দু অমনিবাস*, ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স [ভূমিকা: সুকুমার সেন]

১২। *বাঙালী চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, 1976, পৃঃ 507

১৩। *মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত*, রমেশচন্দ্র দত্ত, ভূমিকা

১৪। *বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস*, ডঃ বিজিতকুমার দত্ত, মিত্র ও ঘোষ, পৃঃ 189

১৫। ১৬। *রবীন্দ্র রচনাবলী, বৌঠাকুরাণীর হাট*, জন্মশত: সং, ৮ম খণ্ড, পৃঃ 3

১৭। *বেণের মেয়ে*, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভূমিকা

১৮। *ধ্রুবা* রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, [সুনীতিকুমার লিখিত ভূমিকা] মডার্ণ কলম, 1983

১৯। *শরদিন্দু অমনিবাস, ষষ্ঠ খণ্ড* [ভূমিকা: সুকুমার সেন] আনন্দ পাবলিশার্স

২০। *রবীন্দ্ররচনাবলী, দুরাশা*, জন্মশতঃ সং ৭ম খণ্ড, পৃঃ 338

২১। *পঞ্চতন্ত্র*, মোপাসা-চেকফ্, রবীন্দ্রনাথ, মুজতবা আলী

২২। *শরদিন্দু অবনিবাস*, বাঘের বাচ্চা, ষষ্ঠখণ্ড, পৃঃ 63-64.

২৩। ঐ· ঐ পৃঃ 408 ২৪। ঐ· ঐ পৃঃ 196

২৫। ২৬। ক্ষুধিত পাষাণ, রবীন্দ্রনাথ

২৭। *ঐতিহাসিক উপন্যাস, সাহিত্য*, রবীন্দ্রনাথ

২৮। *রাজসিংহ উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক ভুল*, যদুনাথ সরকার, বঙ্কিম শতবার্ষিকী সং

২৯। *রাজসিংহ, সাহিত্য*, রবীন্দ্রনাথ

৩০। *শরদিন্দু অমনিবাসের ষষ্ঠ খণ্ডে* সুকুমার সেনকৃত ভূমিকা

৩১। *শারদীয়া শিলাদিত্য পত্রিকা*, ১৩৮৪, *গেরিলা*, চাণক্য সেন

৩২। ৩৩। *সেই সময়*, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড

৩৪। *Use of the Right Word*, The Reader's, Digest

৩৫। *Rolland & Tagore*, Visva-Bharati, 1945, p. 100

৩৬। *শেষ সওগাত*, কাজী নজরুল ইসলাম

৩৭। *বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন সিংহ।* ডঃ পরেশচন্দ্র দাস, উদয়নী পাবলিশার্স